বিচিত্র বিহঙ্গ

দেবাদশী



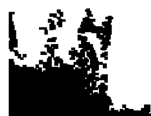


সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৬৭
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
২৫।৪ একবালপুর রোড
কলকাতা ২৩
প্রচ্ছদপট ও ছবি
শিশির দত্ত
মুদ্রক
রমেন্দ্রচন্দ্র রায়
প্রিণ্টস্মিথ
১১৬ বিবেকানন্দ রোড
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট মুদ্রক
রে এ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ
৫এ ম্যাজ লেন
কলকাতা ১৬
ব্লক
রূপমুদ্রা
৪ নিউ বহুবাজার লেন
কলকাতা ১২

দাম আট টাকা

শ্রীমতী চম্পা রায়
পরম কল্যাণীয়াসু



বিচিত্র বিহঙ্গ



১

নক্করদা বলছিলেন, "এই জোড়াগীর্জার আশেপাশে যে ছোট বড় মাঝারি রাস্তাগুলো এঁকেবেঁকে ডালপালা মেলে জাঁকিয়ে রয়েছে, এ-তল্লাট এককালে ছিল দো-আঁশলা কালা ফিরিঙ্গীদের একচেটে। খাঁটি দিশী গেরস্থরা এখানে নাক গলাতে পারত না। কালা ফিরিঙ্গী সত্যিই বিশেষ কালো ছিল না তখন, বরং বেশির ভাগই ছিল ফরসা। সে রঙ ধোপেও টিকে ছিল অনেককাল। কলকাতায় ও-সমাজের গোড়াপত্তন করে পর্তুগীজরা, আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে। জানিস তো রে কাঞ্চন, সাবেককালের ইউরোপের যে-কটা জাতের নাম আমরা জানি, যেমন কেল্টিক, গেলিক, গথ, সাক্সন, নর্মান, ফ্রাঙ্ক, স্লাভ, ওদের ভিতর ফ্রাঙ্করাই হামাগুড়ি দিয়ে সবার আগে-আগে চলেছিল সভ্যযুগের ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে! পর্তুগীজদের খুব দেমাক ছিল সেই ফ্রাঙ্ক জাতের বংশ বলে, নিজেদের পরিচয় দিত ফ্রাঙ্ক। ফ্রাঙ্ক থেকে ফ্রাঙ্কি, এদেশের লোকরা সোজা কথায় বানালো ফিরিঙ্গী। ঐ আসল ফিরিঙ্গীদের থেকে নেরশা বোঝাতে দিশী জেনানাদের গর্ভে ওদের ছেলেমেয়েদের নাম দিল কালা ফিরিঙ্গী। ওদের আর এক নাম ছিল 'কিস্তালি'। পর্তুগীজ ভাষায় কিস্তাল কথাটার মানে ভেজাল। ঐ কিস্তালি শব্দটা থেকেই এ-পাড়াটার নাম দাঁড়াল ইস্তালী তারপরে এণ্টালী।"

ঢোঁক গিলে বললাম, "মাপ করবেন নক্করদা, এটা কি আপনার মৌলিক গবেষণা? এণ্টালীর মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছেন?"

নক্করদা একটু গরম হয়ে বললেন, "তুই ইংরেজিতে এম-এ পাশ করেছিস কিন্তু ইতিহাসের কি জানিস? শুধু কলকাতায় কেন, সারা ভারতে এখনো ছড়িয়ে আছে ডিসুজা, ডিমেলো, ডিক্রুজ, ব্যাপটিস্টা, সিবাস্টিয়ান, কস্টেলো, ফার্ণাণ্ডো, গোমেজ, লোবো, লুকাস, ম্যানুয়েল, নরোন্‌হা, পিণ্টো, রেবেলো, রডরিগ্‌স, রোজারিও, ডিকস্টা, ডেসার দল, ঐ পর্তুগীজ ধুরন্ধরদের বংশাবতংস। ওদের বুলি ও গালি এখন

ইংরেজী, গায়ের রঙ পোঁচ ভেদে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ থেকে মেহগিনি পালিস, পোশাক-আশাকে বিলিতি ঢঙ্। যদিও ওরা এখন পর্তুগীজের প-ও জানে না, তবুও আমাদের বাংলাভাষার আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে আছে একগাদা পর্তুগীজ শব্দের জারজ সন্তান, যেমন আয়া, কাবাড়, আলকাতরা, আলমারি, দেরাজ, কেদারা, মেঝ, বাসন, বজরা, বারান্দা, বালতি, বোতাম, চা, কামান, তোয়ালে, গীর্জা, ইস্ত্রী, জানালা, নীলাম, লেবু, কাকাতুয়া, ফিতা, মিস্ত্রী, বেহালা, আচার, কামিজ, সিপাই, লস্কর, গুদাম।

"আমাদের দেশে ওরাই এনেছিল লেবু, পেয়ারা, মুসাম্বি, পেঁপে, চীনাবাদাম, মরিচ, জামরুল, তামাক, চাঁপা, গেঁদা, ভুট্টা।

"তখনকার দিনে ইউরোপেও পর্তুগীজদের খুব নাম-ডাক ছিল। সাগর পাড়ি দিতে ওদের জুড়িদার আর কোনো জাত ছিল না। বাঙলাদেশে আসবার আগেই ওরা মরক্কো, মোজাম্বিক, কঙ্গো, গায়েনা, মালাক্কা, সিলোন, গোয়া, কালিকাট, কোচিন, ডাণ্ডাবাজী করে বগল দাবায় পুরেছিল। ওরা শুনেছিল 'বেঙ্গালা' মুলুক হিন্দোস্থানের সেরা মুলুক, টাকা ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নিলেই হল। দক্ষিণ দিক দিয়ে 'গাঙ্গে' নদী বেয়ে কিছুদূরেই নাকি পাওয়া যাবে সাতগাঁয়ের বিরাট গঞ্জ, যেখান থেকে ফিনফিনে মসলিন চালান যায় ঈজিপ্টে, ঈজিপ্ট থেকে রোমে ও গ্রীসে রূপসাদের অঙ্গশ্রী বর্ধন করতে। বেঙ্গালায় ঢুকবার আরো একটা নাকি জল-পথ আছে, চাটিগাঁও বন্দরে। ওখান থেকে নৌকায় নাকি সোজা পৌছানো যায়, বেঙ্গালার রাজধানী 'গাউড়'-এ।"

"কই নকরদা, সাতগাঁও, চাটিগাঁও, গাউড়ের নাম তো কখনো শুনিনি?"

"কি-ই বা শুনেছিস, কি-ই বা জানিস? গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বরাবর গাড়ি চালিয়ে ব্যাণ্ডেলের কিছুদূরেই দেখবি সপ্তগ্রাম নামে একটা গ্রাম এখনো আছে, তবে নদীটার চিহ্নও নেই, এমনিভাবেই সেটা হেজে মাঠ হয়ে গেছে। চাটিগাঁও এখন-কার চট্টগ্রাম শহর। গৌড় অনেকদিন বাঙলার রাজধানী ছিল, মালদার দশ মাইল দূরে তার ধ্বংসস্তূপ আছে। গৌড়ের বাদশাকে ওরা 'মুর' বলেই ধরে নিয়েছিল, বেবাক মুসলমানদেরই ওরা 'মুর' নাম দিয়েছিল, যারা এশিয়া থেকে একপাল নেকড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইউরোপে এবং রক্তের স্রোত বইয়ে এগোতে-এগোতে স্পেন পর্যন্ত গ্রাস করেছিল।"

"প্রথমে পর্তুগীজরা কোথায় নেমেছিল এদেশে ? সাতগাঁয়ে না চাঁটিগাঁয় ?"

"গাঙ্গে, মানে আমাদের গঙ্গানদী দিয়ে বাঙলায় ঢুকবার প্রায় আঠারো বছর আগে ওরা সমুদ্রের কাছে চাঁটিগাঁয়ের বন্দরে এসে নোঙর ফেলল। ও দলের সর্দার ছিলেন সেনর জোয়াঁও সিলভেইরা। তিনি গৌড়ের বাদশার কাছে আরজী পাঠালেন ব্যবসা করবার সনদ চেয়ে। চাঁটিগাঁও-এর ফৌজদার ছিলেন সেয়ানা আদমী তিনি আরজীখানা বেমালুম গায়েব করে সিলভেইরার লোকটিকে নদীতে ডুবিয়ে সাবাড় করলেন, পর্তুগীজদের রসদ আটকিয়ে ওদের পেটে বোমা মারলেন, তারপর সোজাসুজি কামান দেগে জাহাজটা ভাগিয়ে দিলেন।"

নফরদা আর একটা সিগারেট ধরিয়ে আরম্ভ করলেন, "গ্রীক, শক, হুণ, মঙ্গোল, তাতার, পাঠান, মোগল এদেশে এসেছিল হাঁটা-পথে, পাহাড় জঙ্গল নদী ডিঙিয়ে। সাগর পাড়ি দিয়ে প্রথমে এল পর্তুগীজরা। ষোলো শতকের গোড়ার দিকে ভাস্কোডাগামা আফ্রিকার দক্ষিণ মোড় ঘুরে এদেশে আসবার হদিস বার করে। সেজেগুজে ভেট নিয়ে যখন এই কাপ্তান সাহেবটি কালিকটের 'জামোরিনের' দরবারে এসে পৌছাল তখন রাজার এক কর্মচারী জিগ্‌গেস করল—কোত্থেকে আসা হয়েছে ? কি মতলব ? জবাব পেল—আমি পর্তুগীজ রাজার ভেট এনেছি, এখানকার রাজার সঙ্গে দেখা করব, আমরা তোমাদের বন্ধু, এসেছি কৃশ্চান আর আর ব্যবসার খোঁজে। এ থেকেই বোঝা যায়, পর্তুগীজরা এসেছিল 'অসভ্য মুখ্‌খু নেটিভদের' প্রভু যীশুখৃষ্টের কৃপায় স্বর্গরাজ্যে কিভাবে সর্টকাটে যাওয়া যায় তা প্রচার করা এবং ব্যবসা ফেঁদে পর্তুগালের উঠন্ত অবস্থা আরো বাড়ন্ত করা। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে ঢেলে সাজানো নয়।"

"কুমির তো পরে এল নফরদা, কিন্তু সেই জামোরিন তো আহাম্মকের মতো প্রথমে খাল কাটল ! চাঁটিগাঁওয়ের ফৌজদার যে-শনিকে কুলোর বাতাস দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিল, কালিকটের রাজা সে-শনিকে চিনতে পারল না ? এই বোম্বেটেরা বাঙলাদেশে ঢুকল কবে ?"

"চাঁটিগাঁওয়ে তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাবার আঠারো বছর পরে পর্তুগীজদের তিনখানা জাহাজ দেখা দিল গঙ্গার মোহনায় সন্দীপে। এরা এবার পর্তুগাল থেকে মাসের পর মাস শুঁটকো হতে-হতে আসেনি। এসেছে গোয়া থেকে। গোয়া, কালিকট, কোচিন এ-কবছরে পর্তুগীজদের জুতোর তলায় চাপা পড়েছে। গোয়ার

'কমান্দান্তো' তখন পর্তুগীজ-ভারতের সর্বে-সর্বা। এই খাজাভাজা দলের কাপ্তান ছিল সেনর পেড্রো ম্যানুয়েল কস্টেলো ফার্নাণ্ডো টেভারেস। নামের সঙ্গে মিল রেখে দেহটাও ছিল লম্বা তাগড়াই। বেচবার মাল নামকা-ওয়াস্তে, আসলে কামান বন্দুক গোলাগুলিতে ঠাসা এই জাহাজ তিনটে সন্দীপের পাশ কাটিয়ে মাটিবুরুজ, ব্যাতড়, শালিখাঁন, বড়ষি, খিজিরপুর ছাড়িয়ে কালীরঘাটে এসে নোঙর ফেলল। জাহাজ আর এগোবে না, কারণ নদীতে জল কম। বড়-বড় দিশী নৌকো যোগাড় করে ওরা আরো উত্তরে রওনা হল। গোবিন্দপুর, সুতানটি, চিৎপুর, বরাইনগর, বালুঘাট, বালি, কোন্নগর, গোঁদলপাড়া, মাহেশ, জগদ্দল, হালিশহর, ত্রিবেণী গ্রামগুলো একে-একে ডাইনে ও বাঁয়ে রেখে গঙ্গা থেকে ঢুকল সরস্বতী নদীতে, তারপরে খানিক যেতেই সাতগাঁওয়ের গঞ্জ।"

জিগগেস করলাম, "কেন নফরদা? শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, চন্দননগর, চুঁচড়ো, হুগলী, ব্যাণ্ডেল, এগুলোর নাম বললেন না তো? ভুলেই যাচ্ছেন একেবারে?"

"নারে কাঞ্চন, এ জায়গাগুলো গড়ে তুলল ইউরোপীয়ানরা অনেক পরে। বাঙলার মাটিতে ঐ পয়লা ঝাঁকের শাদা আদমী দেখে বাঙালীরা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েছিল, ক্ষুদে পুঁচকেরা দৈত্যদানা ভেবে ভয়ে বাড়ির দিকে ছুট দিয়েছিল। টেভারেস যখন এল তখন গৌড়ের মসনদে মামুদ শা। মোগল মামুদ শাকে নাজেহাল করছে পাঠান শের শা। টেভারেস ঝোপ বুঝে কোপ মারল। পর্তুগীজদের বড়-বড় কামান ও তাদের মোক্ষম নিশানা মামুদ শার খুব কাজে লেগে গেল। পাঠানরা চোট সামলাতে না পেরে হাতিয়ার ফেলে চোঁ-চা দৌড়। মামুদ শা বহোৎ খুশ হয়ে পর্তুগীজদের মালখানা, তোষাখানা, নোঙরখানা বানাবার সনদ দিলেন সাতগাঁও, খিজিরপুর ও চাটিগাওঁ-এ। শাকের সঙ্গে কাসুন্দীর মতো টেভারেস নিজেও পেলেন মোটা টাকার ইনাম। পর্তুগীজদের ভাগ্যে এই বৃহস্পতির দশা অনেক বছর ছিল। দিল্লির মসনদে যখন আকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশা ছিলেন তখন পর্তুগীজরা ডাঁটসে কারবার চালিয়েছিল আর দলে-দলে দিশী মরদ জেনানা বালবাচ্চাদের খৃষ্টান বানিয়েছিল। এণ্টালী পাড়ার কিস্তালিদের পয়দা-কাহিনী ওখানেই শুরু, ভারতীয় সমাজ-জীবনের ইতিহাসে বীর্যবান বিদেশী পুরুষদের কুকীর্তির কুখ্যাত স্বাক্ষর।"

জিগগেস করলাম, "নফরদা, সাতগাঁওয়ের কথা জানি না, কিন্তু হুগলী শহরটা নাকি পর্তুগীজদেরই তৈরি? আর 'গাঙ্গে' নদীটাই বা কেন নাম পাল্‌টিয়ে এখনো

বিদেশীদের কাছে রিভার হুগলী বলেই চলতি আছে? ম্যাপেও তো দেখি লেখা আছে ঐ নামটা?"

নফরদা বিরক্ত হলেন। বললেন, "শুনে যা বলছি, মাঝখানে ফোড়ন কাটিসনে। কথার মাঝখানে ডিসটার্বড্ হলে ইচ্ছে হয় জিভটায় কলুপ এঁটে দিতে। ভালো করে শুনে যা, জ্ঞানগম্যি বাড়বে, ম-লিখিত কথামৃতের মতো যদি সা-লিখিত নফরামৃত গুছিয়ে লিখে বাজারে ছাড়তে পারিস তবে বেশ টু-পাইস ঘরে আনতে পারবি। এই গোল্ডেন সুযোগ হারাসনে।"

আমার রাগ হল, বললাম, "আমাকে শালা বলছেন?"

নফরদা হেসে ফেলে বললেন, "ওরে গর্দভের জামাই, শালার 'শা' নয়। তুই কাঞ্চনবরণ সান্নেল, সেই সান্নেলের 'সা'। তুই যে আমার ব্রাদার রে? ব্রাদার কি ব্রাদার-ইন-ল হতে পারে? হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সরস্বতী নদী জায়গায়-জায়গায় হেজে মজে শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে সেয়ানা টেভারেস বুঝল সাতগাঁওয়ের বারোটা বাজতে খুব বেশি দেরি নেই। সে দক্ষিণে সরে এসে গঙ্গার পাড়ে এক জায়গায় তাড়াতাড়ি বড়-বড় গোলাঘর আর জাহাজঘাটা তৈরি করে গেড়ে বসল। হোগলার বেড়া, হোগলার ছাউনীঢাকা সে-সব গোলাঘরের থেকেই জায়গাটার নাম দাঁড়াল হুগলী। জাহাজ ও নৌকাঘাটা যেখানে সেখানটার নাম হল ব্যাণ্ডেল। 'ব্যাণ্ডেল' কথাটা বোধহয় 'বন্দর' থেকেই পয়দা হল। গঙ্গার মোহনা থেকে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর হুগলীই হল প্রধান শহর, তাই মনে হয় গঙ্গার এদিকটার নাম দাঁড়িয়ে গেল হুগলী নদী। হেলাফেলার যে জমি বুনো শুয়োর, শেয়াল, বাঘ, আর কেবল হোগলা বনের রাজ্যি ছিল সেখানে পর্তুগীজদের দৌলতে গড়ে উঠল দু-দুটো শহর, হুগলী আর ব্যাণ্ডেল, হাত ধরাধরি করে। থাকবার জন্যে হুগলীই ছিল বেশি জুতসই। পর্তুগীজ ধরনে বাংলোর সারি, ঝকঝকে রাস্তাঘাট, বাগান, ইটপাথরের বড়-বড় মালখানা, তোষাখানা, ক্লাবখানা। পরে বাঙলাদেশে গুটি-গুটি এল ডাচ, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ, ফ্লেমিস, ডেন ও প্রাশিয়ানরা, যেমন ভাঙা কাঁঠালের গন্ধে ভনভন করে মাছিরা এসে জোটে।"

নিশ্চয়ই নফরদার ভুল। বললাম, "কি বলছেন নফরদা মাথামুণ্ডু? ডাচ, ফ্লেমিস, ডেন, প্রাশিয়ান? ওরা কখ্খনো আসেনি।"

"একশো বার বলছি এসেছিল। ডাচরা ঘাঁটি বাঁধল চুঁচড়োয়। পর্তুগীজরা

তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়লে ইংরেজরা ঢুকে পড়ল হুগলীতে। ফ্রেঞ্চরা প্রথমে ঘিরেটি, পরে চন্দননগরে। ডেনরা গোঁদলপাড়ায়, পরে শ্রীরামপুরে। প্রাশিয়ান জার্মানরা চন্দননগরের খুব কাছেই ফোর্ট অর্লিন্স নামে কেল্লা তৈরি করে তার ভিতরে। এ জায়গাগুলিও হুগলী ব্যাণ্ডেলের মতো ঝোপঝাড় আগাছার রাজত্ব ছিল। বুঝতে পারছিস কাঞ্চন! সাত-সাতটা ইউরোপিয়ান খাজামদ্দার জাত সোনার বাঙলাকে জোঁকের মতো শুষে খাবার জন্যে ছোঁকছোঁক করে এসে প্রায় পাশাপাশি আড্ডা গাড়ল।"

আমি বললাম, "এখনো দেখুন না নকরদা, পাশাপাশি পাকিস্থানে শুধু মোসলেম ব্রাদারহুড জিন্দাবাদ, বাকি সব কাফের মুর্দাবাদ, কিন্তু আমাদের ভারত-মাতার ইউনিভার্সাল মাদারহুডের লাই পেয়ে বেড়া টপকিয়ে, নর্দমা গলিয়ে, সামনের দরজা পেছনের দরজা পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে বারো-দেশের বারো-জাতের লোক দিব্যি আরামসে কেমন সেই স্তন্যসুধা চুকচুক করে চুষছে?"

"শাদাজাতদের ভেতর কিন্তু বরাতজোরে শেষমেশ ইংরেজরাই টিকে রইল। শুধু টিকেই রইল না, প্রায় দুশো বছর আমাদের মাথার ওপরে রাজা হয়ে গ্যাঁটসে বসেছিল। ওদের আশী বছর আগে এসেও পর্তুগীজদের হুগলী ছেড়ে পালাতে হল, কিন্তু ওরা যে সোনার ভাণ্ডারের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেছিল সে-দরজা এখনো খোলাই আছে। ডাচ ফ্লেমিস ডেন প্রাশিয়ানরা কিছুদিন পরেই কেটে পড়ল বাঙলাদেশ থেকে, কিন্তু ফ্রেঞ্চরা এই সেদিন পর্যন্ত চন্দননগরের মাটি কামড়ে পড়েছিল। একদিন নিয়ে যাব তোকে চন্দননগরে, দেখবি মোটেই খরচা করেনি শহরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলবার জন্যে। খাটা পাইখানা কাঁচা নর্দমা এঁদোপুকুর অলিগলিপথ বনজঙ্গলে ভর্তি। দেখে নাক সিঁটকোবি, অথচ ওরা সৌন্দর্যের পূজারী, নিজেদের দেশ কি চমৎকারভাবে সাজিয়ে রেখেছে! বলেছিলি না তোর অরিজিনাল বাড়ি ছিল চন্দননগরে, বাপপিতামোর দেশ?"

"পর্তুগীজরা হুগলী ছেড়ে চলে গেল কেন? চুলোয় যাক চন্দননগর।"

"ওঁতোর চোটে বাবা বলতে হয়। বাদশা সাজাহান যখন শুনলেন ওদের পাদ্রীরা ঝাঁকে-ঝাঁকে মুসলমানকেও খৃষ্টান বানাচ্ছে তাঁর মোগলাই রক্ত চটে ফায়ার হল, ফৌজ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সেনাপতি কাশিম খাঁকে পর্তুগীজদের এ-তল্লাট হতে ঠেঙিয়ে বিদেয় করতে। ব্যাণ্ডেল ও হুগলী ছাতুছাতু হল, যে-যে পারল

জাহাজে চেপে চম্পট দিল, পাদ্রীরাই বেশি। অনেক জোয়ান ও জেনানা ঘায়েল হল, বাদবাকিদের মাজায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হল দিল্লি। এর পরের পর্বে পর্তু-গীজরা মরিয়া হয়ে ফিরে এল বোম্বেটেগিরি করতে, বাঙলার সমস্ত দক্ষিণ তল্লাটে নিরীহ বাঙালীর গ্রামগুলিতে ওরা লুঠতরাজ আর বেপরোয়া হামলাবাজীতে রক্তের স্রোত বইয়ে দিল। সে তাণ্ডবে যোগ দিল আরাকানের মগরাও, তবে এই শাদা-দানবরা আর কখনো হুগলীতে ফিরে আসেনি। কিন্তু ততদিনে কিস্তালি বংশবৃদ্ধি ব্যাঙের মতো লাফাতে-লাফাতে বেশ এগিয়ে গেছে। পর্তুগীজ পাদ্রীরা ছলে বলে কৌশলে খৃষ্টান বানানোর যে অপকর্মটি শুরু করেছিল, সে কর্মটি এখনো স্বাধীন ভারতে চোরাগোপ্তাভাবে দিব্যি চলেছে ইংরেজ আমেরিকান বেলজিয়ান পাদ্রীদের দৌলতে, হরিজন, পাহাড়ী ও আদিবাসীদের ভিতরে। মাদার ইণ্ডিয়া ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার দেশ, কর্তাব্যক্তিদের মনোভাবও এসব ব্যাপারে একেবারেই নির্বিকার।"

কিস্তালী-জন্মরহস্যে ছেদ পড়েছে বুঝতে পেরে সাহস করে জিগ্যেস করলাম, "নফরদা, আজ আপনার কাঁধে ক্যামেরাটা ঝুলছে না কেন? ধোঁয়া ছাড়বার চোঙা ছাড়া যেমন স্টিমইঞ্জিন ভাবতে পারা যায় না, শিং ছাড়া যেমন গরু ভেড়া বা মোষ কল্পনা করা যায় না, তেমনি ক্যামেরা ছাড়া আপনাকেও আপনি বলে চেনা যাচ্ছে না। ওটাই তো আপনার আইডেন্টিফিকেসন মার্ক, যেমনটি পাসপোর্টে প্রত্যেকেরই অবশ্য লেখনীয়? প্রেসফটোগ্রাফারকে কি কখনো ক্যামেরাহীন অবস্থায় পথে-ঘাটে দেখা যায়?"

নফরদা মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত উঁচিয়ে জবাব দিলেন, "ছুটি নিয়ে বক্সিং শিখছি।"

"বক্সিং? ওরফে ঘুঁসির কসরত?"

"হ্যাঁ, বক্সিং মানে বক্সিং, ব্রাকেটে ইং। বাঙলায় মুষ্টিযুদ্ধ। রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে কি বলে জানিনে। জানবার ইচ্ছেও নেই।"

"কার সঙ্গে বক্সিং লড়বেন?"

"টাইম অ্যাণ্ড টুডে-র ফটোগ্রাফার ডানিয়েল ডিসুজার সঙ্গে।"

"কি ব্যাপার? টাইম অ্যাণ্ড টুডে কাগজটার নাম শুনেছি বটে, কখনো পড়িনি।"

"যেদিন জাঞ্জিবারের সুলতান হিজ হাইনেস মহম্মদ আহাম্মদ আবদুল গোলাম-নবী আলী জব্বর হাসান বরকৎউল্লা সলিমুল্লা খান ইন্দোনেশিয়ার পথে দমদমে

নেমেছিলেন সেদিন আমার কাগজের তরফে আমি যাই তাঁর ফটোগ্রাফ তুলতে। হঠাৎ পিঠের ওপর একটা ঘুঁষি বর্ষণ করে কে যেন বললে, 'গেট আউট অফ মাই ওয়ে, ড্যাম ইউ।' ফিরে দেখি ওই ডিসুজা। কেন রে বাপু, আমিও তো ওরই মতো ফটো নিতে গেছি? বাইরে এসে বললাম—বুঝেছ সাহেব! তোমাকে আমি এখন ক্লাসিকেল কুস্তির তিন নম্বর প্যাচে ফ্লাট করে দিতে পারি, কিন্তু সেটা হবে অসম যুদ্ধ, স্ট্রং ভার্সাস উইক। দেহটি দেখেছ আমার সেকেণ্ড পাণ্ডব ভীমের পেপারব্যাক এডিসন? মহাভারতে গ্রাণ্ডফাদার ভীষ্ম বলেছেন সমান-সমান অস্ত্রে যুদ্ধই ক্ষত্রিয় কাস্টের ধর্ম। আমি ক্ষত্রিয় সন্তান এন. সি. বাসু যদিও অল বেঙ্গল এক্স-চ্যাম্পিয়ন ইন রেসলিং, তবুও অ-সম সমর চাইনে। বক্সিং শিখে তবে তোমার ঘুঁষির জবাব ঘুঁষিতেই দেব। মনে রেখ এই চ্যালেঞ্জ। আর যদি ফিয়ার কমপ্লেক্স থাকে তবে গোয়ার টিকিট কাটতে পার, ক্যালকাটার দাদখানি চাল এবং গলদা চিংড়ির কারি তোমার ঘুচেছে।"

"একেবারে শুরুতেই চরমপত্র?"

"ও কিস্তালি, আমি বাঙালী, ওর গায়ে সাহেবি গন্ধ লেগে আছে, আমার গায়ে বাবু গন্ধ। সাহেব বলে ওর মুরুব্বিয়ানা কমপ্লেক্স, যদিও গায়ের রঙ আমার চাইতে কালো। তাই বাঙালীর মান রাখতে সরাসরি যুদ্ধং দেহি বলে বসলাম। শুধু ওয়ার্নিং দিলে ও ভাবত আমার দাসমনোভাব উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চল কাঞ্চন, আমার বক্সিং ক্লাসের কিছু দেরি আছে, ঐ সিগারেটের দোকানে দুটো সিগারেট খেয়ে এই ইন্টারভ্যালটার সদ্গতি করা যাক, শাস্ত্রীয় ভাষায় মুখাগ্নি।"

ঘণ্টাখানেকব্যাপী এই কিস্তালি কাহিনী ও উপকাহিনীটি হচ্ছিল এণ্টালীর মোড়ে দাঁড়িয়ে। বাসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণভগবান যদি কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যুধ্যমান পাণ্ডবপক্ষ ও কৌরবপক্ষের মাঝখানে রথের উপর দাঁড়িয়ে অষ্টাদশপর্ব গীতা গড়গড় করে বলে যেতে পেরেছিলেন তবে বসুসন্তান নফরচাঁদ কেন দুই রাস্তার মোড়ে পদরথে দাঁড়িয়ে কিস্তালি জন্মতত্ত্ব কড়কড় করে বলে যেতে পারবেন না?

নফরদা আবার মুখ খুললেন, "যে-পাড়ায় কিস্তালিদের দাপটে দিশী লোকেরা তফাত থাকত সেখানে চেয়ে দেখ কাঞ্চন, পিঁপড়ের সারের মতো পিলপিল করে ঢুকছে বেরোচ্ছে ধুতিধারী লুঙ্গীধারী ট্রাউজারধারী পাজামাধারী ফেজওয়ালা পাগড়িওয়ালা ন্যাঙ্গামাথাওয়ালা টুপিওয়ালারা। যেখানে ফরসা রঙ চোখানাকই

এককালে দেখা যেত সেখানে এখন গৌরবর্ণ তামাটেবর্ণ শ্যামবর্ণ পীতবর্ণ আলকাতরাবর্ণ চোখামুখ থ্যাবড়ামুখ খ্যাঁদানাকী ভোঁতামুখী। যেখানে কিস্তালি রূপসীরা ফুলের মতো বিদেশী প্রজাপতিদের কাছে লোভনীয় ছিল সেখানে চেয়ে দেখ ঐ ফড়িঙের দল, শাড়িপরা স্কার্টপরা ঘাঘরাপরা সালোয়ারপরা বাটকু নাটকু মোটকু হাড্ডভূতী ক্যারেটস্বর্ণকেশী পিঙ্গলকেশী কৃষ্ণকেশী বেণীকুন্তলা ববকুন্তলা বয়কাট্কুন্তলা কোঁকড়াকুন্তলাদের জগাখিচুড়ি। বিচিত্র রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে পঞ্চেন্দ্রিয়ের জন্যে বিচিত্র পরিবেশ ও পরিবেশন।"

নফরদা একবার ভুলে বলে ফেলেছিলেন উনি শুধু খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারই নন, সিনিয়র রিপোর্টারও বটে। বললাম, "চমৎকার বর্ণনা, চমৎকার ভাষা, আরো চমৎকার—"

নফরদা বাধা দিলেন, "চুপ, ঐ যে মেয়েটা এদিকে আসছে ওকে চিনিস ?"

তাকিয়ে দেখলাম এ-ও একটা কিস্তালি মেয়ে। রাগ হয়ে গেল, বললাম, "আপনি বক্সিং-এ পাশ করবার আগে আমিও নির্ভয়ে একটা চরমপত্র দিচ্ছি, দু-একটা সিগারেট খাইয়ে আমার চরিত্র সম্বন্ধে কোনো খারাপ ইঙ্গিত আপনার করা চলবে না। কিস্তালি বাঙালী মাদ্রাজী উড়িয়া মাড়োয়ারী পার্শী সাঁওতালী কোনো মেয়ের সঙ্গেই আমার আলাপ-প্রলাপ-বিলাপ হয়নি, মেয়েদের সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নির্বিকার নির্বিকল্প। বলতে গেলে, ওদের সম্বন্ধে আমি নিরেট গবেট।"

নফরদা আমার বুকে বক্সিঙের একটা ছোটো-খাটো চাঁটি ঠুকে বললেন, "চিনিস না ভালো কথা, তবে চিনলেও এখন চিনতে পারবি না। তুই থাকিস যে-রাস্তায় সে-রাস্তায়ই তেত্রিস নম্বরের বাড়িটায় ও থাকে। তবে কখনো-কখনো ওর চুলের রঙ ভ্রূয়ের রঙ বদলে যায়।"

"কি রকম ?"

"স্টেটসম্যানে আজ তিনদিন ধরে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে দেখিসনি ? ঈজিপ্ট থেকে একটি ক্যাবারেডান্সার এসেছে, রূপসী উর্বশী 'নিম্ফ-অফ-দি-নাইল' ডায়মণ্ড নাইটক্লাবে নাচবে ? ঐ কিস্তালি মেয়েটাই সাজবে 'নিম্ফ-অফ-দি-নাইল'। তাই ও চুলের আর ভ্রূয়ের রঙ হেয়ার ড্রেসিং সেলুন থেকে কালো কলপ দিয়ে এসেছে। তোর এই পড়শীর নাম ডোরিন গ্রে, আমি দু-একবার ওর ফটো নিয়েছি

কাগজে বিজ্ঞাপনের জন্যে। কিস্তালিদের মধ্যে এরকম চেহারা বড় একটা দেখা যায় না।"

"এটা তো ধাপ্পা দেওয়া ?"

"ধাপ্পা নয়, বলতে পারিস ট্রেডসিক্রেট। সব ব্যবসাতেই এরকম গোপন রহস্য আছে, সব ব্যবসাই এটার জোরে চলে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তো বিজনেসম্যান ছিলেন না, তাই তিনি ধর্মরাজ হতে পেরেছিলেন। ওকালতি ব্যারিস্টারি ডাক্তারী গুরুগিরি, কোনটার ভেতর ট্রেডসিক্রেট নেই বল তো? বুদ্ধ খৃষ্ট জোরাথুষ্ট্র কনফুসিয়াস এদের কাউকেই ব্যবসা করে পেট চালাতে হয়নি, তাই ধর্ম-ধর্ম করে গিয়েছেন।"

"কাল এই ডোরিন গ্রে কি নাচ দেখাবে ডায়মণ্ড নাইটক্লাবে ?"

"কাল যদি রাত এগারোটায় উপস্থিত থাকিস সেখানে তবে দেখবি ওর গায়ের রঙ নীলনদতীরের পাকা গমের মতো ফিকে হলদে, ছুটি চুলের গোছা নেমে এসেছে কাঁধের ওপরে, কপাল আধখানা ঢাকা চূর্ণকুন্তলে, ঠোঁটদুটো সোনার রসে রাঙানো, গালদুটো আপেলের মতো টুকটুকে লাল, দুকানে সাপের মতো কানছাপি, সাপ দুটোর পাথরের চোখ জলজ্বল করছে, হাতের ওপর দিকে মাছের ডিজাইনের বাজু, কোমরের ওপর দিকটা একেবারেই লেফাফাহীন, নিচের দিকটায় হাঁটু পর্যন্ত একসারি ফালিফালি রেশমের ঝিলিমিলি, কিন্তু একটা উরুত প্রায় অনাবৃত। ফট করে সব আলো নিভে গিয়ে শুধু একটা স্পটলাইট যখন জ্বলে উঠবে অর্কেস্ট্রার উদ্দাম তালে, তখন সত্যিই মনে হবে এক মোহিনী জলকন্যা নীলনদের বুক থেকে সদ্য-সদ্য উঠে এসেছে।"

"কিন্তু নফরদা ঈজিপ্টের মেয়েরা তো অমন বেলাজ বেহায়া নয় ? যদিও ধনী-কন্যারা হালে আধামেমসাহেব বনেছে, অধিকাংশই তো বেজায় আব্রু মেনে চলে ?"

"আরে মূর্খ, এ 'নিম্ফ-অফ-দি-নাইল' খৃষ্টজন্মের চার হাজার বছর আগেকার ঈজিপ্ট থেকে এসেছে, তখনকার মিশরী মেয়েরা ওরকম বেশেই থাকত, থিব্‌স্ আর মেম্ফিস-এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেমনটি দেখা গেছে। তফাতের মধ্যে, তারা নাই-এর নিচ থেকে কোমর পর্যন্ত একখানা কাপড় টাইট করে জড়াতো। কিন্তু পাঁচ টাকা এডমিসন চার্জ, ডিনার-ড্রিঙ্কস-টিপে আরো তিরিশ টাকা, মাথাপিছু এই পঁয়ত্রিশ টাকা খরচা করে যারা নাইটক্লাবে বন্ধুবান্ধবী নিয়ে ফুর্তি করতে

আসবে তাদের মন রাখতে একটু রসসৃষ্টি করবার দরকার, না হলে লোক আসবে কেন?"

"তাহলে ওকে তো বেশ মোটা টাকা দিতে হয় ডায়মণ্ড নাইটক্লাবের কর্তাদের? না হলে ও-ই বা এরকম সেজে নাচবে কেন এক গাদা লোকের ড্যাবডেবে চোখের সামনে?"

"কচু পোড়া! খোদ ঈজিপ্ট থেকে আনতে হলে যাতায়াতের ভাড়া ছাড়া তিন মাসে দিতে হত হাজার পনেরোর কম নয়, তার ওপর হোটেল খরচা। ওকে হয়তো দেবে বড়জোর তিন হাজার। যদি এবার ও বেশ জমাতে পারে, নাইটক্লাবের বেশ লাভ হয়, তবে আসছে বছর হয়তো আর তিন মাসের কণ্ট্রাক্ট পাবে। তখন হয়তো ওর নাম দেওয়া হবে—প্যারিসিয়েন পুশী। গাইবে ফ্রেঞ্চ গান, চুলের রঙ হবে সোনালী, আরো লেফাফাহীন হয়ে নাচবে 'স্ট্রিপটিজ' ও 'ক্যানক্যান' নৃত্য। ফরাসী ঢঙে মেকীসুরে ইংরেজী দু-এক কথা বলবে। নাচতে-নাচতে হয়তো কোনো ভদ্রলোকের কোলে হঠাৎ বসে পড়ে তার গালে চুমো খেয়ে বলবে—'সুইংহার্ট, আই লভ্ ইউ ভেয়ারি-ভেয়ারি মাচ্, দোন্ত আই দার্লিঙ?' ভেবে দেখ কাঞ্চন, সে ভদ্রলোকের তখন কি অবস্থা, পাশে বসে তার স্ত্রী হয়তো জ্বলন্ত দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণ করছে।"

"বাকি ন-মাস চলে কিসে এর?"

"কোনো রেস্টরাণ্টে ডিনার-টাইমে গান গেয়ে। মেরি উইডো, লাকিস্টার, হলিউড, সাউথ প্যাসিফিক, মুনলাইট, এ-সব নামের কত রেস্টরাণ্টই না গণ্ডায়-গণ্ডায় গজিয়ে উঠেছে কলকাতায়, যেখানে ডিনার খেতে-খেতে গান শোনারও বন্দোবস্ত আছে। একদল লোকের অনাটন বাড়ছে, আর এক দলের টাকা বাড়ছে এই নয়াযুগে; যাদের বাড়ছে তারা খরচা করতে চায়, ফুর্তি লুটতে চায়। রকমারি প্রয়োজন, রকমারি আয়োজন। কলিকালের কলকাতা আর দিশী সরকারের দৌলতখানা দিল্লি সেই আয়োজনের যোগানদারিতে পাল্লা দিচ্ছে।"

হঠাৎ নফরদা হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে, ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ছুটে একটা বাসে উঠলেন। বোধহয় বক্সিং ক্লাসের সময় এসে গিয়েছে।



লিফ্‌ট-এ নামছিল তিনটি মেয়ে। মলি টেভারেস, মোজেল ডেভিস, মেরা গোল্ডার্স। তিনজনেই কাজ করে চারতলার ক্রুকস্যাঙ্ক এণ্ড ম্যাক্মোয়েল লিমিটেড-এ। মলি টেভারেস আর কাল থেকে বলতে পারবে না সে এখানে কাজ করে, বলবে এখানে কাজ করত; কারণ চাকরি খতমের যে এক মাসের নোটিস পেয়েছিল আজ তার শেষ দিন।

আবার সার্টিফিকেটগুলো সঙ্গে নিয়ে এ-অফিস ও-অফিসে অন্য একটা চাকরির খোঁজে ঘুরতে হবে, অনেক অফিসেই দরজার সামনে 'নো ভেকেন্সি' নোটিসের চাবুক খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে হবে, রোজ আবার স্টেটসম্যানের 'ওয়াণ্টেড' কলম তন্ন-তন্ন করে দেখতে হবে। দরখাস্ত পাঠানো, ইণ্টারভিউয়ে হাজির হওয়া, ডিক্‌টেশন পরীক্ষা—ফের সব কেঁচে গণ্ডূষ!

বড়-বড় অফিসে স্টেনোটাইপিস্ট মেয়েদের চার্জে থাকে 'হেডগার্ল'। ঐ মেয়েদের দলে কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধাও থাকে, তবে হেডগার্ল হয়তো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সেক্রেটারী, সে-হেতু কম বয়স হলেও পদাধিকারের দাবিতে সে আর সবার ওপরে ছড়িদারি করে। সেই হেডগার্লই ডিক্‌টেশন-টেস্ট নেয় প্রথমে, সর্টহ্যাণ্ডবুকে টুকে টাইপ করা কাগজটা তার কাছেই দাখিল করতে হয়, সে শ্রীমতী যদি বলে 'চলবে না' তবে পত্রপাঠ বিদায়। তার কাছে পাশ হলে সে পাঠিয়ে দেবে যে-সাহেবের কাজ করতে হবে তাঁর কাছে। ছোট অফিসে মেজ-সেজসাহেবই ডিক্‌টেশন টেস্ট নেবেন, খুশি হলেও সেই মামুলী বাত—এক মাসের জন্যে ট্রায়াল দিতে পারি, তারপর কাজ ভালো হচ্ছে না দেখলে চলে যেতে হবে।

নতুন অফিস, নতুন লোকের কাছে ডিক্‌টেশনের সর্টহ্যাণ্ড নিতে ঘাবড়ে যেতে হয়। সবার উচ্চারণ, সবার বলবার কায়দা একরকম নয়। যত ভালোই ইংরেজী দুরস্ত হোক না কেন মাদ্রাজী বাঙালী পাঞ্জাবী মারাঠী সিন্ধীদের উচ্চারণভঙ্গীতে

ঢের তফাত, কিন্তু এই কালোসাহেবদের বরাত খুলেছে দিশী রাজত্বে। ছোট-ছোট ক্যাবিনে এই সব নতুন সাহেবদের দাপটে অফিসের চুনোপুটিরা তটস্থ। ধন্যি ইণ্ডিয়ানাইজেসন! এরা একাধারে সুন্দরী টাইপিস্টের গাল টিপে দিতে চায়, ইতর রসিকতা করে। কেন? ওদের বাড়িতে কি বোন বৌদি বোনঝি নেই? নারী কি পুরুষের কাছে খেলার পুতুল? খাঁটি সাহেবরা তো এরকম ছেনালপনা করে না এই মেকী সাহেবদের মতো?

মলি টেভারেস নিজেই অবাক হল, লিফ্‌টে নামতে-নামতে এই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এতগুলো কথা কি করে মনে এসে গেল? আজ দেড়বছর ও রোজ অফিসের শেষে মোজেল ডেভিস ও মেরী গোল্ডার্সের সঙ্গে এই লিফ্‌টেই নেমেছে, কই এ-সব তো তার মনে আসেনি? নিশ্চিন্ত বর্তমান ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝখানে এই রিক্ততার সুযোগ পেয়েই কি এ-সব চিন্তা ভিড় পাকিয়ে এল? মলি টেভারেসের চেহারা মিষ্টি, দোহারা গড়ন, কচিকলাপাতা রঙ, হরিণের মতো বড়-বড় ভীতু-ভীতু কালো চোখ কালো চুলের সঙ্গে ছন্দেব মিল রেখেছে। মোজল ডেভিসের খড়্গ-নাসিকা যেন ইহুদী-হোমল্যাণ্ড ইস্রাইলের জাতীয় প্রতীক, দেখেই বোঝা যায় এব্রাহাম-ডেভিড-সলোমনের গোষ্ঠী। মেরী গোল্ডার্স কালো-কোলো ধ্যাসধেসে বেঁটে, আর দুটি সঙ্গিনীর মাঝখানে দেখায় যেন সন্দেশের পাশে লেডিকেনিটি, বিশেষত যখন পাউডারের পলেস্তারা ঘামে ধুয়ে গিয়ে ভিতরের কালো পলিমাটি বেরিয়ে পড়ে।

পাঁচশো বছর আগে ইউরোপ থেকে প্রথম চালানের পর্তুগীজ ধুরন্ধরা এদেশে এসে যে বর্ণশঙ্কর সমাজের বীজ বপন করেছিল সেই কালাফিরিঙ্গী বা কিস্তালিরা ক্রমে-ক্রমে বিবিধ শাদাজাতের, উপরন্তু ইহুদী ও আর্মেনিয়ান রক্তের, সার পেয়ে ফলন্ত বাড়ন্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। শেষে ইংরেজ আমলে রাজার জাতের বহুবিধ দান ও দয়ায় পুষ্ট হয়ে সরকারী খাতায় নামকরণ হল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ওরফে ইউ-রেশিয়ান। রাজরক্তের যোগাযোগে ওদের মেজাজ বাড়ল, দেমাক বাড়ল। বহু আগে, পর্তুগীজদের অনেক-অনেক আগে যে-সব গ্রীক শক হুণ পাঠান মোগল ভারতে এসেছিল তারা নুনের পুতুলের মতো 'এই ভারতের মহামানবের সাগরজলে একে-একে হল লীন,' তারা কোনো আলাদা সমাজ সৃষ্টি করে যায়নি, কিন্তু ভাস্কোডাগামার পরে যে-সব শাদাজাতরা এল টাকা ও ফুর্তি লুঠতে তাদের সৃষ্টি

কিস্তালি বা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে, শাদা ও কালো-জাতের মধ্যে এখনো একটি হাইফেনের মতো যোগসূত্র বজায় রেখেছে।

ষোলো শতকের কলকাতাবাসী যাদের নাম দিয়েছিল কালাফিরিঙ্গী ওরফে কিস্তালি, সেই পর্তুগীজ ডাচ ফরাসীদের ঔরসে দিশী জেনানার গর্ভে যারা জন্মেছিল তাদের বেশিরভাগই ছিল দেখতে খাসা। ঠাণ্ডাদেশের আমদানী বীজে গরমের দেশের মাটিতে যে ফুল ফোটে তা প্রথমে আরো বেশি সুন্দর হয়, যেমন ডালিয়া, ক্রিস্থান্থিমাম, গ্লাডিওলি, বসরার গোলাপ। কিস্তালি মেয়েদের রূপের আগুনে তাই বহু খাঁটি সাহেবপুঙ্গব পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিল। শেষে ইংরেজ আমলেও অনেক বড়কর্তারা নিজেদের সামলাতে পারেননি, ফোর্ট উইলিয়ামের গোরাসৈন্যদেরও বেঁধে রাখতে পারা যায়নি।

লিফ্‌ট থেকে নেমে মলি টেভারেস তার হাতব্যাগটা খুলে গোটাকয়েক নোট মেরী গোল্ড্‌স-এর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, "শোধ দিতে দেরি হয়েছে, কিছু মনে কর না।"

কলকাতার অফিস-অঞ্চলে যে-সব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরা স্টেনোটাইপিস্টের চাকরি করে তাদের জীবন যেন ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়ার জীবন। ঐ ঘোড়াদেরই মতো সংসারের ভার টানতে হয়রান, অভাবের চাবুক সপাং-সপাং পিঠে পড়ে। ধারকর্জ লেগেই থাকে, শোধ দিতে-দিতে আবার ধার হয়। ইংরেজেরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পুষ্যিপুত্তুরের মতো নেক নজরে দেখত, নিজেদের জাতের অপকর্মের ঋণ শোধ দিতে। ডাকবিভাগ, তারবিভাগ, রেলবিভাগ, পুলিসবিভাগ, শুল্কবিভাগ, মিল, কারখানা, জাহাজঘাটায় অনেক দরজা খোলা ছিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মরদের জন্যে, বিদ্যাবুদ্ধি যাচাই করা হত না। এখন ওদের কোলে ঝোল টানবার কেউ নেই, ওদের ভাগ্যে যেন 'পদ্মপত্রে জল সদা করছে টলমল'। কারণ যেখানে সমানে-সমানে চাকরির জন্যে প্রতিযোগিতা সেখানে ওরা দাঁড়াতে পারে না। তাই পুরুষদের মধ্যে বেকারের দল ভারি হচ্ছে। এণ্টালী পাড়ায় তাই এখন দেখা যায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরারা চোঙার মতো পাতলুন ও চটকদার বুস্‌সার্টে টেডীবয় সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেয়েরা চাকরি করে বাপ-ভাইকে পুষছে।

সে-চাকরির বেশির ভাগই টাইপিস্টের চাকরি। যতদিন বিলিতি মার্চেন্ট-অফিসগুলো আছে, চিঠিপত্তর ইংরিজীতে চলবে ততদিন ওদের পেটও এ-ভাবে

চলবে, কারণ হাজার হলেও ইংরেজী ওদের খাসবুলি, বানান ও ব্যাকরণ যতই ভুল করুক না কেন, এবং উলবোনা সেলাই করার মতো টাইপিং-ও মেয়েলি হাতেই ভালো হয়। কোলের বাচ্চাও খিদে পেলে মায়ের বুকের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেয় বাপের আঙুল চোষে না।

ওরা চাকরিতে যা রোজগার করে তা মন্দ নয়। ভালো ম্যানেজার বিস্তর পাওয়া যায় কিন্তু ভালো সেক্রেটারী দুর্লভ হয়ে উঠছে। যে স্টেনোটাইপিস্ট ভালো কাজ দেখিয়ে কোনো সাহেবের নিজস্ব এক্তিয়ারে বহাল হবে সে তখন হল তার সেক্রেটারী, যে পাকাপোক্ত হতে পারেনি বলে বারোয়ারী কাজ করে সে স্টেনোটাইপিস্ট পর্যায়েই পড়ে থাকে। সাহেব তার সেক্রেটারীর কথা বলতে বলবেন 'মাই গার্ল' ওখানেই ঐ শ্রীমতীটি অন্য মেয়েদের থেকে একধাপ উপরে উঠে গেল এবং সেই সাহেবের বেবাক ব্যক্তিগত ও গূঢ় ফাইলের জিম্মেদারি হাতে পেল। সে-হেতু মাইনেও বেশি।

ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে অফিসের চাকরিতে ক্রমে-ক্রমে পার্শী বাঙালী পাঞ্জাবী মেয়েরাও ঢুকছে। ধোপদোরস্ত ফিটফাট হয়ে রোজ না এলে শাদাসাহেব কালো-সাহেব কোনো সাহেবই পছন্দ করেন না। তাই মাইনের একটা মোটা অংশ যায় বসন ভূষণ প্রসাধনে। চেহারার চেকনাইয়ে যা ঘাটতি আছে তা পুষিয়ে নিতে স্মার্ট হতে হবে। স্মার্ট না হলে প্রমোশনের কথা কর্তারা আমল দেবেন না। মুখের মেক-আপ গরমের দেশে অনেকক্ষণ টেকসই হয় না, মাঝে-মাঝে মেরামতির দরকার। গায়ের ব্লাউজ় ঘামে ভিজে ওঠে, সুঘ্রাণ উঠে যায়। হাতের আঙুলে কার্বন-পেপারের ছোপ লাগে, তা মাঝে-মাঝে সাবান জলে ধুয়ে ফেলতে হয়। তাই ওদের হ্যাণ্ড-ব্যাগে দেখা যাবে চিরুনি, লিপস্টিক, সেণ্ট, পাউডারের বাক্স, ছোট তোয়ালে, রুমাল। যাদের বিয়ে হয়নি তাদের ব্যাগে অধিকন্তু পাওয়া যাবে বয়ফ্রেণ্ডের ফটো ও তার খানকয়েক চিঠি, গোটাকয়েক ফোন-নাম্বার। যারা সিগারেট ধরেছে তাদের ব্যাগে আরো দেখা যাবে এক প্যাকেট সিগারেট আর লাইটার।

মোজেল ডেভিসকে বড়সাহেব একটা জরুরী রিপোর্টের জন্যে শেষ পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন, তাই ও অফিস থেকে বেরোবার আগে মুখের মেক-আপ যথারীতি মেরামত করার সময় পায়নি। লিফ্টের আড়ালে গিয়ে ব্যাগ খুলে একটু পাউডার ও লিপস্টিক মেখে নিল, কম্প্যাক্টের ছোট্ট আয়না দেখে। লিপস্টিকের রঙ যাতে

ধ্যাবড়া হয়ে গালে বা চিবুকে না লাগে সেজন্যে বেশ হুঁশিয়ারী দরকার, জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো সামান্য একটু ভিজিয়ে না নিলে রঙটা সমানভাবে লাগতে চায় না, তারপর রুমাল দিয়ে আস্তে উপর নিচ ও পাশের বাড়তি রঙটা মুছে ফেলতে হয়। এর পরে চিরুনি দিয়ে চুলটা ফিটফাট করা, অতঃপর একটু সেন্ট গায়ে দেওয়া। এই কর্মসূচীটি অফিস থেকে ফেরবার মুখে অবশ্য পালনীয় এদের, তাই অফিস ভাঙবার যে সময় তার পনেরো মিনিট আগে একটি টাইপিস্টকেও ডেকে পাওয়া যায় না। কোথায় যায়? টয়লেট রুমে। যতই চটুন না কেন সাহেবরা এটা বরদাস্ত করে যান। পেটের দায়ে চাকরি করতে এলেও তো এরা নারী! নারীর অনেকরকম প্রয়োজন আছে, যার দুয়ার পুরুষের কাছে রুদ্ধ। অতএব শিভালরাস পুরুষকে এসব নারীসুলভ ব্যাপারে সহনশীল ও নির্বিকার থাকতে হবে।

লিফ্‌টের একপাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মেরী গোল্ডার্স দেখছিল মলি টেভারেসের চোখ ছলছল করছে। ওরা আজ দেড়বছর পাশাপাশি কাজ করেছে, যখনি মলি খাজা স্কচম্যান ম্যাকডুগাল সাহেবের ডিকটেশন ভালো করে টুকতে পারেনি, তখনই মেরীর শরণাপন্ন হয়েছে, যখনি হাতে টাকা নেই মেরীর কাছে হাওলাত করেছে। সব মুশকিল আসানেই মেরী ছিল ওর অগতির গতি। মেরীর রূপ নেই, কিন্তু ভিতরে খাঁটি সোনা। তাই মেরীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সময় মলির চোখে জল।

মেরী যেন দেখতেই পায়নি যে মলির চোখে জল, সহজ গলায় বলল, "মলি, চল ফিরবার পথে কোয়ালিটিতে আইসক্রীম খেয়ে যাই।" মলি যে আইসক্রীম ভালোবাসে তা ও জানত কিন্তু জেনেও যেন জানে না, পাছে মলি বিব্রত বোধ করে।

মোজেল লিফ্‌টের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে জিগগেস করল, "কোয়ালিটির কথা শুনলাম না?"

অগত্যা মেরীকে বলতে হল, "আমরা তিনজনেই যাচ্ছি আইসক্রীম খেতে।" মলি মুখ নিচু করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ মেরী, কিন্তু আমি যেতে পারব না, মা'র বড্ড অসুখ, সোজা বাড়ি ফিরতে হবে। আর একদিন যাব কোয়ালিটিতে।" মোজেল মলির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জানিয়ে দিল সে মেরীর সঙ্গে যাচ্ছে। আর একদিন বরঞ্চ তিনজনে একসঙ্গে যাবে। মোজেল বড়সাহেবের সেক্রেটারী, বড়সাহেবের কান ভাঙিয়ে ও অনেকের চাকরি খেয়েছে তাই ওকে তোয়াজে রাখতে হয়। ও

ইহুদীকন্যা, এক পয়সা হাতের ফাঁকে গলে না। কাউকে খাওয়ায় না, খেয়েই বেড়ায়। বলা কথা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, চোখে-চোখে কি একটা ইশারা হয়ে গেল মলি ও মেরীর মধ্যে। মলিকে গুডবাই ও গুডলাক জানিয়ে, ভিতরে-ভিতরে গজগজ করতে-করতে মোজেলের সঙ্গে মেরী চলল পার্ক স্ট্রীটে কোয়ালিটি রেস্টরাণ্টে।

কলকাতায় বিলাতী সওদাগরী অফিসগুলোতে একটা জাতিভেদের গোঁড়ামি ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীর আমল থেকেই বজায় আছে। প্রথম দেড়শো বছর সে জাতি-ভেদ-লাইনের একদিকে ছিল শাদারা অর্থাৎ সাহেবরা, আর একদিকে কালোরা অর্থাৎ দেশী লোকরা। 'সাহেব' কথাটা এসেছে বাদশাহী পুরনো-জমানা থেকে। উর্দুতে 'ছাহেব' মানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বিদেশী ইউরোপিয়ানরা এদেশে এসে ঢালাও চালে সবাই সম্ভ্রান্ত হয়ে বসল। 'ছ' অক্ষরটি ওদের জিভে ঠেকে যায়, তাই হল 'স' 'ছাহেব' হল সাহেব, ম্যাডামসাহেব হল মেমসাহেব। তারপরে বিশ শতকের প্রথম দিকটায় দু-একটি করে বাঙালী কৃতিসন্তান যোগ্যতার জোরে ইউরোপিয়ান কমার্সিয়াল অফিসগুলোয় ঢুকে পড়লেন উচ্চ পদে, তখন তাঁরাও পদগৌরবের দৌলতে সাহেব শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তারপরে স্বাধীনতার পরে ঝাঁকে-ঝাঁকে বাঙালী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী উপরওয়ালা সাহেবদের চেয়ারে গিয়ে বসল ইণ্ডিয়ানা-ইজেসনের হিড়িকে। শাদা ও কালোর ভিতরে জাতিভেদের রেখাটা তাই খানিকটা নড়েচড়ে বসল, একপাশে সাহেবরা অর্থাৎ শাদা কালো তামাটে এক্জিকিউটিভরা আরেকপাশে 'বাবু'রা মানে কেরানীরা। সাহেবরা মোটা মাইনে পান, গাড়ি পান, বাড়ি পান, ছুটির এ্যালাওয়েন্স পান, ক্লাব আর এণ্টার্টেনমেণ্ট খরচা পান, অসুখ হলে ডাক্তার ও হাসপাতালের খরচা পান। বাবুরা মাত্র মাইনেটা পান, তাও বেশি নয়, তা-ছাড়া আর কিছুই পান না। আগে সাহেবদের খেয়ালখুশি মতো কথায়-কথায় ওদের চাকরি যেত, এখন লেবার ট্রাইবিউনালে আপীল চলে, ট্রেড ইউনিয়ান ওদের হয়ে লড়ে থাকে। এই মহাজন ও হরিজনদের মধ্যস্থলে মেয়ে স্টেনো-টাইপিস্টরা। সাহেবদের কাছ থেকে ছিটেফোঁটা সুযোগ-সুবিধা ওদের পাতেও এসে পড়ে, যেমন ম্যাটার্নিটি লীভ, হানিমুন লীভ, বেশি ক্রিসমাস বোনাস ইত্যাদি। আগে এই মেমসাহেবরা বনবেড়ালের মতো বাবুদের মুখের উপর দাঁতখিঁচতো, হালে সুর বদলিয়েছে।

অফিসের বাইরে এই মেমসাহেবি বজায় রাখতে এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান

কিস্তালিদের মাশুল দিতে হয় চড়া হারে। বাড়িওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ফলওয়ালা, দর্জি, আয়া, কুক—সবাই ঐ মেমসাহেবি ভাঙিয়ে দু-পয়সা বেশি লাভ উশুল করে। অনেক কিস্তালি মেয়েরা অভাবে পড়ে আর একটা রোজগারের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়, যা পৃথিবীর সবচেয়ে আদিমকাল থেকে চলে এসেছে। রাত্রের গোপন অন্ধকারে পরপুরুষের কাছে মূল্যের বিনিময়ে দেহদান। এ জগতটাকে চালাচ্ছে পুরুষরা। অ-সম ধনতান্ত্রিক যুগে নারীর অভিশাপ এই প্রলোভন পুরুষেরই সৃষ্টি। অথচ পুরুষরাই এর বিরুদ্ধে পঞ্চমুখ। পুরুষরা মুখে বড়-বড় কথা বলে, আইন করে এ ব্যবসা বন্ধ করতে চায় সোচ্চারে, কিন্তু পুরুষরাই সঙ্গোপনে সে আইন ভাঙবার যম। চমৎকার!

রয়েড স্ট্রীটের মোড় ছাড়াতেই মলি নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। ট্রামস্টপে দাঁড়িয়েছিল রডনী, সে মলির হাত ধরল। রডনী রপার্স ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের একজন সুপারভাইজার। আজ ওর রাতের ডিউটি। আধ-ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই ট্রামস্টপে মলির পথের দিকে চোখ পেতে।

"চল মলি, মিকি মাউস-এ। আজ প্রন কাটলেট আর হ্যামস্যাণ্ডুইচ অর্ডার দিয়ে এসেছি।"

'মিকি মাউস' একটা রেস্টরাণ্ট, একজন বুড়ো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ওর মালিক, রডনী প্রায়ই মলিকে ওখানে নিয়ে যায়।

মলি হাত ছাড়াতে চাইল, "না, না, রডনী, মা'র অসুখ তো জানো? আর একদিন হবে, আজ নয়।"

রডনী মলির হাত ছাড়ল না, বলল, "লাঞ্চের পরেই আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম, এতক্ষণ ওখানেই ছিলাম, জ্বর এখন নর্মাল, আমি চা বানিয়ে খাইয়ে এসেছি, ব্যস্ত হবার কিছু নেই, এস আমার সঙ্গে।"

রডনীর জোয়ান চেহারা শ্যামবর্ণ, কথা বলে কম। ও ভাবে—আহা বেচারা মলি, এ-বয়েসেই অদৃষ্টের চাপে যেন হাঁপিয়ে পড়েছে। যাক এখানে দু-দণ্ড ওর সময় কাটবে ভালো, আর অফিসেও দুপুরবেলাই বা এমন কি খায়? দুটো ডিমসেদ্ধ আর এক স্লাইস সিঁটকে পাউরুটি, এই তো?

রডনী একেই কথা বলে কম, মলির সামনে চেয়ারে বসে ওর কথা আরো যায় কমে, চোখ পড়ে থাকে মলির মুখের দিকে। কিন্তু মলির মুখ খুলে যায়, অনর্গল কথা

বলে, যেন পাথরের চাঙটা সরে গিয়ে ঝরনার মুখ খুলে গেছে। অফিসে কি কাজ সারাদিন করল, কে কি বলেছিল, ঘোষসাহেব সমস্তদিন অমন ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপা হয়েছিল কেন, বোধহয় ওর মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিল, মিস ডিক্রুজ বড় মুশকিলে পড়েছে, বোধহয় বাচ্চা পেটে এসেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর হঠাৎ থেমে গিয়ে জিগগেস করে, "রডনী, ভূতের মতো চুপ করে আছ কেন, ঠোঁটে কেউ কুলুপ এঁটে দিয়েছে, না আমার মুখটা চিড়িয়াখানার একটা নতুন আমদানী কোনো জানোয়ারের মতো যে হাঁ করে তাকিয়ে আছ?"

রডনী একটু হাসে, কথা বলে না, মলির কাপে আরো একটু কফি ঢেলে দেয়। এরকম প্রায় দিনই হয়, মলির কাছে বসলে ওর মন খুশিতে ভরে থাকে, যদি মলির হাতের ছোঁয়া ওর হাতে লাগে তবে হাত কাঁপতে থাকে। সে ছোঁয়াটুকু বড় মিষ্টি। এ-দুবছর আলাপ, কিন্তু মলিকে ডিয়ার বা ডার্লিঙ বলতে ওর লজ্জা করে, মলি ওর কাছে কুড়ি বছরের একটি টাইপিস্ট মেয়ে নয়, যেন কোনো রাজকন্যা, তাকে কাছে পেলেই ও নিজেকে ধন্য বলে মনে করে।

মলি জানে না, কিন্তু রডনী জানে ওর বংশের আদিপুরুষ কত বড় ঘরের ছেলে ছিল। বই পড়া ছাড়া রডনীর আর কোনো নেশা নেই, কিন্তু সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে ঐ সাতপুরনো লজঝড়ে বইখানা কি কুক্ষনেই কিনে নিয়ে এল! সারারাত সেদিন ও ঘুমোতে পারেনি। হুগলী ব্যাণ্ডেল যার হাতে গড়া, তমলুক, জিওনখালি, বালেশ্বর, হিজলী, পিপলি, শ্রীপুর-ভুলনায় যিনি পর্তুগীজ বাণিজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন, সম্রাট আকবর "দোস্ত" সম্বোধনে দিল্লির দরবারে যাকে সম্মান দেখিয়েছিলেন, বাঙলার নবাব মামুদ শা যাকে খাতির করতেন তার নামের পদবীও যে টেভারেস! সেনর পেড্রো ম্যানুয়েল কস্টেলো ফার্নাণ্ডো টেভারেস! এ-বইটায় পরিচয় দিচ্ছে এই সেনর টেভারেস ছিলেন পর্তগালের নামকরা খানদানি বংশের, কর্ডোভার বিরাট জমিদার কাউণ্ট জুয়ানো আলভারেস ব্রাগাঞ্জা ব্যাপটিস্টা কার্ভালো টেভারেস-এর একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী!

মলির মা-ও একদিন বলেছিল ওরা অনেকপুরুষ আগে নাকি হুগলী থেকেই এখানে আসে। তাই রডনী একদিন ছুটে গেল ব্যাণ্ডেলের চার্চে, যেখানে সাড়ে চারশো বছরের পুঁথিপত্র দলিল দস্তাবেজ ঘাঁটলে, কিন্তু টেভারেস পদবীর আর কোনো পরিবারেরই হদিস পেল না। খোঁজ নিল গোয়াতে, কিন্তু সেনর পেড্রো

টেভারেসের নাম ছাড়া আর কোনো টেভারেসের নাম পাওয়া গেল না। ইংল্যাণ্ডের ডিউক অফ ডেভনসায়ার, ডিউক অফ গ্লস্টার, ডিউক অফ কেণ্ট, আর্ল অফ পেমব্রোক পদবীগুলো যেমন একটি ছাড়া দুটি নেই, তেমনি এই টেভারেস নামটিও কি প্রাচীন পর্তুগালে একটি মাত্র বিশিষ্ট বংশের গৌরব বহন করত ?

রডনীর মনে একটা দ্বন্দ্ব চলছে, এমন সময় মলির মা একদিন কথায়-কথায় বললেন, "ঐ টিনের মরচে-পড়া বাক্সটা দেখছ ? ওটা আমি খুলেও দেখেনি কি আছে, মলির ঠাকুর্দাও বলেছিলেন ওটা তিনিও কখনো খোলেননি, তালাটা বেজায় শক্ত, চাবিটাও বহুকাল আগে হারিয়ে গেছে, পার তো দেখ না খুলে সাবেককালের মোহরটোহর কিছু আছে নাকি, আমাদের যে অবস্থা চলছে তাতে দশটা টাকাই বা কোত্থেকে আসে ?"

রডনী খুলেছিল বাক্সটা অনেক কষ্টে, ছাদের উপর নিয়ে গিয়ে। পেল একখানা বাইবেল, বুঝল ভাষাটা হয়তো পর্তুগীজ, একটা ছাতাপড়া তরোয়াল, আর একটা লকেট, পেতলের মতো দেখাচ্ছে। মলির মা শুনে বললেন, "পেতলের মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু সোনাও তো হতে পারে ? চেষ্টা করে দেখ রডনী, বেচে কিছু পাওয়া যায় কিনা।"

রডনী ছুটল মুর্গীহাটার পর্তুগীজ চার্চের বড় পাদ্রীসাহেব মোস্ট রেভারেণ্ড ফাদার সীবাস্টিয়ানের কাছে।

ফাদার সীবাস্টিয়ান পক্ককেশ পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ, পণ্ডিত বলেও নাম আছে। তিনি কি একটা গুঁড়ো দিয়ে লকেটটি অনেকক্ষণ ঘষলেন, ম্যাগনিফাইং কাঁচে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, "এটি তোমার ?"

রডনী জবাব দিল, "না, কিন্তু ভালো করে দেখুন এটা পেতল, না সোনা ?"

"কোথায় পেলে ?"

বৃদ্ধের চোখে কেমন একটা সন্দেহ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে রডনী আস্তে-আস্তে বলল, "ওটা এক বৃদ্ধা মহিলার। যদি সোনা হয় তবে বিক্রি করবার ভার আমাকে দিয়েছেন, যদি পেতল হয় ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

"তিনি কেন বিক্রি করতে চাইছেন ?"

"বড্ড গরীব। বলুন দয়া করে ফাদার, সোনার নাকি ?"

"তুমি তাঁর কে ?"

"এক মেয়ে ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই, তাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করব, এই আশা। উনিও আমাকে সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু মেয়েটি এখনো জানে না।"

"তুমি কোন চার্চের ?"

"রোমান ক্যাথলিক।"

"লকেটটি সোনারই বটে, বাজারে বিক্রি করলে সোনার দামই পাবে, তবে—"

"তবে কি ফাদার ?"

"লকেটটির একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে, এর একপাশে লেখা আছে 'রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও রাণী ইজাবেলার বিশ্বস্ত বন্ধু'. অন্যদিকে লেখা আছে 'কাউণ্ট টেভরেস-ডা-কর্ডোভা'।"

রডনীর বুকের ভিতর তখন কে যেন হাতুড়ি পিটছে, কানে এল, "ব্যাণ্ডেলের ফাদার কুন্হাকে জানাতে তোমার কোনো আপত্তি আছে ?"

"না, ফাদার।"

সীবাস্টিয়ান উঠে ভিতরে চলে গেলেন। পনেরো মিনিটেরও বেশি পরে এসে বললেন, "ফাদার কুন্হার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হল। উনি বললেন স্যাকরার কাছে বেচলে তো গালিয়ে ফেলবে, তার চাইতে বরং আমরাই এটাকে কিনে রাখি।"

রডনী একটু আশ্চর্য বোধ করল, বলল, "চার্চ এটা কিনে নিয়ে কি করবে ?"

"চার্চের কোনো দরকার নেই। লিসবনের হিস্টরিকাল রিসার্চ ডিরেক্টরেটকে আমরা চিঠি লিখে জানাব, হয়তো তাঁরাই আমাদের কাছ থেকে আবার কিনে নেবেন। তুমি পাঁচশো টাকায় রাজী ?"

"এত আশা করিনি ফাদার, আপনার দয়া, মহিলাটি বড় কৃতজ্ঞ হবেন, তাঁর কাছে পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজারের মতো।"

"তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে পার ?"

"তিনি অসুখে শয্যাগত।"

"এই নাও একশো টাকার পাঁচখানা নোট। এই কাগজে লিখে দাও তাঁর নাম-ঠিকানা, তারপরে তোমার নাম-ঠিকানা, তাঁর হয়ে পাঁচশো টাকা পেয়ে তুমি এই লকেটটি আমার কাছে বিক্রি করছ বলে রসিদে সই কর। আমরা ভগবান খৃষ্টের

দাস, চার্চ ফাণ্ডের আমরা জিম্মেদার মাত্র, তাই হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হয়। মনে ভেব না তোমাকে অবিশ্বাস করছি, কিন্তু নিয়ম মেনে আমাদের চলতে হয়।"

টাকাটা নেবার সময় রডনীর হাত কাঁপছিল, নত জানু হয়ে সে ফাদার সীবাস্টিয়ানের আলখাল্লায় চুমো খেল ভক্তিভরে। ফাদার তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, "আভে মারিয়া, আভে মারিয়া, আভে মারিয়া, এসপেরিটো স্যাণ্টো, এসপেরিটো স্যাণ্টো, এসপেরিটো স্যাণ্টো।" রোমান ক্যাথলিক রডনী জানত এই লাটিন স্বস্তিবচনের অর্থ—মেরী মাতার জয়, মেরী মাতার জয়, মেরী মাতার জয়; ঈশ্বর পুত্র যীশুর জয়, ঈশ্বর পুত্র যীশুর জয়, ঈশ্বর পুত্র যীশুর জয়।

রডনীর বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ি পিটছে। হে পরম পিতা, যীসাস ক্রাইস্ট, তুমি না পরম দয়ালু? এই হতভাগ্য টেভারেস-বংশধরদের তুমি কোথায় নিয়ে এসেছ? কিন্তু আজ তোমার এই দান ওরা জীবনে কখনো ভুলবে না।

রোগজরাজীর্ণ মলির মাকে রডনী তাদের এই বংশ পরিচয় দেয়নি, শুধু টাকাটাই তুলে দিয়েছিল। পরিচয় পেলে বুড়ি হয়তো আরো ভেঙে পড়ত। মলির কাছেও গোপন রেখেছিল, যাতে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা ওর কোমল মনে আঘাত না হানে। কিন্তু মলির কাছে বসলে মাঝে-মাঝে ওর চোখের সামনে অতীত কালের একটা ছবি ভেসে ওঠে:

রুপোর পাতে মোড়া শাদা চার ঘোড়ার ল্যাণ্ডো গাড়িতে চলেছেন পর্তুগীজ-বাঙলার 'কমান্দান্তো,' গভর্ণর টেভারেস, হুগলী থেকে ব্যাণ্ডেলের গুদামগুলি পরিদর্শনে। লাল সাটিনের পাতলুন, লাল সাটিনের উপর সোনার কাজ-করা কোট, শাদা টুপির মাথায় ডানা মেলে আছে সোনার পাখি, পর্তুগীজদের সমুদ্রবিজয়ের সগর্ব প্রতীক, কোমরে শাদা চামড়ার খাপে 'এস্পাডা,' সামনে ও পেছনে দাঁড়িয়ে জমকালো পোশাকে 'পিস্তোলা'-হাতে 'ছিপাই'। পথে শাদা আদমীরা টুপি তুলে শুভদিন জানাচ্ছে 'বম্ ডিয়াস' 'বম্ ডিয়াস'। দেশী আদমিরা হাত তুলে লাট-সাহেবকে স্বাগত জানাচ্ছে 'সেলামৎ' 'সেলামৎ'।

গুদাম পরিদর্শন করে গভর্ণর চলেছেন ব্যাণ্ডেলের 'ইগ্রেজায়,' যে গীর্জায় রডনী অনেকবার গিয়েছে। গভর্ণরের গাড়ির ঘড়ঘড়ি আর ঘোড়ার ক্ষুরের টগবগ শব্দে বেরিয়ে এল শাদা 'আলভা' ও কালো 'এস্তোলার' মোড়কে গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা জন দুই যেশুইট 'পাদ্রে'। টুপি ও 'এস্পাডা' খুলে গভর্ণর চললেন গীর্জার

ভিতরে, সেখানে দি মোস্ট রেভারেণ্ড 'বিশ্‌পা' দাঁড়িয়ে আছেন। বিশপ গভর্ণরের মাথায় সুরভিত পবিত্র জর্ডন নদীর জল 'এগুয়ামেণ্টো' ছিটিয়ে কপালে মন্ত্রপূত তেল 'ওলিয়োস্যান্তো' দিয়ে ফোঁটা এঁকে দিলেন। দু-চারজন দেশী 'ক্রিস্তাও জেণ্টু' যারা উপস্থিত ছিল, তারা শশব্যস্তে বেদীর উপর ধূপকাঠি দিয়ে 'ইনসেন্সো' জ্বালবার আগে লাটসাহেবকে আরতি করল। মেরীমাতা ও প্রভু যীশুকে সম্মান দেখাবার আগে লাটসাহেবকে এই সম্মান দেখানোকে আমরা হয়তো বলব দেবদ্বিজে ভক্তি। কিন্তু ঐসব দেশী জেণ্টুরা তো হালে খ্রীষ্টান হয়েছে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে! আগের সংস্কার কি হঠাৎ মুছে ফেলা যায়?

গভর্ণর টেভারেস নতজানু হয়ে যান। নিচু করে বললেন, "আভে মারিয়া, আভে মারিয়া, আভে মারিয়া, এস্‌পেরিটো স্যাণ্টো, এস্‌পেরিটো স্যাণ্টো, এস্‌পেরিটো স্যাণ্টো।" বিশপ হাত তুলে চোখ বুজে বললেন, "আমেন, আমেন, আমেন।"

সিনেমার পর্দায় যেমন একটার পরে একটা দৃশ্য সরে যায়, বড়নীর সামনেও আর একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে। সে যেন দেখতে পায় হুগলীতে গভর্ণরের সরকারী কুঠি। বড়-বড় থামের সারি, ধাপে-ধাপে উঠে গেছে প্রকাণ্ড সিঁড়ি। সন্ধ্যায় জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কাঁচের ঝাড়ে মোমবাতির আলো, চারপাশ ঘিরে চওড়া বারান্দায় মিহি বেতের চেয়ারের সারি, কার্পেটে মোড়া বিরাট সব হলঘর মখমল-আঁটা কেদারা কৌচে সাজানো। দলে-দলে পর্তুগীজ 'সেনর'রা আসছে গাড়ি পাল্কি ঘোড়ায় চেপে, সবাই সবাইকে 'বনুস্‌ টার্জে' 'বনুস্‌ টার্জে' বলে শুভসন্ধ্যার স্বাগত জানাচ্ছে। বারান্দায়, হলে দাঁড়িয়ে বসে তারা খোসগল্প করছে, 'মেডেইরা' আর 'পমার্ডি' সুরার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘকায় শ্বেত অঙ্গে সান্ধ্য পোশাক মানিয়েছেও চমৎকার—পায়ে বকলেস-বাঁধা কালো পাম্পসু, হাঁটু পর্যন্ত শাদা মোজা, কালো ব্রীচেশ, গলায় ও হাতায় সিল্কের ঝালর দেওয়া শাদা কামিজ, গলায় শাদা ক্রাভাট, গায়ে কালো ম্যাণ্টেলকোট, মাথায় বনেট। সেনরদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি 'সেনরিটা,' ঐ শ্রীমতীরাও এসেছেন গোয়া থেকে বাঙলার গভর্ণরের নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। হুগলী ব্যাণ্ডেলে তখনো পর্তুগীজ মেমসাহেবরা আসেনি, দিশী জেনানারা শয্যাসঙ্গিনী ও গৃহসঙ্গিনীর পর্যায় থেকে প্রমোশন পেয়ে মজলিস ক্লাব গীর্জা ও লাটপ্রাসাদে ঢুকবার অধিকার পায়নি।

ঢং-ঢং করে ডিনারের ঘণ্টা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি সবাই চলে এল খানা-

ঘরে। বিরাট হলের একধার থেকে অন্যধারে চলে গেছে টেবিলের সারি, কাঁটা চামচ প্লেট সাজানো, দুপাশে চেয়ার। যে যার আসন গ্রহণ করল।

ঢং-ঢং করে আরেকবার ঘণ্টানিনাদ। পেছনের দরজা দিয়ে দুজন এডিকং ঢুকে একযোগে ফুঁকার দিল; "সেনর টেভারেস সারভেলো-ডা-রয় ফার্ডিনাণ্ড-ডা-হোলি পতু গীজো ইস্পিরিও।" পেছনে-পেছনে ঢুকলেন গভর্ণর টেভারেস। সকলে উঠে দাঁড়াল।

ফিয়েস্টা শুরু হল। বিন্দালু, ফুগার্থ, পর্টিক্রিথ্, বোলকোমারো, মেল-ডিরোজ, টেম্পারোডো, পাইরেনীজ আপেল, কিসমিসের মিষ্টি আচার। ভোজসভার এক-পাশে বেজে উঠল 'রিয়াও-রিয়াও' কনসার্টোর উদ্দাম জিপ্সী বাজনা। প্রকাণ্ড এক 'সম্‌বেরো' টুপি মাথায় একজন নেচে-নেচে ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। মেডেইরা ও পমার্ডি সুরায় রঙীন সন্ধ্যায় 'রিয়াও-রিয়াও' সুর ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছে এক স্বপ্নপুরী। ভোজপর্বের পর আবার সুরার স্রোত, এবং প্রগলভ রংস্যালাপের মৃদু গুঞ্জন, পরে বাইজীর নাচ শেষ হলে 'বোয়া নাইটে' 'বোয়া নাইটে' রবে শুভরাত্রির বিদায় জানিয়ে, সকলে বিদায় নিল।

রজনীর সম্বিত ফিরে আসে। নেহাত মামুলি চায়ের কাপে সেনর টেভারেসের এক দূর-বংশধর এক সস্তা রেস্টরাণ্টে বসে তার সঙ্গে কফি খাচ্ছে! বাড়িতে বুড়ো মা বিছানায় পড়ে আছে, ভালো চিকিৎসার পয়সা নেই, তিনমাস বাড়িভাড়া বাকি পড়লে বাড়িওলা তাড়িয়ে দেবে!

কর্ডোভার কাউন্টের পুত্র সেনর টেভারেস! তোমার আত্মা কি দেখতে পাচ্ছে যে দূর বাঙলায় নিঃসঙ্গ জীবনের বিলাস অন্বেষণে তুমি কত বড় অভিশাপ রেখে গেছ তোমারই বংশের এই দুই হতভাগিনীর জন্যে? এর কোনো প্রয়োজন ছিল? তোমার শৌর্য ও বিদ্যার প্রতিভার সঙ্গে সংযত কৌমার্যই তো প্রশংসনীয় হয়ে থাকত।



৩

রাস্তার ও-পারের ফুটপাথ দিয়ে দেখি নফরদা হনহন করে চলেছেন। হাঁক দিলাম, "নফরদা দাড়ান, কথা আছে।"

দুটো বাস, তিনটে ট্রাম, একসারি গাড়ির আঁকাবাকা বাধা ঠেলে, উটকে-আসা একটা স্কুটারের তলায় চাপা পড়তে-পড়তে উনি এ-ফুটপাথে এসে এক প্রচণ্ড ধমক দিলেন, "এমন ষণ্ডের মতো চিল্লাচ্ছিস কেন রে? কলকাতার বড় রাস্তায় তো অনেক ষাঁড়ই চক্কর মেরে বেড়ায়, কিন্তু তারা কি তোর মতো হৈ-হৈ করে শান্তিভঙ্গ করে? কলকাতা একটি সুসভ্য শহর, সেকেণ্ড সিটি ইন দি ব্রিটিশ কমনওয়েলথ, আর তুই এসেছিস ধাবধাড়া মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল থেকে, এখনো অসভ্যই আছিস।"

সবিনয়ে নিবেদন করলাম, "প্রথমত, নাগপুর মধ্যপ্রদেশে হলেও জঙ্গল নয়, ওটাও একটা শহর। দ্বিতীয়ত, দিল্লীর বড়কর্তারা বরং কলকাতাকেই তুচ্ছভরে বলেন ডাইং সিটি, প্রবলেম সিটি, ডার্টি সিটি। সুতরাং আপনার মন্তব্যটি ধোপে টিকবে না। তৃতীয়ত, আপনার স্কন্ধদেশে ক্যামেরাটির আবার পুনরাবির্ভাব কেন, তবে কি ডিসুজা-শায়েস্তাপর্ব সমাপ্ত হয়েছে?"

নফরদা আমার মাথায় ছোট্ট একটা চাঁটি মেরে বললেন, "ওরে হঠাৎ-বাঙালী, বাংলা ভাষায় এরই মধ্যে বেশ পক্ক হয়েছিস দেখতে পাচ্ছি। আর ফেঁচিস নে। ডিসুজা বিনাসর্তে পরাজয় স্বীকার করেছে, সন্ধিপত্র পাকাপাকি করবার জন্যে দু বোতল আসল স্কচ হুইস্কি পাঠিয়ে লিখেছে গোয়া ফিরে যাবার খরচা ওর নেই, অতএব আমা-হেন সদাশয় ব্যক্তি দয়া করে এই স্বল্পমূল্যের ভেট নিয়ে শান্ত হব কি না। বলরে কাঞ্চন, তুই হলে কি করতিস?"

"আমায় বলতে হবে না আপনি যা করলেন তাই করতাম আপনাকে জিগগেস করে।"

"জানিস তুই যে আমি ঢাকার বাঙাল? বাঙালরা খুব গোঁয়ার গোবিন্দ হয়,

'কিন্তু আমি গোঁয়ার হতে পারি না। যে গরম দেখায় আমার সঙ্গে তার সঙ্গে আমিও গরম হই। যদি নরম হয়, আমিও নরম হয়ে যাই। ডিসুজাকে চিঠি দিলাম অ্যাকেকৃশনেট আশীর্বাদ জানিয়ে, সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম দু-টিন দামী সিগারেট।"

"কিন্তু আপনি কি হুইস্কি খান?"

"খাবো না কেন? 'মাগনা মদ বামুনেও খায়' একথাটা শুনেছিস? আর্যরা সোমসুরা খেতেন রোজ, সোমসুরা না খেলে যজ্ঞ হত না, বেদে সুরার উদ্দেশ্যে অনেক স্তবস্তুতি আছে, দেবরাজ ইন্দ্রের চোখ সুরার নেশায় লাল হয়ে থাকত ঋগ্বেদে লেখা আছে, দেবাদিদেব শিব সিদ্ধিভাঙের সঙ্গে প্রচুর সুরা পান করতেন, তবে আমি আর্যসন্তান কেনই বা খাব না? তুই কখনো সিদ্ধির সরবত খেয়েছিস, বা সিদ্ধির কুলফি? ৺বিজয়ার দিনে পশ্চিম বাঙলায় ছেলেবুড়ো সবাই সিদ্ধির সরবত বা কুলফি খেয়ে হৈ-হুল্লোড় করে।"

"সিদ্ধি তাড়ি গাঁজা তো মজুর মেথর মুদ্দোফরাসরা খায়! কোনো ভদ্রলোক খায় কিনা জানি না।"

"ভদ্রলোকই শুধু নয়, ভদ্রমহিলারাও বাদ যায় না কাঞ্চন। অনেক রাতে কুলফি, কুলফি বরফ, মজাদার মালাই বরফ হাঁক শুনলেই বুঝবি ঐ ফেরিওয়ালাদের হাঁড়ির মধ্যে আছে সিদ্ধি-ভাঙ ও চরসের নিবাস, কাপড়ে ঢাকা। কেবল পুরুষরাই নয়, বহু কিস্তালি, মুস্লিম, বাঙালী ঘরের বৌ-গিন্নী ওগুলোর খদ্দের। সারাদিন গরীবের সংসারে হাড়ভাঙা খাটুনির পরে শরীর যখন আর বয় না, তখন স্টিমুলেন্টের একটু নেশা বেশ খাসাই লাগে।"

"আপনি সিদ্ধি খেয়েছেন?"

"বোকা ছেলে কোথাকার! আমাদের শিবঠাকুর তো মাঝে-মাঝে ওটা বেশি গিলে দিনরাত বুঁদ হয়ে থাকেন। কখনো-সখনো কেউ দিলে খাব না কেন? হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, রাম্, তাড়ি, গাঁজা, ভাঙ, চরস, ফুট্‌ট্রুস, কোকেন, মর্ফিন, ট্রাঙ্কুলাইজার, ব্রোমাইড সবই চেখে দেখেছি বেশ গভীরভাবে। একদিন নোটবুকে প্রত্যেকটার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে লিখেও রেখেছি, হয়তো একটা 'নেশা-নির্ঘণ্ট' নাম দিয়ে প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ তৃতীয়ভাগ ছাপিয়ে বারও করব। হবি তুই আমার বইয়ের একমাত্র পরিবেশক? দেখবি হু-হু করে বিক্রি হয়ে যাবে, আমাকে ঠকিয়ে তুই বিস্তর পয়সা ট্যাঁকে বাঁধতে পারবি।"

"তবে ডিসুজাকে টিট করতে বক্সিং শিখে সময় নষ্ট করলেন কেন?"

"দিল্লির কর্তারা যদি খবরের কাগজগুলো ন্যাশনালাইজ করেন তবে বর্তমান চাকরিটি আমার খতম হয়ে যেতে পারে, তাই বিকল্প রোজগারের সাইডলাইন থাকা ভালো। কিন্তু যতই ওঁরা প্রহিবিশন ইনহিবিশন ব্রহ্মচর্য ও মরাল-রিহাবিলি-টেশন চাপাতে চান না কেন, নেশার জিনিস বন্ধ করতে পারবেন না, আইনকে কদলী দেখিয়ে বে-আইনী কারবার ফেঁপে উঠবে। তখন দেখবি বই দিয়েই আমার বেশ চলে যাবে; আর বক্সিং শেখাও জলে যাবে না। চোরাকারবারিরা যদি বেশি মাইনে দেয় তবে ওদের হয়ে পুলিসকে রামগুঁতোন গুঁতোবো, যদি পুলিস মাইনে বেশি দেয় তবে তাদের হয়ে চোরাচালানীদের রামচটকানো চটকাব।"

"আপনার পাঁচশালা প্লানে আরো কি-কি মাল্টিপার্পাস পরিকল্পনা আছে নফরদা?"

"বখাটেপনা করলে ঘুঁষি খাবি। যা শেখা যায় তাতেই লাভ। সেদিন এক ঘুঁষিতে একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোঁড়াকে তার বাবার নাম ভুলিয়ে দিয়েছিলাম, কেননা দরকার হয়েছিল।"

"মশা মারতে কামান দাগলেন?"

"মশার মতো হলে একটা চটাস চাপড় দিতাম, তাগড়াই চেহারা কাজেই মুষ্টিযোগের দরকার হল।"

"কেন কি করেছিল?"

"গলিটায় আলো টিমটিমে, সন্ধ্যে তখন প্রায় সাড়ে-সাতটা, হঠাৎ নারীকণ্ঠে শুনলাম 'হেল্প, হেল্প'।"

"নারীকণ্ঠে?"

"হ্যাঁ নারীকণ্ঠে। নারী অবলা দুর্বলা। যতই ওরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের জন্যে গলাবাজী করুক না কেন, কক্ষনোই ওরা পুরুষের সমান-সমান হতে পারবে না। পুরুষের তুলনায় ওরা লম্বায় ছোট, হাড় সরু, ওজনে হাল্কা, গায়ের জোর চারভাগের একভাগ কম, ফুসফুসের ক্ষ্যামতা কম বলে দম বেশিক্ষণ রাখতে পারে না, কণ্ঠনালী হাল্কা বলে গলার স্বর মিহি। রক্ত পাতলা ও লাল কণিকাও কম, তাই নাড়ী একটু বেশি দ্রুত চলে। স্নায়ুমণ্ডলী দুর্বল বলে ভাবপ্রবণ, ইমোসনাল; নিজের ওপর কন্ট্রোল ও বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সঠিক ধারণাও কম, তাই হঠাৎ

রাগে, হঠাৎ কাঁদে, অল্পেতেই এলিয়ে পড়ে। যতই প্রগতিশীলা হোক না কেন দুর্গতিতে পতিত হলে ওরা পুরুষের সাহায্য চাইবেই, চাইবে। অবিশ্যি প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে স্বীকার করতেই হবে।"

হাতজোড় করে মিনতি করলাম, "নফরদা, দোহাই ধর্ম্মের, আবছা-আলোয় ঘোরসন্ধ্যায় নারীকণ্ঠে নেপথ্যে আর্তনাদ, এই রোমাঞ্চকর ঘটনাটির পরের দৃশ্য চটপট বর্ণনা করে এ-অধমের অধীর কৌতূহল তৃপ্ত করুন, পায়ে পড়ি। স্লো-মার্ডার করে পাপ সঞ্চয় করবেন না, নারীর দেহতত্ত্ব, জৈবতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব শ্রবণ করবার কামনা নেই।"

"বলছি তো ? কথার মাঝে-মাঝে নাক গলাসনে। ছোঁড়াটা বদমায়েস, বোধহয় একটু লালপানিও টেনেছিল, মেয়েটার হাত ধরে টানাটানি করছিল। ধমক দিয়ে বললাম—ছেড়ে দে। ছুঁচোর বাচ্চা উল্টে আমাকে ড্যাম ব্লাকি বলে গালাগাল দিল। ওর গায়ের রঙ ঘোলাটে আলোয় মনে হল আমার চাইতে মোটে একপোঁচ ফরসা। আমি খিঁচিয়ে জবাব দিলাম—ব্রাদার-ইন-লয়ের ব্যাটা ব্রাদার-ইন-ল, তোর চৌদ্দপুরুষ ড্যাম-ড্যাম-ড্যাম-ড্যাম। ছুঁচোর বাচ্চা তেড়ে এল, আমি বসিয়ে দিলাম দড়াম করে বজ্রমুষ্ঠি, বাছাধন ছিটকে একটা দেয়ালের গায়ে বসে পড়ল।"

"আর, মেয়েটা ?"

"মেয়েটা আমার হাত জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার, ইউ আর হেভেন-সেণ্ট, কিন্তু ও আমাকে আবার তাড়া করতে পারে অথচ মোড়ের মাথায় কুইক কিওর ক্লিনিকের ডক্টর রয়কে আমার না ডেকে আনলেই চলবে না, মায়ের বেশি অসুখ।"

"ও থরথর করে কাঁপছে। বেলেল্লা ছোঁড়াটা তখনো ওর দিকে প্যাঁট-প্যাঁট করে তাকাচ্ছে। হাতের মুঠোয় আসা শিকার ফস্কে গেলে বেড়াল কেমন ফুলতে থাকে লেজ খাড়া করে দেখেছিস ? সেরকম রাগে ফুলছে।"

আমার প্রশ্নের জবাবে নফরদা যা বললেন তার মোটামুটি অর্থ এই যে, বুড়িটার তড়কা হচ্ছিল, মেয়েটাকে বুঝিয়ে দিলেন এলোপ্যাথিক ওষুধ স্রেফ বিষ, ও হানিমুন কথাটা নিশ্চয়ই জানে, কিন্তু মহাত্মা হানিম্যানের কথাটা জানে কিনা যিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আবিষ্কার করেছিলেন ? চমৎকার ফল দেখায় হোমিও-প্যাথি, দশ মিনিটে তড়কা সেরে যাবে, উনি একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার,

বাড়ি খুব দূরে নয়, ট্যাক্সিতে ওকে নিয়ে গিয়ে চটপট ওষুধ নিয়ে আসতে পারেন যদি ও রাজী থাকে ইত্যাদি। অবাক হলাম নফরদার চিকিৎসার কেরামতি শুনে, বললাম, "কই, এতদিন তো বলেননি আপনি এমেচার হোমিওপ্যাথ?"

নফরদা রেগে গেলেন, "এমেচার? মুখ সামলে কথা বলিস। শখের ডাক্তার হলেও অনেক পুরোডাক্তারের বাবা, এমনি আমার হাতযশ। পাড়ার সবাই আমার ওষুধ খায়, এমনকি শ্যামবাজার, বরানগর, হাতিবাগান, কপালিটোলা, জেলেপাড়া, ভবানীপুর, কালীঘাট, টালীগঞ্জ থেকেও রোগী আসে। দিনের বেলা সময় পাইনে, তাই রাত আটটা থেকে দশটা রোগী দেখবার সময়। আমার স্টুডিওতে ছোট্ট একটা বাড়তি ঘর আছে, সেটাই আমার চেম্বার।"

"কত ফি আপনার? জানা থাকা ভালো।"

"ফি? বিনে চিৎকিসায় আমার মা মারা গিয়েছিলেন, আমি চিকিৎসা করে ফি নেব? নেভার, নেভার। মেয়েটা চার টাকা ফি আমার হাতে গুঁজে দিতে চাইল, আমি বললাম—তুমি আমার লিটল সিস্টার, দাদা কি বোনের কাছ থেকে ফি নেয়? তারপরে আরো তিন চারবার ও-বাড়িতে যেতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। মেয়েটা যেন গোবরে পদ্মফুল।"

নফরদাকে খোঁচা দিয়ে বললাম, "আপনি না নারী বিদ্বেষী কাঠ-ব্যাচিলর?"

"বুঝলি কাঞ্চন, আমি ভূদান, গোদান চ্যারিটি ফণ্ডে দান থোড়াই পছন্দ করি। ওসব দানের মধ্যে অহঙ্কার থাকে, বাহবা পাবার ইচ্ছে থাকে। যদি গতর দিয়ে, ওষুধ দিয়ে কাউকে একটু সাহায্য করতে পারি তবে তার ভিতর মনে হয়, আমি নিজেকেই দান করছি। সে-দানে কি জাত-বেজাত স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে? যার জন্যে করতে পারি সে যে আমার নবনারায়ণ?"

নফরদা চোখবুজে কি ভাবছেন। দুফোঁটা জল মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ছে! মায়ের কথা ভাবছেন, না নরনারায়ণের পায়ে প্রণাম জানাচ্ছেন? ঐ বিরাট দেহে লুকিয়ে আছে একটা শিশুর মতো সরল প্রাণ! সে প্রাণের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি। নিজেকে অকাতরে দান করেই উনি খুশি, কোনো প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না। নারী বিদ্বেষী? হয়তো কোনো নির্বোধ নারী ঐ কোমল প্রাণে নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছিল বিষাক্ত দংশনে, সেই বিষ নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে আছেন, তাই কি উনি স্ত্রীলোকবিদ্বেষী হয়েছেন? বিদ্বেষ না দুর্জয় অভিমান?

যৌবনের কোনো আশাভঙ্গের ভগ্নস্তূপের মধ্যে কি তিনি প্রৌঢ়ত্বের ধূসর অপরাহ্নে বিচরণ করছেন নির্বিকার নিরাসক্ত, কিন্তু আনন্দময় পুরুষ? উনি প্রায়ই আমাকে বলেন—কাঞ্চন জীবনে সুখের চাইতে দুঃখের ভাগটাই বেশি কিন্তু মনকে এমনভাবে তৈরি করবি যাতে সর্বদাই আনন্দে থাকতে পারিস, ওর মতো টনিক আর নেই। ভিতরের কান্না বাইরে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখবি, কোনো দুঃখের কাছেই হার মানবিনে।

দূরে হঠাৎ একটা হৈ-হল্লা শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি একটা ফিটনগাড়ি মাতালের মতো টলতে-টলতে ছুটে আসছে, ঘোড়াটা মনে হয় ক্ষেপে গিয়েছে, গাড়ির মধ্যে ভয়ার্ত চিৎকার, গাড়োয়ানের হাতে লাগামটা ছেঁড়া, সে কিছুতেই ঘোড়াটাকে বাগে আনতে পারছে না।

নফরদা চট করে ক্যামেরাটা আমার হাতে দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন রাস্তায়। ঘোড়াটা কাছ বরাবর আসতেই তার চোয়ালে ঝাড়লেন এক জব্বর ঘুঁষি, জানোয়ারটা কয়েক পা পেছন হটে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। গাড়ির ভিতরে এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক, তার স্ত্রী ও দুটো কাচ্চাবাচ্চার মুখ ফ্যাকাশে, নফরদা ওদের পাঁজা-কোলে করে নামালেন, তারপর আশপাশ থেকে লোক ছুটে আসতেই ভিড় গলিয়ে আমার কাছে ফিরে এলেন।

আমিও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, বললাম, "বক্সিং বেশ ভালোই শিখেছেন দেখলাম, কিন্তু পাগলা ঘোড়ার সামনে দাঁড়াতে কি একটুও ভয় করল না?"

"দূর বোকা ছেলে ভয়টা কিসের? ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া কি ভালো করে খেতে পায়? সামনেও দাঁড়াইনি দাঁড়িয়েছিলাম পাশে। তবে প্রিসেন্সটা ভালোই করেছিলাম, একটা সাইড্‌কাটেই কাজ হল। আইন করে ছ্যাকড়াগাড়ি কল্‌-কাতার রাস্তা থেকে তুলে দেওয়া উচিত। যে-ঘোড়া খেতে না পেয়ে হাড্ডিসার সেই গাড়োয়ানের পিঠেই চাবুক মারা উচিত। ট্যাক্সি, মোটর, স্কুটার, বাস-ট্রামের গুঁতোয় তো ছ্যাকড়াগাড়ি কলকাতায় প্রায় উঠেই গেছে, কেবল এই কিস্তালি-পাড়ায়ই যা দু-চারটা দেখা যায়, আলিপুর বালিগঞ্জ চৌরাঙ্গিতে নো-হোয়্যার। এই কিস্তালিপাড়ার ফিটনগাড়ি কিস্তালিদের মতোই ধ্বংসের পথে। একদিন এই ফিটনগাড়ি ডুলি পাল্কিকে নাকসিঁটকাতো, যেমন কিস্তালিদের অ্যাটিচুড ছিল নেটিভদের ওপর।

"পর্তুগীজ, ডাচ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, কোনো কোম্পানীর নোকর হয়ে হয়তো এল

এক ছোকরাসাহেব। খাতায় জমাখরচ লেখা ছাড়া নিঃসঙ্গতার মাঝে প্রেমে পড়ে বা প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজেকে বিকিয়ে দিল কোনো এক হিন্দু স্বৈরিণী বা মুসলমান বাইজীর কাছে। শাদা আর কালো এই দোআঁশলা গরম-ঠাণ্ডা রক্তের গরমটাই চড়ে গেল কিস্তালি সন্তানদের মাথায়, ড্যাম নেটিভদের ওপর সেই গরমটাই ঝাড়ত।"

"মেয়েদের মাথাও গরম ছিল?"

"শুধু মাথা নয়, তাদের রূপের আগুনও বেশ গরম ছিল। সে আগুনের জেল্লাও বহুদিন টিকে ছিল। ঠাণ্ডা দেশের বীজ গরমদেশের মাটিতে পুঁতলে ফুল আরো সুগন্ধ, ফল আরো বাড়ন্ত হয়, যাকে তোরা বলিস এক্সোটিক্। লাটসাহেব থেকে কেল্লার গোরাসেপাই পর্যন্ত সে-আগুনে পুড়ে মরেছিল। সে-সব গলাগলি ঢলাঢলির অনেক কেচ্ছাকেলেঙ্কারির পুরনো কলকাতার মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। ইংরিজী আমলে কিস্তালি কথাটা মুছে গিয়ে ঐসব নাক-উঁচু আধাসাহেব আধাসাহেবানীরা হল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। পর্তুগীজ বংশধর রেবোলো নাম পাল্টিয়ে হল রবিনসন, ডাচবংশধর জেরহার্ড হল জেরাড, ফরাসীবংশধর আঁদ্রে হল অ্যাণ্ড্রু।"

নফরদা পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা আমাকে দিলেন, নিজে একটা ধরালেন। তারপর বললেন, "ফিটনগাড়ির কথা হচ্ছিল না কাঞ্চন? ইংলণ্ডেশ্বর পাঠালেন বড় এক ফিটনগাড়ি, চারটে শাদা ঘোড়া, মোগলবাদশা আরঙ্গজেবকে। সুরাট থেকে বয়েল গাড়িতে চাপিয়ে ব্রিটিশদূত নিজে সেই ভেট্ নিয়ে এলেন দিল্লি, যাতে পথের জলকাদায় গাড়ির রঙে ছাতলা না ধরে। সেয়ানা বাদশা জানতেন কাঁটা দিয়েই কাটা তুলতে হয়, মোগলের ভালো জাহাজ নেই, বাঙলা ও উড়িষ্যার সাগরতট তখন পর্তুগীজ বোম্বেটের হাতে তচনচ হচ্ছে, এই ইংরেজদের দিয়েই তাদের তাড়ানো যাবে, তাই খুব খুশি-খুশি ভাব দেখিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরকে সেলাম পাঠালেন। এটা একটা চালবাজী। ব্রিটিশদূত দিল্লি ছেড়ে চলে যেতেই বাদশা তাঁর নাজির-উল-মুলুককে তলব করে হুকুম দিলেন—ইংলণ্ডের রাজাকে যা মানায় হিন্দুস্থানের শাহান-শাকে তা মানায় না, গাড়িটাকে ভেঙে আরো অনেক বড় কর, উপরটা সোনা দিয়ে নিচের দিকটা রুপো দিয়ে মুড়ে দাও, মখমলের গদি তুলে ফেলে কিংখাবের গদি বসাও। ভিতরের চারপাশ আর পায়ের কাছে এঁটে দাও বুখারার গালচে, জানলায় ঝুলিয়ে দাও ঢাকাই মসলিনের পর্দা। একেই বলে বাদশাহী ঠাট, বুঝিছিস কাঞ্চন? এর আগে ফিটনগাড়ি আরঙ্গজেবের বাপঠাকুর্দাও

দেখননি। দিল্লির লোকরা সে-গাড়ি দেখে ট্যারা হয়ে গিয়েছিল। তাই হে বৎস কাঞ্চন, যখনি এই ফিটনগাড়ি চোখে পড়বে আরঙ্গজেবের কথা মনে কোরো। আরো মনে কোরো কিস্তালিদের মতো এর বর্তমান শোচনীয় অবস্থা। এখন চলি, এক ভাগ্যবান ব্রীফলেশ ব্যারিস্টার মুরুব্বীর জোরে হাইকোর্টের নতুন জজসাহেব হতে যাচ্ছেন, এ-খবরটি এখনো অতীব গোপন সমাচার, আমাদের কাগজেই প্রথমে খবরটা বেরোবে তাই ফটো নিতে যাচ্ছি। হয়তো চায়ের সঙ্গে প্লেটভর্তি ভালো-ভালো। খাবারও জুটবে।"



৪

নফরচাঁদ বোসের সঙ্গে আমার আলাপ তিনবছরের। নাগপুরের পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতা আসছি, ট্রেনে ওর সঙ্গে দেখা। বার দুই 'আপনি' বলে 'তুমি' আরম্ভ করলেন, 'তুমির'ও সহসা অপমৃত্যু হয়ে গেল। কদিন বাদে তুই। স্কুল-কলেজের পাকারাস্তায় উনি কতদূর এগিয়েছিলেন জানি না, কোথা থেকে কেন পিছিয়ে এলেন তাও জানি না। একদিন সোজাভাবে জিগগেস না করে তেরছা ভাবে টোপ ছাড়লাম, উনি মিঠিয়ে-মিঠিয়ে জুতো মারলেন : "পেটে বোমা মেরে যদি খবর টেনে বার করতে চাস তবে সোজা তাক কর কাঞ্চন, বাঁকা তাক করিসনে। জানতে চাস তো বলছি যে বিছানায় এপাশ-ওপাশ ছাড়া কোনো পাশই আমি করিনি। আমি নিরেট সেল্‌ফ্‌মেড, যা কিছু শিখেছি নিজের চেষ্টায়ই শিখেছি। গ্রামের স্কুলে দিনতিনেক গিয়েছিলাম কিন্তু মাস্টারমশাইর এক রামচিমটি খেয়ে আর ও-পথে পা বাড়াইনি। মাস্টারটিও ছিল সেয়ানা, গ্রামের জমিদারের ছেলেকে বেতমারার চাইতে চিমটি কেটে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিলেন, কেননা বেতের ঘায়ে চামড়ায় দাগ কাটে, আমি ওরকম চোরাগোপ্তা চালাকির স্কোপ দেবার পাত্তর নই।"

"আপনি জমিদারের ছেলে? তবে না সেদিন বললেন আপনার মা বিনিচিকিৎসায় মারা গেলেন?"

"সেটাও সত্যি কথা। একটা ছোকরা ডাক্তারকে রাজী করিয়ে বাবা গ্রামে বসিয়েছিলেন, যাতে দশজনের উপকার হয়। কিন্তু তার চিকিৎসার গুণে যখন একটি অল্পবয়সী মেয়ের পেটে বাচ্চা এসে গেল, তখন উনিই জুতো মারতে-মারতে ডাক্তারটিকে গ্রামের বার করে দিলেন। উল্টে সকলে ওঁকেই ছি-ছি করল। এটা তাজ্জব দুনিয়া। মা'র অসুখ বাড়াবাড়ি হলে উনি লোক পাঠালেন শহর থেকে ডাক্তার আনতে, কিন্তু ডাক্তার আসবার আগেই

রোগীর প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। গ্রামের লোকরা বলে বেড়াল—যেমনি কর্ম তেমনি ফল!"

নফরদার সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়। মনে হয় উনি স্কুল-কলেজে পড়েননি বটে তবে পড়াশুনো খুব করেছেন। প্রথম-প্রথম ওঁর কথার চচ্চড়িতে ইংরেজী ফোড়ন শুনে খুব হাসি পেত; এখন সয়ে গেছে। শুধু সয়েই যায়নি, হাম বসন্ত কলেরা টাইফয়েডের মতো ঐ খিচুড়িভাষার ছোঁয়াচ আমাকেও লেগেছে। এটাও তো এক রকমের কিস্তালি ভাষা, এ্যাংলোবঙ্গ ডায়লেক্ট!

তবে কম-বেশি খিচুড়িভাষাই তো ভারতেই সর্বত্র চলছে সমাজের উপরের আধখানায়। মাদ্রাজী বাঙালী পাঞ্জাবী বেহারী মারাঠী গুজরাটী সকলেই কথার ভাঁজে-ভাজে ইংরিজী বুলির বুকনী ছাড়ে। নাগপুরে ছেলেবেলায় আমাকে বাঙলা শেখাতে বাঙালী মাস্টার বাবা রেখে দিয়েছিলেন, একটু বড হলে ছোটদের মাসিক পত্রিকা, এবং আরো বড হলে একটা বাঙলা খবরের কাগজও আমার জন্যে আসত, কারণ মিশনারী স্কুল-কলেজে ওখানে দেশীভাষার বিশেষ পাত্তা ছিল না, বাঙলা তো একেবারেই অচল। প্রথম-প্রথম ঐ মাসিকপত্রিকা ও খবরের কাগজ পড়তে খুব ঠোক্কর খেতাম, বাঙলা থেকে ইংরিজী শব্দের অভিধান সে-সময় কাছ-ছাড়া করতাম না। এখনো বাঙলা পত্রিকা ও দৈনিকে অনেক শব্দের ইংরিজী প্রতিশব্দই প্রথমে মনে আসে, তারপর লেখার মানেটা ধরতে পারি—যেমন, সু-সম, সহাবস্থান, ভারসাম্য, রাষ্ট্রীয়করণ, পরিবহণ, ত্রিপ্রধান, সাম্যবাদী, শীর্ষসম্মেলন, নিরাপত্তা, একনায়কত্ব ইত্যাদি। বিদেশীদের স্কুলে পড়ে, বিদেশীভাষায় ভাবতে শিখে এমনি অপদার্থ হয়ে পড়েছি আমরা। ফট্‌ফট্‌ করে দু-চার কথা ইংরিজী না বললে লোকে ভাবে মুখ্যু, লেখাপড়া শেখেনি। তিনচারটে সংস্কৃতপাশ ভাটপাড়া কাশী নবদ্বীপের পণ্ডিতদেরও আমরা হেয় জ্ঞান করি কারণ তাঁরা ইংরিজী বলতে পারেন না, পথে ঘাটে ট্রাম বাস রেলে ইংরিজীটা এখনো হয়ে আছে এদেশের সভ্যতার মাপকাঠি।

এ-সম্বন্ধে নফরদা একটা গল্প বলেছিলেন আমাকে। একদিন তিনি বাসে যাচ্ছিলেন ডালহৌসি স্কোয়ার। প্রচণ্ড ভিড়। ব্রেক কষবার ঠেলায় এক বুড়ো ভদ্রলোক টলকে পড়লেন এক ছোকরার পিঠে। ছোকরা রেগে একদম আগুন, ভুল-ভাল ইংরিজীতে একগাদা গালাগাল শুরু করলে। ভদ্রলোক চুপ, কেবল

মাঝে-মাঝে বাঙলাতে দু-এক কথায় মাপ চাইছেন। পোশাক-আশাকও নেহাত সাদাসিধে, খদ্দরের পাঞ্জাবি, থানধুতি। শ্যামবর্ণ, গাল তোবড়ানো। ছোকরা সবাইকে ইংরেজীতে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলল—একেবারে অজপাড়াগেঁয়ে ইল্লিটারেট, যা বলছি কিছুই বুঝতে পারছে না তাই চুপ করে আছে। রাজভবন ছাড়িয়ে বাসটি যখন ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড় ধরেছে তখন নামবার মুখে বুড়ো ভদ্রলোক ছোকরাটিকে মিষ্টিভাবে বললেন—দেখ বাবা, আমি বারোবছর বিলেতে ছিলুম, জহরলাল কেম্ব্রিজে আমার সঙ্গে পড়ত, কিন্তু বাঙলাভাষা ছেড়ে ইংরিজীতে কথা বলব কেন? দেশ স্বাধীন হয়েছে তবু তোমাদের এ-মোহ কেন? তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হয় জহরলালজীর কি দুর্ভাগ্য যে এমন দেশের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। আর একটা কথা বলি বাবা, ইংরিজী যদি বল তবে ভুল বল না, উচ্চারণও শিখে নাও, যাই শিখবে আধাআধি শিখো না, ভালো করে শিখো।

নফরদা পাগলাটেও বটে! শুনলাম উনিও নেমে পড়লেন ভদ্রলোকের পেছন-পেছন। বুড়োকে থামিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে নাকি হাতজোড় করে বললেন—দাদা, আমরা ভেড়ার দল এই বাসে ছিলাম, ঐ ছোকরাটাকে কিছু বলবার সাহস হয়নি, কিন্তু সমস্ত বাঙলীদের হয়ে আমি আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি। এই আমার নামের কার্ড, আপনার নাম ঠিকানা দয়া করে বলুন, আপনার বাড়িতে যাব। পরে নাকি গিয়েও ছিলেন।

নফরদা বলেন উনি কোনো লেবেল-আঁটা মার্কা-মারা ধর্ম মানেন না, স্বামিজী যা-যা বলে গেছেন তা ই ওঁর কাছে বেদ-উপনিষদ-বাইবেল-কোরান। আমার প্রশ্নের উত্তরে ধমক দিলেন: "হাঁদাকান্তের মতো জিগগেস করছিস কোন স্বামিজী? শুধু স্বামিজী বললে বোঝায় যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দকে, আকাশে একটি চাঁদই থাকে, লক্ষ-লক্ষ তারার মধ্যে মাত্র একটিই চাঁদ। তোর দেশ কোথায় ছিল রে কাঞ্চন? বলেছিলি না চন্দননগর?"

"হ্যাঁ, চন্দননগর। শুনেছি হুগলীর কাছে, কিন্তু কখনো যাইনি।"

"আমার ছিল ঢাকা, তোরা যাকে বলিস বাঙাল, আমি তাই। স্বামিজী পূর্ববঙ্গের লোকদের বেশি পছন্দ করতেন, কারণ তারা মাছ মাংস কচ্ছপ খায়, শরীরে শক্তি রাখে। ঘাস-পাতা-খেকো পেট রোগা বাবাজীর দলকে তিনি বলতেন ও-সব সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়, মহাতমোগুণের ছায়া, মৃত্যুর ছায়া, দেশের সকলকে মাছ মাংস

বেশি খাইয়ে উদ্দমী করে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, নইলে দেশসুদ্ধ লোক গাছপাথরের মতো জড় হয়ে যাচ্ছে। ধর্মকেও জাগাতে হবে। তিনি বলে গেছেন ভারতের সর্বত্র তিনি তন্নতন্ন করে ধর্মকে খুঁজেছেন কিন্তু কোথাও তার সাক্ষাৎ পাননি, বিশেষ করে হিন্দুধর্মের নামে যা চলছে তা শুধু লোকাচার দেশাচার আর স্ত্রী-আচার। তিনি দুঃখ করতেন হিন্দুধর্ম ঢুকেছে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে, কেবল ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, আর পাঁজীতে যা লেখা আছে তাই হয়েছে ধর্ম।"

"খুব খাঁটি কথা।"

"শুধু খাঁটি কথা নয়, স্বামিজীর প্রাণের অন্তস্থল থেকে যেন ক্রন্দন উঠেছে দীনের জন্যে, আর্তের জন্যে। শুনবি কি বলেছেন? তিনি বলছেন—দে, দে ফেলে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। তোরা ভাবছিস তোরা শিক্ষিত? কি ছাইমাথামুণ্ডু শিখেছিস? কতগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে পাশ করে ভাবছিস তোরা শিক্ষিত? ছ্যাঃ এর নাম শিক্ষা? এতে তোদেরই বা কি হল, দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ সোনার ভারতে অন্নের জন্যে কি হাহাকার। তোরা শক্তিমান হয়ে দেশের কাজে লেগে যা, তোদের মাঝে সেই শক্তি জাগানোই আমার জীবনের ব্রত, দেশের দশা ও পরিণাম ভেবে আর ঠিক থাকতে পারিনে, যে-দিন ঐ ব্রত শেষ হবে সেদিন দেহ ফেলে চোঁচা দৌড় মারব।"

সিগারেট ধরিয়ে একটা বই টেনে নিলাম, কিন্তু মন বসতে চাইল না। নাগপুরে যে বত্রিশ বছর কাটিয়ে এসেছি তা থিতিয়ে এমন কোনো অভিজ্ঞতার তলানি পড়েনি যা ছেঁকে উঠিয়ে কোনো কাজে লাগানো যেতে পারে। নাগপুর শহরটা ছিল শান্ত নিরীহ একটা গরুর মতো, ঝিমুতে-ঝিমুতে যেন জাবর কাটছে। আর প্রাণ-চঞ্চল তেজীয়ান ঘোড়ার মতো ঘাড় উঁচু করে কেশর ফুলিয়ে টগবগিয়ে চলছে কলকাতা মহানগরী। নানাদেশের নানালোক, নানাভাষা, ধনতন্ত্রের নানাস্তর, নানা-রকম বাড়িঘর, ফেরিওয়ালা, ভিখারী, নানারকম যানবাহন, প্রকাণ্ড শৌখিন অট্টালিকার পাশে জীর্ণবস্তি, জুয়াচুরি ভেজাল কালোবাজারের রকমারি, সব মিলে কলকাতাকে একটা অভিনব বিচিত্রতা দিয়েছে। তার সঙ্গে কমিউনিস্টদের দলাদলি, কর্পোরেশনে চুলোচুলি, কংগ্রেসীমহলে নেপথ্যে মনকষাকষি, প্রোশেসন, স্ট্রাইক, স্লোগানের বাড়াবাড়ি সেই বিচিত্রতায় আরো রঙ ফুটিয়েছে। যাঁরা বলেন কলকাতা ডাই-ইং সিটি, কলকাতা প্রব্লেমসিটি তাঁরা দিল্লী থেকে দমদমে হুট্ করে হাওয়াই

জাহাজে নামেন, বড় মোটরে, 'জয় জয়' শুনতে-শুনতে রাজভবনে ঢোকেন, বড়-বড় কথার খই ছিটিয়ে আবার আকাশ-পথে ফিরে যান। ওঁরা বাঙালীকে ভাত ছেড়ে আটা খেতে বলেন, মাছের বদলে ডিওি খেতে বলেন, সে-সব আমাদের শুনে যেতে হয় কিন্তু মানতে ইচ্ছে করে না। ওঁদের চাইতে এই খবরের কাগজের রিপোর্টার-ফটোগ্রাফার নক্ষরচাঁদ বসু অনেক দামী-দামী কথা বলেন ; তা শুনতেও ইচ্ছে হয়, মানতেও ইচ্ছে হয়।

দরজার বাইরে মল্লিক মশায়ের গলা শোনা গেল, "কাঞ্চন বাড়ি আছ ?"

"আসুন কাকাবাবু, অনেকদিন দেখা নেই, ভালো আছেন ? বসুন।"

"বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছ তো ? কি করা হচ্ছে বল তো ?"

মল্লিকমশাই একবার নাগপুরে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি, কার এক চিঠি নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে। বাক্স বিছানা সঙ্গেই রয়েছে দেখে বাবা বুঝলেন শুধু দেখাই নয়, থাকবারও মতলব। দরোয়ানজীকে ডেকে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বাবার এক কথায় ওঁর মতলব হাসিল হল, প্রকাণ্ড একটা মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট পকেটস্থ করে কলকাতা ফিরলেন।

সেই সূত্রে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। 'পরিচয়' কথাটার চাইতে 'দেখা' বলাই বোধহয় বেশি ঠিক, 'আলাপ' করবার মতো বয়েস তখনো আমার হয়নি। বাবা যখন মারা গেলেন তখন এঁকেই চিঠি লিখেছিলাম যে নাগপুরে আর ভালো লাগছে না, বাড়ি বিক্রি করে কলকাতা আসতে চাই যদি দাঁড়াবার জায়গা মেলে। উনি লিখলেন সে ভাবনা আমাকে করতে হবে না, ওঁর দুটো ফ্ল্যাটবাড়ি আছে। একটা ফ্ল্যাট তিন মাসের ভিতরেই খালি হবে, আমার বাবার ঋণ কখনোই শোধ করতে পারবেন না ইত্যাদি। তখন বুঝতেই পারিনি যে কলকাতার এই বদ্দি ট্যাঁশপাড়ায় অবস্থান আমার অদৃষ্টে ঝুলছে।

ওঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম, "কি করব ভাবছি। এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি।"

"বাপের বিস্তর পয়সা পেয়েছ তাই গরজ নেই। কিন্তু তুমি ইয়ংম্যান, শুধু-শুধু বসে থাকা কি ভালো ? লোহা ক্ষয়ে যাওয়া ভালো কিন্তু মরচে পড়ে নষ্ট হবে কেন ? কি না রিসার্চ করবে বলেছিলে ? ঢুকে যাও কোনো কলেজে। না হলে বিজনেশ কর কিংবা চাকরি কর।"

"কি বিজনেশ করব ? বিজনেশের 'ব'-ও তো জানিনে ?"

"আরে, তোমার জানতে হবে কেন ? আমিই তো আছি ? তোমার টাকা আমার বুদ্ধি। তুমি খাটবে আমি বাতলে দেব। লাভ তোমার ঠেকায় কে ?"

বুঝলাম এই-সব হিতোপদেশের মোড় কোথায় ঘুরতে যাচ্ছে। প্রসঙ্গটি চাপা দিতে হাঁক দিলাম, "যোশেফ, যোশেফ !" যোশেফ রান্না করবার সময় কোমরে একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে নেয়, সেই বেশেই উদয় হলে বললাম তাকে দুটো কোকাকোলা আনতে রহমানের দোকান থেকে।

সে চলে যেতেই শ্যাম মল্লিক মুচকি হাসলেন, "খিষ্টেন চাকর রেখেছ দেখছি। তা বেশ। বাপ ছিলেন পুরোসাহেব, ছেলেই বা কম যাবে কেন ? তারপরে কালের হাওয়াও তো বদলেছে ?"

"লোকটা চটপটে, চালাক-চতুর, রাঁধেও ভালো।"

কোকাকোলায় চুমুক দিতে-দিতে মল্লিকমশাই আসল কথাটা পাড়লেন, "দেখ বাবা কাঞ্চন, আজ তিন বছর এখানে আছ তুমি, তোমার বাবা যে উপকার করে-ছিলেন ভুলতেও পারি না, তবে এ-ফ্ল্যাট তোমার ছাড়তে হবে।"

কাতরভাবে বললাম, "কাকাবাবু, তবে কি পথে দাঁড়াব ?"

"শোনো কাঞ্চন, সেটাও আমি ভেবেছি, পথে মোটেই দাঁড়াবে না। আমার ব্যবসা বড় খারাপ যাচ্ছে। অনেক টাকা লোকসান গেছে, এখন প্রত্যেকটি টাকা হিসেব করে চলতে হচ্ছে। এ ফ্ল্যাটের ভাড়া দিচ্ছ দেড়শো টাকা, আমি তিনশো টাকা অফার পেয়েছি। তুমি আমার মতো অবস্থায় পড়লে কি করতে ?"

মল্লিকমশাই ঘুঘু লোক। ওঁর ব্যবসা খারাপ চলছে কিনা জানি না। এইমাত্র উনি আমাকে ব্যবসায় নামতে বলে নিজের ব্যবসায়ীবুদ্ধির ঢাক পেটালেন, আবার এখন বলছেন ওঁর ব্যবসায়ের নৌকো চড়ায় আটকে গেছে। কোনটা সত্যি ? তবুও বলতে হল, "দেড়শো টাকা বেশি পাবেন, তা ছাড়বেন কেন ?"

"হেঁ-হেঁ বাবা, তোমার বয়েস অল্প হলেও বৈষয়িক বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। আমার তেত্রিশ নম্বরের বাড়িটা কাছেই, বড় বটগাছটার পরেই, এ-রাস্তার মোড়ে। সেখানে একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। ফ্ল্যাটটা এর চাইতে একটু ছোট বটে তবে বন্দোবস্ত ঠিক এ-রকম। আজ মাস-পয়লা, এ ফ্ল্যাট যাকে ভাড়া দিয়েছি সে আজই সন্ধ্যের সময় আসতে চায়। তুমি যদি আজ দুপুরেই নতুন ফ্ল্যাটে যেতে পার তবে ভালো হয়।"

উনি পালিস করে বললেন 'যেতে পার,' এর ভিতরে বেশ চোখা একটি হুকুমও আছে বুঝতে পারলাম, সোজা কথায় 'যেতেই হবে।'

মল্লিকমশাই কথাটা শেষ করলেন, "এখানে যা দিচ্ছিলে ওখানে তা-ই দিও, কোনো অসুবিধা হবে তোমার ?"

"না, কাকাবাবু, একার সংসার, লটবহর বেশি কিছু নেই, দুপুরে খাবার পরেই ওখানে যাব। গুছিয়ে নেবার মধ্যে শুধু একরাশ বই।"

উনি বিদায় হলে যোশেফকে ডেকে বললাম তাড়াতাড়ি রান্না করতে, তারপর খেয়েদেয়ে একটা ঠ্যালাগাড়ি যেন যোগাড় করে।

মল্লিকমশাই যে বটগাছটার কথা বললেন ওখানে একটা শাদা বেলেপাথরের শিবলিঙ্গ বহুকাল ধরে আছে। এই 'ফিরিঙ্গী শিবের' বেশ নামও আছে। এ-তল্লাটের শুধু হিন্দু মজুর ঠ্যালাওয়ালা ফেরিওয়ালা রিক্সাওয়ালা দরোয়ানরাই নয়, অনেক বুড়োবুড়ি খৃষ্টানও ওর মাথায় ফুলপাতা দিয়ে যায়। নফরদার সঙ্গে যেতে-যেতে একদিন আমি হেসেছিলাম, উনি ধমক দিলেন : "কেন রে কাঞ্চন, ঈশ্বর যদি সব-জায়গাতেই আছেন তবে ঐ পাথরটির মধ্যে থাকবেন না কেন ? আমাদের দর্শনে লিঙ্গশরীর মানে সূক্ষ্মশরীর। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে মহর্ষি উদ্দালক পুত্র শ্বেত-কেতুকে একটি গাছ দেখিয়ে বললেন বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, চৈতন্যও আছে। সত্য যুগের সেই ঋষির কথা এ-কালের লোক বিশ্বাস করেনি যতদিন না আমাদের বিশ-শতকের আর একটি জ্ঞানতপস্বী আচার্য জগদীশ বোস যন্ত্রের সাহায্যে গাছের প্রাণের কথা, সুখ-দুঃখবোধের কথা বিজ্ঞানীমহলে প্রমাণ করলেন। গাছের যে প্রাণ আছে তা বেদ মনুসংহিতা মহাভারতেও দেখা যায়। হয়তো পরে এটাও প্রমাণ হবে যে পাথরেরও প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে, জগদ্ব্যাপী পরমাত্মার অংশে ওরাও শক্তিমান।"

"কিন্তু ছাইমেখে বাঘের ছাল পরে বলদের পিঠে চড়ে যিনি যাতায়াত করেন তিনি কেমন দেবতা ?"

"আরে, সব দেবদেবীই মানুষের কল্পনা। নিরাকার পরমেশ্বরকে ভক্তরা আকার-রূপে ধারণা করেছে ধ্যানের সুবিধের জন্যে। সব দেবদেবীরই মানুষের মতো মুখ, কারণ, মানুষের মনই ওঁদের রূপ দিয়েছে। যদি গরু-ঘোড়ার আধ্যাত্মিক চেতনা থাকত, কল্পনাশক্তি থাকত, তবে তাদের দেবদেবীর মুখ তাদেরই মতো হত, চারটে পা থাকত। তুই শিবের রূপ, আর বাহন নিয়ে ঠাট্টা করলি, তবে শোন। আদিম

বাসভূমিতে আর্যদের দেবতা ছিলেন ইন্দ্র অগ্নি বরুণ। ইন্দ্র আকাশের দেবতা যেখান থেকে রোদ বৃষ্টি এসে মানুষকে তার জীবনধারণের জন্যে ফলমূলশস্য যোগাচ্ছে। অগ্নি দেহের প্রাণশক্তি যোগাচ্ছে। বরুণ জল ও বায়ুর দেবতা, যা না হলে আমরা বাঁচতে পারি না। তবে দেখ, এরা তিনজনেই প্রকৃতির তিনটি বিশিষ্ট রূপ। আর্যরা যখন ভারতে এলেন তখন ঐ তিনটি দেবতা যেন 'সেকেলে' হয়ে পড়লেন। নতুন দেশের বিচিত্র দৃশ্য তাদের কল্পনাকে নতুন রঙে রাঙিয়ে তুলল। সংসারের কোলাহলের বহু উর্ধ্বে নিস্তব্ধ প্রশান্ত হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গগুলি তাদের মনে করিয়ে দিল ভস্মাচ্ছাদিত সমাধিমগ্ন নির্বাক নিস্পন্দ যোগীঋষিদের গভীর তপস্যা। ভক্তিতে বিস্ময়ে গদগদ হয়ে তাঁরা কল্পনা করলেন দেবাদিদেব মহাদেব শিব শঙ্করের রূপ। হিমালয়ের চূড়ায় চন্দ্রোদয়ের শোভা অতি অপরূপ, তাই শিবের কপালেও শশিকলার শোভা। যিনি দেবাদিদেব শিবমহেশ্বর তাঁর কাছে পশুরাও প্রিয়, তাই হিংস্রপ্রকৃতির ব্যাঘ্র সর্পও তাঁর অঙ্গের ভূষণ। তিনি অল্পেই তুষ্ট, আশু-তোষ, সমস্ত জগতের অধিপতি হয়েও তিনি ভিক্ষে করে সন্ন্যাসীর মতো খাদ্য সংগ্রহ করেন। আর্যদের মন্দির ছিল না, কোনো মূর্তিপূজা ছিল না, ছিল শুধু যজ্ঞ। যজ্ঞের কাঠ বলদের পিঠে চাপিয়ে যজ্ঞস্থলে আনা হত, তাই শিবের বাহন বলদ। আগাগোড়াই প্রতীক, কিন্তু কি সুন্দর কল্পনা! ধ্যায়েন্নিত্যং রজতগিরীনিভং চন্দ্রকলাবতংসম্।"

আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন। অতগুলো কথার মধ্যে উনি একটিও ইংরেজী শব্দ বললেন না এবং যা বললেন তাও মার্জিত ভাষায় একটি বিচিত্র তত্ত্বকাহিনী। যা হোক, তারপর থেকে আর আমি কোনো দেবদেবীকে নিয়ে ওঁকে ঘাঁটাতে সাহস পাইনি। অথচ উনি নিজে দেবদেবী মানেন না।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে মালপত্তরসহ উদয় হলাম তেত্রিশ নম্বরের বাড়িতে। জন্ম হতে জন্মান্তরের মতো গৃহ থেকে গৃহান্তর, ফ্ল্যাট থেকে ফ্ল্যাটান্তর। ভাড়াবাড়িতে বাসের বিড়ম্বনা। বাবা ছিলেন নাগপুরের পয়লানম্বর ব্যারিস্টার। আমাদের বাড়িটাও ছিল জমকালো। ঘরগুলির পরিমাপ ও সংখ্যা ছিল তাঁর পদমর্যাদার সমতুল্য। কলকাতার ফ্ল্যাটে এসে প্রথম-প্রথম দম আটকে আসত, কেউ যেন গলায় তোয়ালে জড়িয়ে প্যাঁচ দিচ্ছে। আমি অবিবাহিত, তাই মুক্তপুরুষ, দু-ঘণ্টার মধ্যে সতেরো নম্বরের বন্ধনমুক্ত হয়ে তেত্রিশ নম্বরে এসে হাজির হতে পারলাম কিন্তু এখানে বড় ঘর জুটবে আশা করা যায় না।

যোশেফের হাঁকডাকে দরোয়ান দুবেজী ছুটে এল। হ্যাঁ, বাবুজী নিজেই বলে গেছেন কাল যে দুনম্বর ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে আসছে। পাকা লোক এই মল্লিকমশায়, আমার আসবার একদিন আগেই, আমাকে বলার আগেই, এখানে বন্দোবস্ত করে গিয়েছেন। রাম জন্মাবার আগেই বাল্মীকি যেমন রামায়ণ রচনা করেছিলেন। সতেরো নম্বরের বাড়িতে ছিল ছটা ফ্ল্যাট। আর পাঁচটি ফ্ল্যাটে আমার সহবাসী ভাড়াটে ছিলেন মিস্টার কাপাডিয়া, মিস্টার রাইনবথ, মিস্টার পর-দেশানী, মিস্টার ছেদীলাল, মিস্টার তরোয়ালকর। পরিসংখ্যানের অঙ্কে একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, পাঁচজন পুরো-ইণ্ডিয়ান। এই নবগৃহে সেই পরিসংখ্যানের গণেশ একেবারে উল্টে গেলেন। দুবেজীর কাছে জানলাম মোট দশটি ফ্ল্যাটে আমিই সবেধন নীলমণি ইণ্ডিয়ান, বাকি নবরত্ন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাই দুইসার ঘরের মাঝখানের প্যাসেজে এ্যাংলো-শ্রীমতীদের হাইহিল জুতোর খটাখটে যে আমার ভাবসমাধির বেশ ব্যাঘাত হবে, তা ঘণ্টা কয়েকের ভিতরেই হৃদয়ঙ্গম হল। হাইহিল জুতোর জোরালো শব্দ করেই বোধহয়, দেব-বারবিলাসিনী মেনকা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করেছেন তাঁর ঘোরতর তপস্যার ফল কেড়ে নেবার ফিকিরে, ইন্দ্রের হুকুমে।

শ্যাম মল্লিক মিছে কথা বলেনি। তবে সত্যি কথাও বলেনি। ও-বাড়ির থেকে এ-বাড়ির ফ্ল্যাটগুলো ছোট, সেটা ঠিকই, কিন্তু এত ছোট তা বলেনি। তবে আমার ফ্ল্যাটটা একেবারে রাস্তার পাশে বলে কবর-বাসের মতো হাঁইফাঁই করতে হবে না, সামনের জানলা দিয়ে রাস্তার লোকযাত্রা যানবাহনযাত্রা দেখে ফালতু সময় কাটানো যাবে। ভৃত্য যোশেফ একটু নৈরাশ্যবাদী, সব কিছুরই খারাপ দিকটাই বড় করে দেখে। আমের শাঁসটা যে রসাল, রসটা যে মিষ্টি, সেটাকে তারিফ না করে হাত থেকে আঁঠিটা যে ফস্কে যেতে চায় সেটাই তার কাছে একটা বিশ্রী ব্যাপার। যোশেফ আমাকে জানিয়ে দিল ঐ জানলা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ রাস্তার ধুলো এবং ফেরিওয়ালাদের চিৎকার ঘরে ঢুকবে, এমন কি চোরও ঢুকতে পারে, সাবধানে না থাকলে।

পোস্টঅফিসে ঠিকানাবদলির জানানি পাঠালাম। এটা নিয়মরক্ষার মামুলী কর্তব্য। কিন্তু যখন এ-সংসারে এসে জন্মেছিলাম তখন যেখান থেকে এসেছিলাম সেখানে ঠিকানা বদলীর কোনো নোটিশ দিয়ে আসতে হয়নি। নাগপুর ছাড়ার

বছর দুই পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবদের অনেক চিঠিপত্তর আসত; ক্রমে দীর্ঘ অদর্শনে এবং জীবিকার্জনের ধাক্কায় তাদের পত্রচালনাও পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ইদানীং কেবল বিদেশী ডাকের ছাপাঙ্কিত কতগুলো চিঠি আসে মাঝে-মাঝে, ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অনুসন্ধানের জবাবস্বরূপ, আর আসে কখনো-সখনো চাকরির দরখাস্তের জবাব—উই রিগ্রেট টু ইনফর্ম ইউ ইত্যাদি।

চাকরি মানে গোলামী, চাকরি করতে আমার সত্যিই ইচ্ছে করে না, কিন্তু 'নেই কড়ির চাইতে কানাকড়িও ভালো,' স্রেফ বসে থাকার চাইতে কোনো কাজ যদি জুটে যায় তবে মন্দ কি? বাবা বেঁচে থাকলে আমাকে ব্যারিস্টারি পড়তেই বিলেত যেতে হত, কিন্তু এখন বাবা নেই, সে তাগিদও কম। তবে ব্যারিস্টারি ছাড়া আরো কত কি তো শিখে আসা যায়? ইতিমধ্যে হিসেব করেই খরচা করতে হবে। ভালো ফ্ল্যাট যোগাড়ই বা হবে কি করে?

ডিসেম্বর মাসের ধোঁয়াটে ঘোলাটে কলকাতা ধূসর সন্ধ্যায় মুখ ঢেকে বসে আছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম। সামনের ফটকে শাদা পাথরের ফলকে তেত্রিশ নম্বরটা হঠাৎ যেন দাঁত ভেঙচাল আমাকে। এ-তিনদিন খেয়ালে আসেনি যে নফরদা বলেছিলেন ডোরিন গ্রে নামের সেই বহুরূপী নাচনেওয়ালী গাওনেওয়ালীটি এই তেত্রিশ নম্বরেই থাকে। মনটা খিঁচড়ে গেল। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে ভাবলাম তাতে আমার কি? আমার মতো ও-ও তো কোথাও থাকতে চায়? এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়ায় যখন বাস করছি তখন খুঁতখুঁত করলে চলবে কেন? এদের মেয়েরা বেশির ভাগই রোজগার করে খায়, ওদের মধ্যে কে সতীলক্ষ্মী, কে পর-বিলাসিনী কি করে জানব? আলাপ না করলেই তো হয়।

হেঁটে এসে গরম বোধ হচ্ছিল। পুলওভারটা খুলে, সিগারেট ধরিয়ে আরামসে বসেছি এমন সময় দরজায় কে যেন টোকা দিচ্ছে। বললাম, "ভেতরে আসুন।"

সেদিন বিশ্বামিত্র ও মেনকার কথা ভেবেছিলাম হাইহিল জুতোর খটাখট শব্দ মাঝের প্যাসেজে শুনে। ঘরে যে ঢুকল তার পায়ে হাইহিল জুতো নেই, কিন্তু মেনকার মতোই রূপসী মনে হল।

"তোমার নাম কি মিস্টার ক্যাপ্টান ব্যারন স্যানিয়াল?"

গলাটাও অদ্ভুত মিষ্টি। কিন্তু একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে হঠাৎ ঘরে ঢোকায় মনের রাগ মনেই চেপে উত্তর দিলাম, "তাই তো জানি!"

মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, "নিজের নাম নিজে জানা খুব বাহাদুরী নয়, তবে আমি জানব কি করে? তাই জিগগেস করছি। এ চিঠিগুলি পোস্টম্যান জানলা দিয়ে আমার ঘরে ফেলে গেছে, ঠিকানায় তোমারই নাম।"

কিছুক্ষণ পরে হুঁস হল বড় ভুল হয়ে গেছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই হোক, আর যেই হোক, ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল, বসতে বলাও উচিত ছিল, কিন্তু কিছুই বলা হয়নি, দাঁড়িয়ে থেকেই চলে গেল। ছিঃ, ও ভাবল কি? মন আমার ব্যঙ্গ করে উঠল—স্যার কে. বি. সান্নেলের ছেলে শ্রীমান কে. বি. সান্নেল জুনিয়ার—অতি সাধারণ ভদ্রতাও তুমি ভুলে যাচ্ছ কলকাতায় এসে?



৫

নন্দরদার সঙ্গে এ-বাড়ি আসার পর আর দেখা নেই। দেখা করবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গাও নেই। তবে এণ্টালী মার্কেটের এক ফটোগ্রাফের দোকানে ওঁকে মাঝে-মাঝে বিকেলবেলা দেখা যায়। আমি উঁকি দিয়ে যদি ওঁকে সেখানে দেখতে পাই, এবং উনি আমাকে দেখতে পান তবে নেমে আসেন। সেখানে জিগগেস করে জানলাম উনি কলকাতার বাইরে গেছেন। কোথায় গেছেন? ওঁর কাগজের রবি-বাসরীয় সংস্করণে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ বেরোবে, তারই মালমসলা যোগাড়ে।

ওয়েলেসলী স্ট্রীট দিয়ে গলির মুখে ঢুকলে কিছুদূর পরেই আমার আগেকার সতেরো নম্বরের বাড়ি। রাইনবথের ফ্ল্যাট থেকে রেডিওগ্রামে খুব জোরে একটা ফক্সট্রট নাচের বাজনা বাজছে। ফ্ল্যাটটা একতলায়, জানলা দিয়ে ড্রইংরুমে দেখা গেল রবারের বেলুন আর ফুলে-ফুলে থৈ-থৈ, ম্যাণ্টেলপিসের উপর সারি-সারি ক্রিসমাসকার্ড। মনে পড়ে গেল আজই ক্রিসমাস ইভ, বড়দিনের বোধন।

ঝোঁকের মাথায় আমিও দুটো তোড়া কিনলাম ফুটপাথের ফুলওয়ালার কাছে। ঘরে এসে তোড়া দুটো কেমন করে সাজাব ভাবছি, মনে পড়ে গেল পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটির কথা। সেদিনকার অভদ্রতার আক্কেলসেলামী বাবদ ওকে একটা দিলে কেমন হয়? তা মন্দ হয় না। আজ ওদের একটা উৎসবের দিন, শুভেচ্ছা জানানোর দিন। কিন্তু কার্ডে কি নাম লিখে পাঠাব? ওর নামও তো জানি না?

যোশেফকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চাকর দিয়ে পাঠানোও খুব ভালো দেখাবে না, যখন পাশাপাশি ঘরে আছি। নিজেই নিয়ে চললাম।

মেয়েদের কাছে আমি বোকা বনে যাই। দরজা ভেজানো ছিল, টোকা না দিয়েই ঢুকে পড়লাম, জিগগেস করলাম যথারীতি, "আসতে পারি?"

ভিতরে অন্ধকার। ধরা-গলায় জবাব এল, "ঢুকেই তো পড়েছ, এখন আর জিগগেস করবার কোনো মানে নেই, দরজার ডানপাশেই আলোর সুইচ।"

আলো জ্বাললাম। একি ? এই আনন্দের দিনে মেয়েটির চোখে যে জল, চোখ দুটো ফুলেছে। এমন উটকে এসে পড়াটা আমার নিশ্চয়ই ভালো হয়নি? এই দ্বিতীয়বার বেকুবি। হয়তো ওর মনের কোনো গোপন ক্ষতমূলে আঘাত করলাম!

খৃস্টানী স্কুল-কলেজে আমি মানুষ। বাবা পুরোসাহেব ছিলেন, বড়দিন পরবের আদবকায়দা আমি খুব ভালো করেই জানি। কিন্তু কি লজ্জার ব্যাপার! মেরি ক্রিসমাস সম্ভাষণটাও ভুলে গেলাম, কোনোরকমে ফুলের তোড়াটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে চলে আসবার জন্যে পা বাড়ালাম।

"মিস্টার স্যানিয়াল! একটু বস।"

মেয়েটি তোড়াটা ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের ফটোর সামনে ফুলদানিতে বসিয়ে দুপাশে দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল, আমার মুখ থেকে এতক্ষণ পরে বেরোল, "মেরি ক্রিসমাস টু ইউ।"

ও চট করে ঘুরে দাঁড়াল, বলল, "মেরি ক্রিসমাস ? আমাকে বলছ ?"

"হ্যাঁ, তোমাকে।"

ওর দু-চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল, ছুটে ভেতরের ঘরে পালিয়ে গেল।

বসে থাকব কি থাকব না ভাবছি। ভেতর থেকে কানে এল, "একটু বস দয়া করে। চা নিয়ে আসছি।"

ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। দারিদ্র্যের নগ্ন প্রকাশ। যে কাউচে বসে আছি তার স্প্রিংগুলো ভেঙে এবড়োখেবড়ো হয়ে গিয়েছে, বিবর্ণ রেডিওটা যে বহুকাল আগেই পটল তুলেছে তা দেখলেই বোঝা যায়, পর্দাগুলো যেন খসে আসছে। আরো লক্ষ্য করলাম ম্যান্টেলপিস-এ একটিও ক্রিসমাস কার্ড নেই, তবে কি ওর কেউ নেই আজকের দিনে ওকে মনে করতে ? এও কি সম্ভব ?

প্রায় দশ মিনিট পরে চায়ের ট্রে নিয়ে মেয়েটি ফিরে এল। গায়ের রঙ-চটা ব্লাউজ ছেড়ে একটা ফুল-কাটা ছোট কোট পরে।

"এত হাঙ্গামা করবার দরকার ছিল না।"

"আমিও চা খাইনি। আজকের দিনে একা-একা চা খেতে ভালোও লাগে না।

আজ পাঁচ বছর কলকাতায় আছি, ক্রিসমাস ইভ-এ তুমি এই আমার প্রথম অতিথি।"

মুখখানি সত্যিই ভারি চমৎকার। সেদিন হুট করে আমার ঘরে ঢুকে পড়ায় খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম, কিন্তু আজ এই দীন পরিবেশে দেখে বেশ দুঃখ হল। নিটোল হাত দুখানা, চাঁপাফুলের কলির মতো আঙুল দিয়ে ও আপেল কেটে, আমার প্লেটে দিল, খানকয়েক বিস্কুট, তারপর কাপে চা ঢেলে আমার সামনে রাখল।

"চিনি ক-চামচ দেব ?"

"এক চামচ।"

গলার স্বরও ভারি মিষ্টি। কিন্তু হাজার হলেও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। এটা হয়তো আমার খুব অন্যায়, কিন্তু ওদের উপর আমার ধারণা মোটেই ভালো নয়। ওদের থেকে তফাত থাকাই ভালো।

"ঐ যাঃ, চকোলেটের প্যাকেটটা আনতে ভুলে গেছি।"

"দরকার নেই।"

ও উঠে গিয়ে নিয়ে এল।

"হাসছ যে মিস্টার স্যানিয়াল ?"

"তোমার চা খাচ্ছি, চকোলেট খাচ্ছি, অথচ তোমার নামই জানি না, মিস না মিসেস তাও জানি না।"

"মিস ডোরিন গ্রে।"

সপাং করে আমার মুখে যেন চাবুক পড়ল! নকরদা ঠিক ঐ নামই তো বলে-ছিলেন ? নিম্ফ-অফ-দি-নাইল, প্যারিসিয়েন পুশী, ক্যাবারে-গার্ল, রেস্টরাণ্টসিঙ্গার! ওর সঙ্গে আমি বসে চা খাব ? ছিঃ!

উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রতা-টদ্রতার ধার ধারি না।

"ও কি মিস্টার স্যানিয়াল উঠলে যে ?"

"এক কাপ চা তো খাওয়া হয়েছে।"

"আর এক কাপ। তুমি ক্রিসমাস ইভে আমার প্রথম অতিথি, উঠে যেয়ো না।"

বসে পড়লাম। লজ্জা, ঘেন্না ও দয়া একত্রিত হয়ে আমার মনকে যেন দুর্বল করে ফেলল। ঐ রূপ, এই নিঃসঙ্গতা, এই নিঃস্বতা! হয়তো দারিদ্র্যের অন্তরালে একটা গভীর দুঃখও আজকের এই উৎসবের রজনীতে ওর বুকে আর্তনাদ করে মরছে!

যীশু কি বলেছেন ? পাপকে ঘৃণা করবে, পাপীকে ঘৃণা করবে না, দুঃখীকে দয়া করবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে না। কলকাতায় এসে প্রথম-প্রথম রাস্তা ভুল করে অনেক সময় অজানা গলির ভিতর গিয়ে পড়তাম। আজও যেন তেমনি কিস্তালিজীবনের এক নতুন গলিতে এসে দাঁড়িয়েছি। এ যেন একটা বদ্ধ গলি, আলোবাতাসহীন, স্যাঁতসেঁতে, রোদ-আলোর পথ নেই।

ভালো করে ডোরিন গ্রের মুখটি দেখলাম। ও অসামান্য রূপ নিয়ে জন্মেছে, এটা কি ওর ভাগ্য না দুর্ভাগ্য ? রূপের সঙ্গে চরিত্রের কি সম্বন্ধ ? রূপ দেহের, চরিত্র অন্তরের। এ-মুখ তো কোনো ক্যাবারেগার্ল বা রেস্টরাণ্ট-ক্রুনারের হতে পারে না? ঐ হরিণ নয়নের শান্ত সংযত দৃষ্টিতে তো কোনো লীলাবিলাসিনীর উষ্ণ রক্তের উত্তাপ নেই ? ঠোঁটে গালে নখে কোনো মেক-আপের মেকীছাপ নেই ? প্রমাণ না পেলে খুনেকেও ফাঁসি দেওয়া যায় না, তবে সরাসরি ওকে খারাপ ভেবে আমার ঘৃণা করবার কি অধিকার আছে ?

"চা-টা তো বেশ ভালো, ভারি সুন্দর গন্ধ। কোত্থেকে কেনো ?"

আপেলের এক চাকলা দাঁতে রেখেই ও জবাব দিল, "বল তো তোমার জন্যে এক প্যাকেট এনে দিতে পারি। বাজারে এ-চা পাবে না।"

দাঁতগুলো মুক্তোর মতো, সিগারেটের হলদে ছাপ পড়েনি। বললাম, "না, থাক, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।"

ওর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম। কথাবার্তায় শালীনতা আছে, ব্যবহার মার্জিত। নফরদা নিশ্চয়ই ভুল নাম বলেছেন।

অন্যদিন হলে শীতের রাতে আবার বেরোতাম না। কিন্তু ঘরে গিয়ে কেন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল। কোট আর স্কার্ফ চড়িয়ে পা বাড়ালাম।

সতেরো নম্বরের পাশ দিয়ে যেতে শুনলাম রাইনবথের ফ্ল্যাটে দামালধরনের 'যাজ' সুরে বাজনা বাজছে। হুল্লোড় সবে শুরু, অন্য-অন্যবারের মতো শেষ হবে হয়তো কালকে রাত বারোটার আগে নয়। আমাদের দুর্গাপুজার মতো ওরা ক্রিসমাস পরবে ঢাকঢক্কা বাজিয়ে পাড়া ফাটায় না, লাউডস্পীকারের একটানা হামলায় শান্তির পিণ্ডি চটকায় না, যার-যার বাড়িতে বা হোটেলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তি জমায়। ওদের সে ফুর্তিতে আমরা যোগদান করতে পারি, কিন্তু আমাদের পুজোপার্বণের বেয়াড়া হৈহট্টে যোগদান করা ওদের ধাতে সইবে না।

বড়দিনের সাজসানাই দেখতে-দেখতে এসে পড়লাম পার্ক স্ট্রীটে। ঘড়িতে দেখি প্রায় নটা বাজে। একটা নাম-করা রেস্টরাণ্টের কাছে এসে পা-দুটো আমার অজানতেই থেমে পড়ল। ডোরিন গ্রে যে চকোলেট খেতে দিয়েছিল, তার সোনালী মোড়কে এই রেস্টরাণ্টের নামই লেখা ছিল না? নিশ্চয়ই ও এখানে গান গায় ডিনারের সময়, কিন্তু ক্যাবারেনাচের মতো বড় রেস্টরাণ্ট এটা নয়। ঢুকে গেলাম।

হলের ও-ধারে একটু উঁচু প্ল্যাটফর্ম। জনচারেক লোক কালো পোশাকে প্রজাপতির মতো বাঁধা কালো টাই পরে, পিয়ানো আর তিনরকমের বাজনার যন্ত্রের সামনে বসে আছে। একটি মেয়ে পেছন ফিরে পিয়ানোর কাছের লোকটাকে কি যেন ফিসফিস করে বলছে, বোধহয় কোন গানটা এখন গাইবে বাতলে দিচ্ছে। মেয়েটি মাইক্রোফোনের কাছে এসে দাঁড়াতেই বাজনা শুরু হল। হ্যাঁ ডোরিন গ্রে-ই বটে! কালো প্লীটেড স্কার্ট, শাদা সাটিনের গলা-খোলা পিঠখোলা ব্লাউজ কানে মুক্তোর ড্রপ (বোধহয় নকল মুক্তো!), ঠোঁটে নখে টকটকে লাল রঙ, ভ্রূ আঁকা, মুখে চটুল হাসি। যে গান গাইছে তার পদগুলোও খুব সুরুচিপূর্ণ নয়। এই কি সেই ডোরিন গ্রে যাকে আজ সন্ধ্যেয় দেখেছিলাম অন্ধকার ঘরে একা-একা কাঁদছে—নিরাভরণা, সর্বপ্রকার প্রসাধনবর্জিতা, বিবর্ণ-জীর্ণবসনা?

খাবার ইচ্ছে একেবারেই চলে গেল। কিন্তু বেকুবের মতো একটা টেবিল আটকিয়েও বসে থাকা যায় না। কিছু খাবার আর কফির অর্ডার দিলাম।

অপূর্ব সঙ্গীত বটে! অপূর্ব গলা! ঘষেমেজে এমনটি হয় না। যার হয় সে জন্মের সঙ্গেই এটা নিয়ে আসে।

ডোরিনকে আজ সন্ধ্যায় দেখেছিলাম একটি শেফালীফুলের মতো শুভ্র সুন্দর নয়নমুগ্ধকর। এখন দেখাচ্ছে উদগ্রযৌবনের প্রখরতায় প্রদীপ্ত, বসোরার গোলাপের মতো। চোখ জ্বালা করতে লাগল আমার। বয়কে ইশারা করে ডেকে বিল চুকিয়ে পেছন ফিরে পালিয়ে এলাম।

কপাল ঘেমে উঠেছে। হাঁটতেও আর যেন পারছি না। কুইন্‌স্ ম্যানসনের সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল, উঠে বসলাম।

ট্যাক্সিওয়ালা বাঙালী। আমাকে একটু বেসামাল ভেবে জিগগেস করল কোথায় যেতে চাই। ইঙ্গিতটা কদর্থ এবং রাত একটু বেশি হলে মধ্য-কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা এরকম দালালি করেও উপরি রোজগার করে শুনেছি।

বললাম, "বাড়ি যাব, চল এণ্টালী।"

ট্যাক্সির মধ্যে বসে ভাবছিলাম এই আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ডোরিন গ্রে-র যে দুই রূপ দেখলাম তার কোনটি খাঁটি কোনটি মেকী? নক্করদা ঠিকই বলেছিলেন—স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করবিনে কাঞ্চন, রাম-ঠকা ঠকবি। স্বয়ং বাবাঠাকুর শিব, উমা মা-ঠাকরুনের দশমহাবিদ্যারূপ দেখে দিশেহারা হয়ে বেলতলায় ছুট দিয়েছিলেন। ওদের কক্ষনো চেনা যায় না। পুরুষরা সোজাসিধে তাই শ্রীমতীরা ছলাকলায় তাদের ভেড়াকান্ত বানিয়ে ছাড়ে, আবার খেয়াল হলে আমের আঁটির মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়। ওরা সর্বনেশে জীব!

তবে কি ডোরিন গ্রে-ও একটা সর্বনেশে জীব? জাল পেতে শিকার ধরাই ওর পেশা? মন কিন্তু সায় দিল না। ওর যে দুটো রূপ দেখলাম হয়তো তার দুটোই সত্যি। পেট-চালানোর জন্যে ওকে সাজতে হয়, নাচতে হয়, গাইতে হয়, কিন্তু ঘরের মধ্যে ও নিঃস্ব রিক্ত, কোনো কারণে বিপর্যস্ত বেদনাহত। আমার মাকেও তো দেখেছি যখন বাড়িতে থাকতেন তখন শাদা লালপেড়ে শাড়ি ছাড়া কিছু পরতেন না, পুজো-আচ্চা করতেন, বাবুর্চিখানায় গিয়ে দু-এক পদ রান্নাও করতেন, কিন্তু পার্টিতে যাবার সময় পুরোদমে মেমসাহেব সাজতেন, নিজেই মোটর চালিয়ে যেতেন!

কলকাতায় এসে আমি কোনো মেয়ের সঙ্গেই ভালো করে মিশিনি। মানে মিশতেই পারি না। স্ত্রীলোকের কাছে আমার মুখে কুলুপ এঁটে যায়। সত্তরো নম্বরে যে-কটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তা শুধু নমস্তে, গুডমর্নিং দিয়েই আরম্ভ এবং শেষ, ভদ্রতার খেলাপ বাঁচাতে নামমাত্র মাশুল।

পরের দিন ক্রিসমাস-এর দিন। বেলা প্রায় দশটা। বই পড়ছি। কে যেন দরজায় ঠুকঠুক শব্দ করল, বললাম অভ্যেসমাফিক, "ভেতরে আসুন।"

ডোরিন গ্রে। হাতে একটা প্যাকেট। বলল, "মেরি ক্রিসমাস মিস্টার সানিয়াল, তোমার জন্যে চা এনেছি।"

দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "বসো মিস গ্রে। কত দাম?"

খিল-খিল করে ও হেসে উঠল, বলল, "দাম লাখটাকা, চেক লিখে দাও। ওটা কি বই পড়ছ?"

বইটা ওর হাতে দিলাম, বললাম, "সত্যি বল কত দাম? আমার জন্যে কিনেছ, তুমি দাম দেবে কেন?"

"ক্রিসমাস-এর উপহার, ওর দাম শুধু হাসি মুখে নেওয়া। আমিও বই পড়তে খুব ভালোবাসি। কিন্তু এটা বড়লোকীনেশা।"

"সিগারেট খেয়েও তো পয়সা নষ্ট কর নিশ্চয় ?"

"খাই না। বাঃ, এটা টেগোরের বই ? তোমার পড়া হলে আমাকে পড়তে দিও।"

"কবিতা কি তোমার ভালো লাগবে ? আমার কাছে ডিটেকৃটিভ নভেলও কিছু আছে তার একখানা বরং পাঠিয়ে দেব।"

"না, না, কবিতার বই-ই ভালোবাসি, টেগোরের সবকখানাই প্রায় পড়েছি। এটাও পড়েছি, তবে টেগোরের কবিতা একবার পড়লে তৃপ্তি পাওয়া যায় না, বারে-বারে পড়তে ইচ্ছে হয়, কিন্তু লাইব্রেরির বই তো পড়েই ফেরত দিতে হয়। অনুবাদই যখন এমন সুন্দর মূল কবিতাগুলি তবে না জানি কি চমৎকার!"

সত্যিই অবাক হলাম। কাল রাতে যার এক-ঘর নরনারীর সামনে দেহের উপরার্ধে স্বল্পাবরণের নির্লজ্জতা দেখে ছিঃ-ছিঃ মনে হচ্ছিল, সে কবিতার বই পড়তে ভালোবাসে! তাও আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা, যার ভাব-সমৃদ্ধির মায়ালোকে অনেক বাঙালীও প্রবেশ করতে পারে না ?

কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে বোধহয় তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ কানে এল, "মিস্টার সানিয়াল, তুমি আমার কথা বিশ্বেস করছ না ? ভাবছ আমি মিথ্যুক ? মিছে কথা বলছি ?" বলতে-বলতে ওর মুখে যেন কে ছাই ঢেলে দিল।

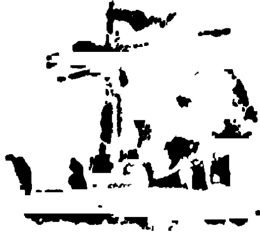
লজ্জা পেলাম। বললাম, "না-না-না, সে কথা ভাবছিলাম না। ভাবছি আজ বাইরে কোথাও খেয়ে আসি। ক্রিসমাস লাঞ্চ, মেনু ভালোই থাকবে সব হোটেলে। যাবে তুমি ? একা-একা খেতে আজকের দিনে ভালো লাগবে না আমার, আবশ্যি যদি তোমার আর কোথাও নেমন্তন্ন না থাকে।"

মেয়েটি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বললে, "আমাকে কে আবার নেমন্তন্ন করবে? তেমন অদৃষ্ট আমার নয়। বেশ তা-ই চল, এখন তো রান্না চাপাতে যাচ্ছিলাম।" মুখে ওর খুশির হাসি।

"আমিও আমার চাকর যোশেককে ছুটি দিয়েছি, ভেবেছিলাম ইলেকট্রিক স্টোভে যা হোক কিছু নেড়েচেড়ে নেব।"

ওকে আমি মিথ্যুক ভাবছি না সেটা চাপা দিতে ঝোঁকের মাথায় একেবারে

বোকার মতো নিমন্ত্রণই করে বসলাম, ভেবে নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছিল। আজ সব বড় হোটেলেই খুব ভিড় হবে, তাই আগেভাগেই বহু টেবিল রিজার্ভ হয়ে আছে। কি করা যায়! বহু কষ্টে ফার্পোতে দুজনের মতো একটা টেবিল ঠিক করে রাখলাম টেলিফোনে। টেলিফোন এ-বাড়িতে কারু নেই, সুতরাং একটা দোকান থেকে করতে হল।



৬

ডোরিন গ্রে-কে সময় দিয়েছিলাম বারোটা। কাল রাতে যেরকম সেজেছিল, ঠিক সেই রকমই সেজেগুজে আমার সঙ্গে ও চলল। দেখে ঘৃণা হল, কেন এই এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটাকে বেকুবের মতো নিমন্ত্রণ করে বসলাম? আবার একটু দুঃখও হল এই ভেবে যে এটা বোধহয় ওর একটিমাত্র ভালো পোশাক, আর নেই।

বড়দিনের উৎসবে ফার্পোর বিচিত্র সজ্জা। সুবেশ-সুবেশিনীদের ভিড় গিসগিস করছে। 'লিডো বার'-এও টেবিল ঠিক করা ছিল। ডোরিন গ্রে-কে নিয়ে প্রথমে সেখানে ঢুকলাম।

শাস্ত্রে আছে শুঁড়ীখানায় ঢুকলেও ব্রাহ্মণরা জাতিভ্রষ্ট হবেন। এ-কালে শ্বেতাঙ্গরাই ধনে মানে কুলে ব্রাহ্মণসম শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে এবং শুঁড়ীখানা ওদের কৃপায় কৌলীন্য লাভ করে 'বার' নামে পরিচিত। আর্যরাও অবশ্য প্রচুর পরিমাণে সোমসুরা পান করতেন, তবে সে সুরা যজ্ঞের অর্ঘে শোধন করে নেওয়া হত। কিন্তু সাধারণের জন্যে মাধ্বী মাধুকী সোমাসব ধুতুরাসব গৌড়ীয় প্রভৃতি যে সব সুরা আসব ও মদ্য বিক্রি হত সেগুলির যজ্ঞ-শুদ্ধি হত না বলে নিকৃষ্ট পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল, যেমন অনেক বাবাজী-পণ্ডিতজীরা বলির মাংস খান, কারণ তা দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, কিন্তু দোকানের মাংস খান না।

মাংসের মতো মদ শ্বেতাঙ্গদের না হলেই চলে না, উৎসবে ভোজে তো কথাই নেই, পেটে যতক্ষণ না ওদের একটু বিয়ার হুইস্কি জিন বা ব্র্যাণ্ডি ঢোকে ততক্ষণ রক্তে ফুর্তির আমেজ লাগে না। ওদের ব্যঙ্গ করে একজন রসিকসুজন প্রশ্নোত্তরে পদ্য রচনা করেছিলেন : 'দৈত্য কেন দেবতাদের হারিয়ে দিত দাদা? দৈত্য খেত লালপানি আর দেবতা খেত শাদা।' মানে দেবতারা শুধু দুধ খেতেন আর দৈত্যরা খেত সুরা, তাই দেবতারা দৈত্যদের কাছে যুদ্ধে প্রায়ই হেরে যেতেন। এখন ভালো-ভালো বার-এ গেলে দেখা যায় সেখানে শাদা আদমীদের চেয়ে কালো আদমীর

জমায়েতই বেশি, পয়সাওয়ালা কালো আদমীরা, যারা হালে হঠাৎ-সাহেব হয়ে উঠেছে।

বার-এ এসে ডেরিন গ্রে বলল, "আমি তো ওসব খাই না মিস্টার সানিয়াল, তুমি যদি খেতে চাও খাও।"

"আজকের দিনে একেবারে বাদ যেতে চাই না। দেখছ তো মিস গ্রে সবাই কেমন গেলাসের পর গেলাস গিলছে মন চাঙ্গা করবার জন্যে? বাবার ওখানে বড়-বড় পার্টি হত, লুকিয়ে-চুরিয়ে দু-এক ঢোক গলাধঃকরণ করেছি।"

"দুষ্টু ছেলে!"

আমি দুটো জিন-টনিক খেলাম, ও খেল আনারসের রস।

খাবার হলে ঢুকতেই একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এল। বললাম, "কে. বি. সানিয়ালের নামে দুজনের জন্যে টেবেল ঠিক করা হয়েছে।"

সে হাতের ফর্দ দেখে একজন বয়কে ডেকে হুকুম দিল, "সাব-মেমসাবকো চব্বিশ নম্বর মেজ দেখলাদো।"

মেনুকার্ড হাতে আর একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এলে বললাম, "আ-লা-কার্ট মেনু চাই, সাধারণ মেনু নয়।" আ-লা-কার্ট মেনুর ফরাসী নামগুলো দেখে ডোরিন গ্রে কিছু বুঝতে না পেরে আমাকে বলল, "মিস্টার সানিয়াল তুমিই অর্ডার দাও।"

বুঝে নিলাম খানদানী রেস্টরাণ্টের আ-লা-কার্ট মেনুর সঙ্গে ওর বিশেষ পরিচয় নেই। নিম্ফ-অফ-দি-নাইল বা ফ্রেঞ্চপুশী হয়ে যেখানে ও নেচেছে গান গেয়েছে সেখানে খদ্দেরদের জন্যে যেরকম রকমারি ব্যবস্থা, খুশি মতো বেছে নেবার আয়োজন, ভিতরে কর্মচারীদের জন্যে তেমনি অল্প খরচায় চাঁছাছোলা নির্দিষ্ট খানার বন্দোবস্ত, বাছাবাছির ব্যাপার চলে না।

মেনুটা চোখ বুলিয়ে অর্ডার দিলাম—অক্সটেইল কনসোমে, চিকেন এলাকিয়েভ, সোকোলাসাওস, ক্রিমচিজ, কফি।

আমি গোমাংসের সুপ অর্ডার করেছি দেখে ও জিগগেস করল, "মিস্টার সানিয়াল, তুমি খৃষ্টান?"

"না।"

"হিন্দু?"

"হ্যাঁ।"

"তবে অক্সটেইল স্যুপ অর্ডার দিলে যে? বীফ্ খাও?"

"কখনো-কখনো খাই। আমার বাবা বলতেন—ধর্মকে রান্নাঘরে ঢুকিও না, ভগবানকে নিজের জন্যে ডাকাডাকি করে বিরক্ত করো না, তাঁকে পরের জন্যেই ডাকতে শিখো, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।"

"কিসে মানুষ সবার চেয়ে বড়?"

"ইতর-প্রাণীদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া যাক, এমনকি দেবতাদের চাইতেও বড়।"

"কে বলেছে?"

"ইহুদীদের ওল্ডটেস্টামেণ্টে আছে ঈশ্বর, দেবতাদের এবং আর সব প্রাণীদের সৃষ্টি করার পর মানুষ সৃষ্টি করে দেবতাদের আদেশ করলেন তারা গিয়ে মানুষকে অভিনন্দন জানাক। ইব্লিশ নামে একজন দেবতা ছাড়া সকলেই গিয়ে মানুষকে প্রণাম করলেন, তখন ঈশ্বর রেগে ইব্লিশকে অভিসম্পাত করলেন, সেই অভিশাপে ইব্লিশ শয়তানের রূপ পেল। মুসলমানদের শাস্ত্রেও এই কাহিনীটি আছে। আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে নরই নারায়ণ।"

দেখলাম ও খুব আনন্দ করে খাচ্ছে। চিকেন অ্যালাকিয়েভ দুবার চেয়ে নিল। দেখে ভালোও লাগল, দুঃখও হল। বোধহয় এ-রকম খাবার ওর খুব কমই জুটেছে। কিন্তু ও-ও তো গুণী, টাকাও রোজগার করে, তবে এমন ইঁদুর পড়ে মূর্ছা যাওয়া অবস্থা কেন?

অর্কেস্ট্রায় স্ট্রাউসের বিখ্যাত 'ব্লু ড্যানিউব' সুরটি বাজছে, ও মেঝেয় আস্তে-আস্তে ডান পা ঠুকে তাল দিচ্ছে, মুখে হাসি। বড়দিনের মোহিনী সাজে কার্পোর প্রকাণ্ড হলটি লাস্যময়ী, সুবেশ ও সুবেশিনীদের সমাগমে উৎসবময়ী। হঠাৎ ড্রাম সিম্বাল ট্যাম্বোরিন দামালরবে ফেটে পড়ল। এ-সময়টির জন্যে সকলেই আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, ছুরি কাঁটাকে আপাতত ছুটি দিয়ে সকলে চোখ ফেরাল অর্কেস্ট্রার সামনের জায়গাটার দিকে, যেখানে টেবিল-চেয়ার সরিয়ে আগেই অনেকটা বেশি ফাঁকা করে রাখা হয়েছিল। এক কোণ থেকে তেজী একটা স্পটলাইটের আলো ওখানটা ঝলমলিয়ে খুট করে জ্বলে উঠল।

হুস করে ছুটে এল তিনটি উদগ্রযৌবনা শ্বেতাঙ্গিনী তন্বী রূপসী উর্বশী। বুকে সরু একফালি গোলাপী রঙের বক্ষবন্ধনী, কোমরে খুব আঁটসাঁট ছোট জাঙ্গিয়া ঐ

রঙেরই, পায়ে গোলাপী রঙের নাচের জুতো। শুরু হল উদ্দাম অ্যাক্রোব্যাটিক নৃত্য। কাগজে আগেই এদের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, ফ্রাউ ফ্রেডারিকার বিখ্যাত অ্যাক্রোব্যাটিক দল, মিউনিক থেকে এসেছে।

সামনে এসে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ওরা চাকার মতো বনবন কয়েকবার ডিগবাজী গেল, পা মেঝে ছুঁলোও না। তারপর এক-পা কাঁধে তুলে আবার চরকিবাজী। তারপর দুহাত দুপাশে পাখার মতো মেলে, এক-পা নাকের ডগায় উঁচিয়ে লাট্টুর মতো বোঁ-বোঁ ঘুরপাক, পরে দু-পা সামনে পেছনে বরাবর সোজা করে ছড়িয়ে দিয়ে ধুপ করে বসে পড়ল, যেন পা দুটো শরীরের সঙ্গে কোনো হাড়ের গাঁটে আঁটা নেই, শুধু আলগা সুতোয় বাঁধা। ঝুরঝুর এক পশলা করতালি। ওরাও কোমর ভাঁজ করে কুর্নিশ করে সবেগে প্রস্থান করল।

ছুরি কাঁটা যার-যার হাতে ফিরে গেল। ক্ষণিকের জন্যে অবহেলিত মাংসের টুকরো, পুডিঙের ভাঙা অংশ ব্রেকজার্নির পরে বাকি পথটুকু কাবার করতে তৈরি হল। চাপাহাসি ও মৃদুগুঞ্জন শব্দ ভোঁতা করে দিয়ে আবার ছুটে এল মেয়ে তিনটি ঝড়ের বেগে, নাচের ছন্দে। এ নাচের উদ্দাম ভঙ্গীর কাছে আমাদের নটরাজের প্রলয়নাচনও দাঁড়াতে পারে না। এই জার্মান সুন্দরীদের দেহ বীফ, সসেজ ও বিয়ারে গড়া, নটরাজের বিল্বফল ও সিদ্ধির সরবতে নয়। এরা বছর-বছর ধরে ব্যায়াম করেছে, অ্যাক্রোব্যাটিকস্ শিক্ষা নিয়েছে। নটরাজকে কেউ ব্যায়াম শেখায়নি, নাচ শেখানোর মাস্টারও ছিল না। ক্লাসিকাল ও আধুনিক—এ দুটোর মাঝেও বিস্তর তফাত। উর্বশী মেনকা রম্ভা মেখলা বহুলা মৃদুলা মঞ্জুলা বলয়া মলয়া ক্ষেমা প্রেমা রতি সুরতি প্রভৃতি দেবসভানর্তকীরা কি কায়দায় নাচ জমাতেন জানি না, তাই তুলনা চলে না।

তাকিয়ে দেখলাম ডোরিন গ্রে-র মুখ ফ্যাকাশে। কিছু আগে ওর মুখে যে হাসিটি ফুটে উঠেছিল, তা একেবারেই নিভে গেছে।

সারি বেঁধে নাচছিল মেয়ে তিনটি। হঠাৎ মাঝেরটি উঁচু লাফ দিয়ে তিনবার উলটেপালটে ডিগবাজী খেয়ে একেবারে আলোকস্তম্ভের মতো সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে একটি মেয়ে ধেই করে এক লাফে পাশের দুটি মেয়ের কাঁধে চড়ে আর এক ডিগবাজী খেয়ে বলের মতো গোল হয়ে গেলে পাশের দুজনের হাতে লোফালুফি চলল। তারপর তিনজনেই একপায়ে দাঁড়িয়ে বনবন ঘুরপাক। অতঃপর

তিনজনেই বাজনার তালে-তালে হাতের পেটের বুকের প্রত্যেকটি পেশীর কম্পন-নৃত্য দেখাল অনেকক্ষণ অনেক কায়দাকসরত সহকারে। বুক ও পেটের নির্লজ্জ নাচনটি সবাই হাঁ করে গিলতে লাগল। হাততালিতে হলটি ফেটে পড়তেই ওরা কুর্নিশ করে ছুটে পালাল।

উদগ্রযৌবনা অর্ধ-উলঙ্গিনীদের দেহসৌষ্ঠবের পশরা একপাল পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির সামনে কি বীভৎস নির্লজ্জতার সৃষ্টি করেছে! ডোরিন গ্রে তো পাথরের মতো নিশ্চল! ওর সামনে আমারও লজ্জা করছিল। ও জানে না, কিন্তু আমি জানি ও-ও এরকম স্বল্পাবরণে পুরুষের সামনে নাচে। যখন ও নাচে তখন ও নিজের রূপ দেখতে পায় না, কিন্তু আজ দর্শকের আসনে বসে ও নারীত্বের এই লাঞ্ছনায়, যেন মাটিতে মিশে যেতে চাচ্ছে। বুঝলাম কোথায় ওর আজ লেগেছে। ওদের মধ্যে ও নিজের রূপই দেখতে পেয়েছে।

"চল মিস্টার সানিয়াল, এবার উঠে পড়ি।"

"ছেলেমানুষি করো না মিস গ্রে, সকলে ভাববে কি? আরো তো একবার ওরা নাচতে আসবে। আমি পুরুষ হয়েও যদি দেখতে পারছি তবে তুমি পারবে না কেন?"

মনে-মনে আমার হাসিও পেল, কাক বলছে কোকিলকে—তুমি ভারি কালো।

পড়েছি যে অগস্ত্য ঋষি নাকি ধ্যানভঙ্গে বিরক্ত হয়ে একচুমুকে গঙ্গানদীকে গিলেছিলেন। কিন্তু গরম-গরম কফি একচুমুকে গেলা যায় না, পেয়ালাটি যতই না ছোট হোক। শঙ্কর মহাদেব একভাণ্ড হলাহল বিষ একচুমুকে শেষ করে গলায় ধরে রেখে নীলকণ্ঠ নামে বন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু গরম কফিতে মুখ ও গলা পুড়ে গেলে কণ্ঠনালী-বিশারদের কাছে ছুটতে হবে, তাই ডোরিনকে বললাম, "আস্তে-আস্তে খাও, আমি বয়কে ডাকছি বিল আনার জন্যে।"

শেষ নাচের জন্যে মেয়ে তিনটি আবার ছুটে এল। এবার হাতে ভর দিয়ে, মাথায় ভর দিয়ে, পা উঁচু করে নাচ। হলের প্রায় অর্ধেকই মহিলাদের দ্বারা সরগরম। ওঁরাও বেশ রসগ্রহণ করছেন তাকিয়ে দেখলাম। বাঙালী পুরুষ বাইরে ফুর্তি করতে যায় স্ত্রী-কন্যাকে বাড়িতে ফেলে রেখে, তাদের রুচিবোধ ও লজ্জাবোধ টনটনে। ইউরোপিয়ানরা স্ত্রী-কন্যা নিয়েই বাইরে ফুর্তি করতে যায় শুধু সম্মিলিত ভালো-লাগার চাহিদায়। পাঞ্জাবী মারোয়াড়ী সিন্ধি পার্শী এবং হঠাৎ-সাহেব

বাঙালীরা ইউরোপিয়ানদের অনুকরণে সপরিবারে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাইরে এসব জায়গায় আসে মুখ বদলের জন্যে। মাদ্রাজীদের মুশকিল এই যে যতই ওরা সাহেব হোক না কেন ওদের সৌভাগ্যবতীরা সম্বার দোশে ইডলি অন্নমের উপরে উঠে মাছ মাংস ডিমের স্তরে পৌঁছতে পারেনি। স্বামী দই না খেয়ে হুইস্কি খাবে তা ওরা ভাবতেও পারে না।

বিল চুকিয়ে নিচে এসে ফুটপাথে দাঁড়ালাম ট্যাক্সির আশায়। ডোরিন গ্রে-র মুখে অনেকক্ষণ কথা নেই, এই থমথমে ভাবটা বিশ্রী লাগছিল। ট্যাক্সিও যেগুলো সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে তার কোনোটাই খালি নয়। কলকাতার ট্যাক্সিসঙ্কট বারোমাস, বড়দিনের বাজারে সে-সঙ্কট অধিকতর সঙ্কটাপন্ন। ডোরিন গ্রে সেটা বুঝেই বলল, "ডাইনের গলি দিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে যাওয়া যাক, একটা রিক্সা জুটলেও জুটতে পারে। তোমার কথা জানি না মিস্টার সানিয়াল, কিন্তু আমাদের গরীবদের কাছে রিক্সাই হল জাতীয় ট্যাক্সি।"

চৌরঙ্গীতে ফার্পোর গাড়িবারান্দার তলে একটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতীমেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা ও ভয় দুই-ই হচ্ছিল। যদি নফরদা দেখেন তবে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবেন, তখন ভীষণ লজ্জা পেতে হবে। বললাম, "তাই চল মিস গ্রে, আসল ট্যাক্সি আর জাতীয় ট্যাক্সির মধ্যে তফাত খুব সামান্যই। যেমন ধর মশার কামড়ও কামড়, ভীমরুলের কামড়ও কামড়। কুকুরের ডাকও ডাক, সিংহের ডাকও ডাক। প্রেমে পড়াও পড়া, কুয়োয় পড়াও পড়া।"

রুমাল মুখে গুঁজে ও হাসতে লাগল। মাঝখানের থমথমে ভাব যেন দমকা হাওয়ায় উড়ে চলে গেল দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সত্যিই বাট্রাম স্ট্রীটের মোড়ে একটা খালি রিক্সা পাওয়া গেল। রিক্সাতে কখনো চড়িনি। ছোট বসবার জায়গা, আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুজনে দু-পাশে যথাসম্ভব কাত হয়ে বসলেও ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানো অসম্ভব। ইংরেজী 'ভি' অক্ষরের মতো হয়তো দেখাচ্ছিল।

"মেনুটা ঠিক বেছেছিলাম মিস গ্রে?"

"চমৎকার।"

"মেয়ে তিনটেও বেশ নাচল, না?

"হুঁ।"

"আমার এক বয়স্ক বন্ধু আছেন, নফরদা। তিনি বলেছেন, পেটের দায়ে সব-কিছুই করতে হয়, মনে যদি পাপ না থাকে তবে কোনো জীবিকাই দোষের নয়। ভালো-মন্দ পাপ-পুণ্যের বিচার মানুষ করতে পারে না, সেটা করবেন ভগবান।"

"ন্যাফারডা কি একজন সাধুপুরুষ ?"

"সাধু কি শয়তান জানি না, তবে তিনি মানুষের দুঃখ বোঝেন।"

ডোরিন গ্রে একটু চঞ্চল হয়ে পড়ল। বলল, "এখনকার দিনে তো কেউ অপরের দুঃখু বোঝে না, দুঃখু দিতেই ভালোবাসে ?"

"ঐ তিনটি জার্মান মেয়েও তো পেটের দায়েই এতদূরে টাকা রোজগারের জন্যে এসেছে। হয়তো ছেলে আছে, নয় তো স্বামী বেচারা রোগে শয্যাগত, নয় তো সৎপথে থেকে অন্য কোনোভাবে রোজগারের উপায় নেই, যা শিখেছে তাই দিয়ে করে খাচ্ছে।"

শুনতে-শুনতে ডোরিন গ্রে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

আবার বললাম, "নফরদা বলেন ডাক্তারী ব্যারিস্টারী কণ্ট্রাকটারীর মতো যে যা করে, তার মূলে আছে পেটচালানো, সংসারচালানো, ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর ভরণ-পোষণ। যার যাতে যোগ্যতা আছে সেটাই তার রোজগারের উপায়। থিয়েটারে সিনেমায় যারা নাচে গায় বাজায় তাদের সঙ্গে বড় ব্যারিস্টার, বড় ব্যবসায়ী, বড় ডাক্তারের এবিষয়ে তফাত কোথায় ?"

ওর সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে। নিজের অজান্তেই ও বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাত এত জোরে চেপে ধরেছে যে নখ ফুটে যাচ্ছে। বুঝলাম কি আঁকড়ে ধরে ও নিজের নারীত্বের সম্মান বজায় রাখতে চায়।

"নফরদা বলেন—পেশা হল পেশা। শিল্পীর পেশাও তেমনি। লোকদের মনে আনন্দদান করাই শিল্পীর সাধনা ও সার্থকতা। এর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। ঐ জার্মান মেয়ে তিনটিও দর্শকদের আজ আনন্দ দিয়েই আত্মপ্রসাদ লাভ করল, এ ভাবে দেখলে ওদের বেশভূষাকে ছি-ছি করতে পার না। বহুদিন ব্যায়ামসাধনায় ওদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সুঠাম সুন্দর শ্রী হয়েছে তাও তো দেখাবারই মতো। ভগবানের দেওয়া সৌন্দর্যকে তো ভগবানের দয়া বলেই মেনে নিতে হয়। শিল্পীই তো সে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। আর একটা কথা বলব মিস গ্রে ?"

"বল, শুনতে খুব ভালো লাগছে। আর তোমার ন্যাকারডার কথা ভাবছি।"

"তোমার বাঁ হাতের নখগুলো আমার ডানহাতে বসে যাচ্ছে। রক্ত বেরোবার আগেই তোমার হাতটা সরিয়ে নিলে ভালো হয় না কি?"

ডোরিন গ্রে খুব লজ্জা পেল, বলল, "মাপ কর, আমি টের পাইনি।"

"তুমি যে টের পাওনি তা আমি জানি, তাই রক্তপাত হবার আগেই তোমাকে জানিয়ে দিলাম। দোষ হয়েছে?"



৭

ডোরিন গ্রে-কে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। বড়দিনের একটা রূপ দেখে এলাম ফার্পোতে। কিন্তু আরো অনেক রূপও তো আছে? ট্রেনে এয়ারকণ্ডি-সন্‌ড্‌ কোচ-এ যারা যায় তাদের কাপড়চোপড় চালচলন মালপত্তরের ছিরিছাঁদ একরকম। কিন্তু থার্ডক্লাসে ছাগলগাদাই হয়ে যারা যায় তাদের বোচকাবুঁচকী কাপড়চোপড়ের চেহারা অন্যরকম। একই গাড়ির যাত্রী। একই সময় গন্তব্যস্থানে নামতে হবে এয়ারকণ্ডিসনওয়ালা ও থার্ডক্লাসওয়ালাকে। আজ বড়লোকেরও বড়দিন গরীবেরও বড়দিন, যারা খৃষ্টান নয়, তারাও কোনো না কোনো ভাবে আমোদ আহ্লাদ করবে।

হাঁটতে-হাঁটতে যেখানে গিয়ে পড়লাম এখানে আগে কখনো আসিনি। এণ্টালীপাড়াটা একটা গোলোকধাঁধা, হিজিবিজি গলি উপগলিতে ভরতি। যখন মনে হচ্ছে গলিটা উত্তর দিকে যাচ্ছে, তখন সেটার মুখে এসে দেখলাম পুবদিকে এসে পড়েছি।

কলকাতার বিচিত্র রূপ। বিরাট ঐশ্বর্য ও চরম দারিদ্র্য গলাগলি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণসিদ্ধিলাভ, কোথাও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রেতমূর্তি দাঁত বার করে ভ্যাঙচাচ্ছে। লক্ষ্মীর বরপুত্রদের হাস্যধারার সঙ্গে মিশছে সর্বহারাদের দীর্ঘশ্বাস, বহুবাস্তুদের ঠাটভাঁটের গরমের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের শীর্ণ অঙ্গের হিমেলী স্পর্শ।

শীতের অপরাহ্ন নারীর যৌবনের মতো স্বল্পস্থায়ী। বিগতযৌবন সূর্যের জ্যোতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে ছায়া নেমে এসেছে পথের উপর। ঘড়িতে দেখলাম মোটে চারটে বেজেছে। একটা স্যাঁতস্তেতে গলিতে ঢুকে পড়েছি। কানে এল কর্কশ নারী কণ্ঠে ইতর ভাষায় গর্জন: "ওরে মুখপোড়া এণ্টুনী, তোর মুখে আগুন, যদ্দিন মুঠোমুঠো টাকা ঘরে আন্‌তিস তখন ছিলি চড়-কিলের সোয়ামী, এখন তো তুই কবরখানার

লাস, রোগে-রোগে আমার হাড় ভাজা-ভাজা করছিস, তোকে চারবেলা গেলাবে কে শয়তানের পয়জার ?"

দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা লম্বা ধরনের পুরনো বাড়ি, টিনের ছাদের বারান্দায় একটা লোক বিড়ি ফুঁকছে। একটা রঙ-চটা নীল প্যান্টের ওপর শাদা ধবধবে সার্ট। মুখ দেখলেই বোঝা যায় হাড্ডিসার দেহ, মাংসের পট্টি শুকিয়ে গেছে। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কারভাবে চাঁছা, রোগপাণ্ডুর মুখে চোখদুটি জলজল করছে যেন জ্বরের উত্তাপে।

"তুই মর মর মর, তুই মরলেই আমি বাঁচি!"

ডান জুতোর মধ্যে কি যেন একটা খচখচ করে বিঁধছে। রাস্তার বুকটা এককালে বাঁধানো ছিল, এখন ইঁট বার-করা পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। হয়তো বহুকাল মেরামত হয়নি। কলকাতার সদররাস্তাগুলোই এখানে-ওখানে এবড়ো-খেবড়ো খোবলানো-হেঁচড়ানো, অলিগলিরা তো বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানোর দল। কলকাতা করপোরেশনকে সাধে লোকে বলে চোরপরেশন? কলে জল নেই, জলে পোকা, কাউন্সিলারদের সভায় চুলোচুলি গালাগালি, চুনোপুঁটি কর্মচারীদের কাজ দেখবে কে? যে টাকা ট্যাক্সে তোলা হচ্ছে, খরচা বাবদ কোথায় ঢালা হচ্ছে তার হিসাব রাখবে কে? কিন্তু ভোটের বাজার, জোটের বাজার, লুটের বাজার সব জায়গায়ই তো রমরম করে চলছে, তবে শুধু কলকাতা করপোরেশনকেই শাপান্ত বাপান্ত করা কেন?

জুতো খুলতেই খুট করে ইটের কুঁচিটা পড়ে গেলে একটা সিগারেট খাবার ইচ্ছা হল। সিগারেটকেশটা বার করে একটা মুখে দিলাম। কিন্তু হরি হরি! এপকেট ওপকেট হাতড়ে লাইটারটা পেলাম না। কালো, লুঙ্গী-পরা ষণ্ডামার্কা যে লোকটা গলিতে ঢুকবার সময় একেবারে গায়ের উপর এসে পড়েছিল, বোধহয় তারই হাত সাফাই। বিলিতি দামী লাইটার, বাবার নামের স্বাক্ষর তাতে। কেনই বা এ লক্ষ্মীছাড়া পাড়ায় বেড়াতে এলাম!

রোগা লোকটা তখনো বিড়ি ফুঁকছে দেখে এগিয়ে গেলাম।

একটা এ্যালুমুনিয়ামের ট্রেতে চা নিয়ে এসেছে একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক। চা সামনে রেখে সে একটা হাতপাখা দিয়ে লোকটিকে হাওয়া করতে আরম্ভ করেছে। এই শীতে হাওয়ার কি দরকার বুঝলাম না। আমাকে সিঁড়িতে পা দিতে দেখে

ফেটে পড়ল, "হবে না, হবে না, কিচ্ছু হবে না এখানে সরে পড়। চাঁদা বা ভোটের দালালকে ঝাঁটাপেটা করে বিদায় করে দিতে হয়।"

প্রাণীবিশারদরা বলেন কুকুর সিংহ ও বিড়াল নাকি কোনো-এক অতি-অতি প্রাচীন যুগের অতিকায় প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের তিনটি ধারা। কে-একজন বলেছেন কোনো-কোনো স্ত্রীলোকের কুকুরের স্বভাব, কোনো-কোনো স্ত্রীলোকের বেড়ালের মতো স্বভাব। গলার স্বরে নিঃসন্দেহে বুঝলাম একটু আগে যে ঘেউ-ঘেউ শুনেছিলাম, ইনিই তার মালিক। থমকে দাঁড়ালাম।

লোকটি বোধহয় আঁচ করল যে মুখে যখন আমার নির্ধূম সিগারেট, কুমারী কন্যার মতো অনাঘ্রাত অপাপবিদ্ধ, তখন আমার প্রয়োজন একটি দেশলাইর কাঠি মাত্র, চাঁদাফাঁদা নয়।

"আসুন মশাই, এই বিড়িটা দিয়েই ধরিয়ে নিন, দেশলাইর কাঠি খতম।"

"এণ্টুনী, তুমি একটা ক্লাব বানাতে চাচ্ছ এখানে। কে কি রকম লোক কে জানে? ও ডাকাতও তো হতে পারে?"

"ছিঃ মুন্না, চেহারা দেখে বোঝ না যে ভদ্রলোকের ছেলে? আর আজ ক্রিসমাস-এর দিন, ওরকম কথা বলতে নেই অচেনা অজানা লোককে।"

স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়ার মধ্যে না যাওয়াই বোধহয় ভালো, বিশেষত যখন আমাকেই নিয়ে ঝগড়া। ফিরে আসতে যাচ্ছিলাম, লোকটি কাতরকণ্ঠে বলল, "যাবেন না, আসুন, এই টুলটায় বসুন। মুন্না, যাও ভিতরে যাও, আর এক কাপ চা হবে?"

বেচারা বোধহয় কথা বলবার লোক না পেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। মুন্না নামের স্ত্রীলোকটিও ভিতরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, তাই ভরসা পেয়ে উঠে গিয়ে ধুলোভর্তি টুলটায় বসলাম। সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ওকেও একটা দিলাম।

"গোল্ডফ্লেক! একদিন ছিল যখন এটাই শুধু খেতাম। এখন কতকিছু নতুন সিগারেট বেরিয়েছে, চাখবার পয়সাও নেই। বিড়িই সস্তা। মুন্না আমার স্ত্রী, ওর কথায় অফেন্স নেবেন না মশাই, অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করে-করে মেজাজ অমন হয়ে গিয়েছে, চেহারাও পুড়ে গিয়েছে, এখনকার মুন্নার সঙ্গে আগেকার মুন্নার কোনো মিল নেই, অনেক সময় আমি চিনতেই পারি না।"

"চাকরি করেন, না ব্যবসা আছে ? কোনো অসুখ হয়েছে ?"

"পোড়াকপালের আধখানার সিকিভাগ, মিস্টার, আজ পাঁচ বছর ধরে এই হাল, ডুয়োডিনাল আলসার বড্ড পাজি রোগ। বছরে ছমাস চাকরি করি তো ছমাস অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকি।"

কি বলব ? বলার কি-ই বা আছে ? মোটেই তো চিনি না।

"কি ভাবছেন বুঝতে পারছি। মুন্নার মুখচোপা ? আপনি ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানেন, নারী-চরিত্রের কি-ই বা বোঝেন ?"

এ-প্রসঙ্গ তুলতে দুঃখ হল। বললাম, "না, না, কিছু ভাবছি না।"

"নিশ্চয়ই শুনেছেন ওর তর্জন-গর্জন, তখন তো ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ? বয়েস অনেক হলে বুঝবেন মেয়েজাতকে। আবার হয়তো সারা জীবনই বুঝতে পারবেন না। কজনেই বা বোঝে ? ওরা যদি স্বামীকে চোপা করে, পেটের সন্তানদের কারণে-অকারণে গুমগুম করে পেটায় তবে সেটা কি জানেন মশাই ? ফ্রাস্ট্রেসনের রিয়্যাকসন, বঞ্চিতার অভিমান, নির্যাতিতার আক্রোশ। অবিচারের ঝাল ঝাড়তে পারে না ওরা ভাগ্যের ওপর, আত্মীয়স্বজনের ওপর, ঝাড়ে নিজের ওপরে। সেই নিজ হল কে ? স্বামী ও সন্তানরা, যারা একান্তই নিজের জন। তখন ওদের মনে থাকে না যে স্বামী ও সন্তানরা ওদের দেহ ও মনের সবটুকু হলেও ঠিক 'আমি' বলা যায় না। ওরা ঝাল ঝাড়তে যতই উগ্রমূর্তি হয়, ভিতরে-ভিতরে ততই গুমরে কাঁদে। বিচিত্র প্যারাডক্স !"

লোকটা হাঁপাতে লাগল। আমিও একটু অবাক হলাম। এই চেহারা, এই বেশ, এই পরিবেশ ! এর কাছ থেকে এমনসব কথা শুনতে আশা করিনি। ইংরেজী-বাঙলার পরিষ্কার মার্জিত উচ্চারণ !

দরজার কাছে এসে আবার দাঁড়াল মুন্না নামের স্ত্রীলোকটি। বলল, "ভেতরে আসুন।"

ইতস্তত করছিলাম। বাঘের গুহায় ঢুকব ? ধমক খেলাম, "আসুন বলছি, একটু চা খেয়ে যান, যখন পরবের দিনে আমাদের বাড়িতে এসেছেন।"

ঘরটি বেশ চওড়া। পাশাপাশি দুটি খাট তালি-মারা রঙচটা বেডকভারে ঢাকা। একটা ড্রেসিং টেবিল, আয়নাটার জায়গায়-জায়গায় ফাটল ধরেছে, দুটো বেতের চেয়ার, একটা কাঁচের ব্র্যাকেটে ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের ছবির সামনে মোমবাতি জ্বলছে।

একটা টিপয়ে এক কাপ চা ও খানকয়েক বিস্কুট। আসবাব যাই হোক ঘরটি বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার।

"বাড়ির ও-পাশটা ভাড়া দিয়েছি, কাজেই বসবার আলাদা ঘর নেই। শোবার ঘরেই আনতে হল আপনাকে, কিছু মনে করবেন না। আমার নাম মুন্না এণ্টনী, বাইরে যাঁকে দেখলেন উনি আমার স্বামী, জন এণ্টনী। আপনি ?"

"কাঞ্চন সান্নাল।"

"বামুনের ছেলে ?"

"হ্যাঁ।"

"খৃষ্টানের হাতের চা খেতে আপত্তি আছে ?"

"কিছুমাত্র না, তবে আপনার চা কোথায় ?"

"একা-একা জমে না বুঝি ?"

"ভদ্রতা বলেও একটা জিনিস আছে।"

মুচকি হেসে স্ত্রীলোকটি আর এক কাপ চা নিয়ে এল। কাপ নয়, এ্যালুমুনিয়া-মের বাটি। বোধহয় দুটি মাত্র কাপই আছে, একটি বাইরে দেখে এলাম, আর একটি আমার সামনে।

বিস্কুটের প্লেটটি ওর দিকে এগিয়ে দিতে আবার প্রচণ্ড ধমক খেলাম, "ও কি হচ্ছে ? আমাদের মতো গরীবের ঘরে তো টিন-ভর্তি বিস্কুট থাকে না, মোটে চারখানা বিস্কুট দিয়েছি, তাও খেতে পারবেন না।"

"দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়েছে, খিদে নেই একদম। তবুও দুখানা নিচ্ছি, আপনি দুখানা খান।"

স্ত্রীলোকটি কথা বলে চলল, "ঐ জন এণ্টুনী মানুষ নয়, দেবতা। কত ওকে চোপা করি, তবু একটিও কড়া কথা কোনোদিন বলেনি আমাকে। সব মুখ বুজে সয়ে যায়। খুব বড়লোকের ছেলে ছিল, আমাকে বিয়ে করেই ওর কপাল পুড়ল, মাঝে-মাঝে আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু ওকে দেখবে কে ? এমন সোনার চাঁদ লোককে আমি কার হাতে দিয়ে যাব ? কে ওর কদর বুঝবে ? ওকে খাওয়াতে পারি না, পরাতে পারি না, বুক আমার ফেটে যায়।"

বলে কি ? যাকে কিছু আগে স্বামীর পিণ্ডি চটকাতে শুনেছিলাম, তার এত দরদ স্বামীর উপর ! চোখ দিয়েও টসটস করে জল গড়াচ্ছে ? বেশ অসোয়াস্তি বোধ

করছিলাম। কিছু সাহায্য চায় কি? কিন্তু ওর চেহারার মধ্যে এমন একটা ভাব দেখলাম যে জিগগেস করতে সাহস হল না। আরো অনেক কথা হল। একটা বস্তির সাধারণ স্ত্রীলোকের কথার মতো নয়।

জিগগেস করলাম, "আপনি কি কোনো স্কুলের টিচার?"

"নার্স। জন ব্যারামে পড়ে আর আগের মতো রোজগার করতে পারে না, তাই নার্সিং শিখতে হল। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি, যখন জন একটু ভালো থাকে।"

"নার্সিং পেশাটা বেশ ভালো, আপনার কেমন লাগে?"

"যখন কারু কাজ করি মনে হয় জন-এর সেবাই করছি। প্রাইভেট নার্সকে অনেক সময় অনেক মুশকিলে পড়তে হয়, কিন্তু আমার বয়েস হয়েছে তো।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে উঠে দাঁড়ালাম। মুন্না এণ্টনী সঙ্গে-সঙ্গে বারান্দায় এল। জিগগেস করলাম, "এ গলিটার নাম কি? বড় রাস্তা কোন দিকে?"

জন এণ্টনীই জবাব দিল, "খানিকটা ডাইনে গিয়ে, সোজা বাঁয়ে চলে গেলেই বড় রাস্তা পাবেন। এ-গলিটার নাম এণ্টনীবাগান থার্ড লেন, বড্ড খারাপ পাড়া, সাবধানে যাবেন, আজ বড়দিনের বড় দাঁ মারতে বদমাসরা ঘুরঘুর করছে।"

ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসছি, মুন্না এণ্টনী বলল, "দাঁড়ান, এ-পাড়ায় নতুন এসেছেন, এই অন্ধকারের ভিতরে আপনাকে একা যেতে দেওয়া ঠিক নয়, আমি সঙ্গে আসছি।"

একটা লাল স্কার্ফ জড়িয়ে শাদা চটিজুতো পরে ও আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

গলিটা সত্যিই বেশ অন্ধকার। রাস্তার আলোগুলোও যেন বস্তির লোকদের ঘৃণা করে, ভালো করে জ্বলতে চায় না। বড় বাড়ি একটিও চোখে পড়ে না, গাড়িরও চলাচলতি নেই। কয়েক পা যেতেই বিকেলের সেই লুঙ্গীপরা ষণ্ডামার্কা লোকটিকে দেখে ভয় হল। মুন্না এণ্টনীকে লাইটার চুরির ব্যাপারটা বলেছিলাম, ফিসফিস করে বললাম, "এই সেই লোকটা।"

লোকটি পাশ কাটিয়ে সরে পড়ছিল, মুন্না এণ্টনী বাজখাঁই গলায় তোপ দাগল: "সুলতান মিঞা, এ আমার ধর্মভাই, লাইটারটা ওর মরা-বাপের শখের জিনিস ছিল, ফিরিয়ে দাও বলছি।" কথাগুলো হল চোস্ত উর্দুতে।

লোকটি থতমত খেয়ে সেলাম করে বলল, "আলবত মুন্নাবেগম, এখানে একটু

ঠাঁরিয়ে থাকুন, লিয়ে আসছি।" খুব সরু একটা অন্ধকার গলিপথ দিয়ে সে আর একটা বস্তির মধ্যে অদৃশ্য হল।

পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে কে যেন আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল, গান গেয়ে উঠল : "হামার বঁধুয়া আন-বাড়ি যায় হামার আঙিনা দিয়া।"

মুন্না বেগম সিংহিনীর মতো গর্জন করে উঠল, "চোপরাও আমিনাবানু, এ আমার ধরমভাই আছে, হঠ্ যাও।"

জানলা খট করে বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েটা ভয় পেয়ে দৌড় দিল মনে হল।

সুলতান মিঞার ফেরত দেওয়া লাইটারটা পকেটে ফেলে আবার এগিয়ে চললাম। একটা দাড়িওলা মাতাল টলতে-টলতে আমাদের গায়ে এসে পড়বার উপক্রম করলে মুন্নাবেগম তার দাড়ি ধরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। বলল, "আলিজান, তুম ফির সরাব পিয়া?"

দাড়ির মালিকের নেশা ছুটে গেল, "কশুর মাফ কীজিয়ে মুন্নাবেগম, সরাব নেই পিয়া। আপকো ভি দেখা নেই।"

বুঝলাম ঐ মাতলামির ভাবটা ঢঙ, আমার ওপরই ওর তাক ছিল, এই অন্ধকারে লালরঙের স্কার্ফ-পরা মুন্নাবেগমকে ঠাওর পায়নি।

বড় রাস্তার মোড়েই একটা ফলের দোকান। মুন্না বেগমকে বললাম, "আমরা হিন্দুরা পরবের দিনে ঠাকুরদেবতাদের ফল দিয়ে পুজো দিই, দেবেন ভগবান যীশুকে?"

মুন্নাবেগম দপ করে আবার জ্বলে উঠল, "দয়া করতে চাচ্ছেন আমার রোগা স্বামীকে? ভারি দয়ালু আদমি!"

"ভাই বলে ডেকেছেন, ভাইয়ের দেওয়া জিনিসকে কি দান বলা যায়?"

ফলওয়ালা সেলাম করে বলল, "আইয়ে মুন্নাবেগম, কি-কি লিবেন আজ, রুপিয়া তো কুছ বকেয়াবি পড়রহা হায়।"

ওর স্কার্ফের আঁচলে আমি বেছে-বেছে আপেল আঙুর নাসপাতি কলা আর কমলালেবু তুলে দিলাম। ফলওলা হিসেব করে বলল, "দশ টাকা তিরিশ পয়সা।"

আমি চট করে দুখানা দশ টাকার নোট ওর হাতে গুঁজে কোনো কথার সময় না দিয়েই, 'ট্রাম আসছে' বলে ছুটলাম।

ট্রামে যেতে-যেতে ভাবলাম আজ বড়দিন আমার সার্থক হয়েছে। মাথা নিচু করে মনে-মনে মহাকারুণিক যীশু ভগবানকে প্রণাম জানালাম। হায় খৃষ্টান জগৎ

কি তাঁর বিশ্বমানবতার উপদেশ মানছে ? ধনলিপ্সা ভোগলিপ্সা রাজ্যলিপ্সার উন্মত্ত বলদর্পিত সভ্যতাগর্বিত দেশগুলি কেবল কালো তামাটে হলদে জাতগুলোকেই পায়ে চেপে অত্যাচারে জর্জরিত করছে না, নিজেদের ভিতরেও হান-হানি কাটা-কাটি করছে। সেই তাণ্ডবের আগুনে প্রেম, দয়া, মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

পেছন থেকে কে ডাকল, "কাঞ্চন, এদিকেও বসবার জায়গা আছে, চলে আয়।" ফিরে দেখি নফরদা। উঠে গিয়ে তাঁর পাশে বসলাম।

"এদিকে কোথায় গিয়েছিলি ?"

নফরদাকে বললাম মুন্না এণ্টনীর গল্প। উনি শুধু হুঁ-হাঁ করে শুনে গেলেন। তারপর "পানের দোকানটার কাছে থাকিস সময় মতো কাল," বলে নেমে গেলেন।

আমার আরো অনেক দূর যেতে হবে। আবার ভাবতে শুরু করলাম। ওই যে ডোরিন গ্রে-কে আজ বড় জায়গায় ভালো খাইয়ে একটু আনন্দ দিয়েছি, মুন্না এণ্টনী নামের রণচণ্ডী স্ত্রীলোকটিকে ঘৃণা না করে দিদি সম্পর্কে ফল উপহার দিয়েছি, এটা কি গরীবের প্রতি দয়া দেখালাম ? সেই দানের গর্ব ও অভিমান যদি আমার থাকে তবে তো আমার মনে সত্যিকারের কোনো কুশল সঞ্চয় হল না ? করুণাময় যীশুখৃষ্টের জন্মদিন তো আমার কাছে বৃথাই হয়ে গেল ? মন বলল ওহে কাঞ্চন, এটা অহেতুক মৈত্রী নয়, দুঃখীর প্রতি দয়া, তুমি দিতে পার তাই দেখালে। ছিঃ, যেদিন তুমি সত্যিকারের দরদী মরমী হতে পারবে দীনদুঃখীর দুঃখে, সেদিনই বুঝব তুমি সত্যিকারের মানুষ।

মন যা বলে ঠিক বলে। এরই নাম বিবেক। লজ্জা পেলাম, ঘৃণা হল এখন নিজের উপর। বাবার টাকায় বড়মানুষি দেখিয়ে ভাবছি অনেকের জন্যে খুব করলাম !

নফরদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরের দিন। বললেন, "পকেট একেবারে খালি আজ, তুই সিগারেট খাওয়া, আমার অনেক সিগারেট তুই পুড়িয়েছিস।"

"সিগারেট খাওয়া তো আপনিই আমাকে ভালো করে শেখালেন, সুশিক্ষার সঙ্গে কুশিক্ষা। আগে কিছুই জানতাম না, এখন কতকিছু জানবার চেষ্টা করছি।"

"তুই নেহাত বখে যাচ্ছিস ছোকরা, ফিলটারটিপ রিজেন্ট গোটা-প্যাকেট কেন, প্যাকেটটার যা বাকি থাকবে আমার পেকেটে পুরে দিস যাবার সময়। ভালো কথা, জন এণ্টনীদের ইতিহাস বার করেছি আজ, প্রত্যেক খবরের কাগজের অফিসে একটা রেফারেন্স সেক্‌শন থাকে। জন এণ্টনীর বাবা ডিক্সন কালীচরণ এণ্টনী ছিল দেশী খৃষ্টান, তিন পুরুষ আগে ওরা খৃষ্টান হয়, বংশের আগের পদবী ছিল সামন্ত। এই এণ্টালী তল্লাটে ওর অনেক বাগান ছিল—আমবাগান, আতাবাগান, পানবাগান, ফুলবাগান, লেবুবাগান। বিরাট ব্যবসা, অনেক টাকা। ডিক্সন এণ্টনীর নামেই ডিক্সন লেন, এণ্টনীবাগান ফার্স্ট লেন, সেকেণ্ড লেন, থার্ড লেন। ছেলে জন এণ্টনী বাপের একমাত্র সন্তান, ধাঁ করে বিয়ে করে বসল এক মুসলমান নবাবের বাইজীর মেয়েকে। মেয়েটা নাকি ছিল দেখতে খুব সুন্দরী, নবাবেরই মেয়ে ও। ডিক্সন এণ্টনী ছিল গোঁড়া খৃষ্টান, রেগে টং, ঠিক করল চার্চে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে আবার খৃষ্টান মতে বিয়ে দেবে ছেলের সঙ্গে। যেদিন এই খৃষ্টান বানিয়ে খৃষ্ট-মতে বিয়ের দিন এল সেদিন ও-পাড়ায় মুসলমান ও খৃষ্টানে দারুণ দাঙ্গা বেধে গেল। ডিক্সন এণ্টনী পয়সাওয়লা লোক, মানপ্রতিপত্তিও যথেষ্ট, গোঁয়ারও ছিল প্রচণ্ড। ওদিকে বেবাক দেশী খৃষ্টান ওর দলে, পাদ্রীসাহেবরাও ওর পক্ষে, পাদ্রী সাহেবদের পেছনে ইংরেজরা। মেট্রপলিটান বিশপ রেভারেণ্ড টার্নার-বুলও হটবার পাত্র নন, কেল্লা থেকে গোরাফৌজ আনালেন খৃষ্টধর্মের মান বাঁচাতে। মুসলমানরা লাঠিসোটা ফেলে বন্দুকের ভয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল।

"কিন্তু মেয়েটার গায়ে নবাবী রক্ত, নবাবী মেজাজ, একদিন বাপতুলে শাশুড়ীকে গালাগাল দিয়ে বসল। ডিক্সন এণ্টনী এমনিই রগচটা লোক, তার ওপর পুত্রবধূর এই কাণ্ড, তৎক্ষণাৎ ছেলেকে ডেকে বললেন—ঐ ছোটলোক বাইজীর মেয়ের এখানে স্থান হবে না, এটা ভদ্দরলোকের বাড়ি, তুমি খেয়ালের মাথায় যা করেছ তার ভোগ তোমাকেই ভুগতে হবে, আমাকে নয়। তুমি আজ থেকে আমার ত্যজ্য-পুত্তুর, এবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও দুজনে, আতাবাগানে সহিসদের যে কোয়ার্টার আছে, সেখানে থাকতে পার, ওদের আমি পানবাগানের কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। নিশ্চয় ওরা সেখানেই এখনো আছে, জন এণ্টনী বোধহয় রোজগারপাতি ভালো না করতে পেরে দুর্দশায়ই দিন কাটাচ্ছে। ওরা তোকে বড়দিনে চা খাওয়াল, তুই যাস না কেন একবার নিউ ইয়ার্স ডেতে, কিছু হাতে করে?"



৮

একরদার কথাটা মনে ছিল। মল্লিকবাজার থেকে মুটের মাথায় কপি, কলাই-শুঁটি, আলু, পেঁয়াজ, দাদখানিচাল, ঘি, তেল, মসলা, মাছ, মুর্গী, দই, সন্দেশ চাপিয়ে মুন্না এণ্টনীর বাড়ি হাজির হলাম ইংরিজি নববর্ষের দিন।

বারান্দায় আমার জুতোর শব্দ শুনে গাল পাড়তে-পাড়তে বাইরে এসে মুটের মাথায় জিনিস-বোঝাই দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুন্নাবেগম। ছলছল চোখে আমাকে বলল, "এ-সব কি করছেন?"

"আপনি নয়, তুমি, কাঞ্চন বলে ডাকবেন, ওটাই আমার নাম। এখন ভেতরের ঘরে রেখে আসতে পারি মুন্নাদি?"

"দিদির কুঁড়ে ঘরে ভাই তো না বলেই ঢুকতে পারে? উনি চান-ঘরে, গরম জলটা দিয়ে আসি, তুমি চলে যেয়ো না কিন্তু, এখানেই খেয়ে যাবে।"

"মাপ করুন মুন্নাদি, আজ নয়, কাজ আছে, আর একদিন হবে।"

শোবার ঘরে একটা লম্বা টেবিল আছে সেদিন দেখেছিলাম। জিনিসপত্তরগুলো সব সাজিয়ে রেখে ফলগুলোর তলায় তিনখানা দশটাকার নোট লুকিয়ে রেখে চটপট সরে পড়লাম।

জীবনের চব্বিশ বছর কাটিয়েছি নাগপুরে। জন্ম বাল্য কৈশোর পাড়ি দিয়ে যৌবনেরও খানিকটা ওখানেই কেটেছে। মাতৃহীন বালক পিতার স্নেহের শীতল ছায়ায়, বয় বাবুর্চি খানসামা ড্রাইভারদের বাবাসাহেব হয়ে, স্কুলকলেজে ফাদারদের কাছে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বড় ব্যারিস্টারের একমাত্র পুত্রের প্রাপ্য আদর আস্কারা পেয়ে শুধু একদিকটাই দেখেছি জীবনের। দেখেছি বাড়িতে বড়-বড় হোমরাচোমরার যাতায়াত, শুনেছি ছোটলাট বড়লাট থেকে চিত্তরঞ্জন সুভাষ বোসের আসাযাওয়ার গল্প। একদিকে দেশীবিলিতি শাসকগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে স্বরাজপার্টির বাবাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া। মায়ের কথা খুবই কম মনে আছে। কিন্তু যতটুকু তাঁর কাছ থেকে

পেয়েছি সে অজস্র স্নেহের যেন তুলনা নেই। তাঁর কাছে যেসব ভাগ্যবতীরা আসতেন তাঁরাও ধনে মানে চেহারায় বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, সমাজের উঁচুমহলে গৌরবের আসনে ছিলেন প্রতিষ্ঠিতা।

কলকাতায় চারবছরে অনেক কিছু চোখে পড়েছে যা নাগপুরে দেখিনি। এখানে এসে প্রথমে জানলাম জীবনটা শুধু হাসি-আনন্দ-বিলাসিতা নয়। দুঃখ দারিদ্র্য নিরাশা লাঞ্ছনার আর্তনাদ এখানে ওখানে গোপনে কাঁদছে আর মাথা খুঁড়ছে। আশ্রয়ের জন্যে বাড়িয়ে-দেওয়া হাত খুঁজছে একটা অবলম্বন, কিন্তু পাচ্ছে না। দুমুঠো ভাত কিম্বা একখণ্ড রুটির জন্যে ব্যক্তিত্ব নারীত্ব হচ্ছে বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত।

মাঝে-মাঝে তাই ভাবি বিলেত গিয়ে এমন আর কি শিখব, যা আমার জীবনে সত্যিকারের উপকার দেবে? হয়তো সম্মান বাড়বে, রোজগার বাড়বে, বিদ্যা বাড়বে। মনের দিক দিয়ে হয়তো অনেক কিছু হারাতেও হবে। তার চাইতে এই কলকাতায় যা দেখছি, যা শিখছি, সে-সঞ্চয়ই তো হবে আমার জীবনপথে সত্যিকারের পাথেয়! না-না-না, আমার কাছে সব চাইতে বড় ইউনিভার্সিটি হল কলকাতার জীবন, নফরচাঁদ বোস সে ইউনিভার্সিটির রেক্টর। ডোরিন গ্রে, মুন্নাবেগম, জন এণ্টনী, মল্লিকমশাই—এরা এক-একখানা বইয়ের মতো আমাকে জ্ঞানদান করছে। নফরদা বলেন—যদি প্রাণ খুলে হাসতে চাস তবে পরের জন্যে প্রাণভরে কাঁদতে শেখ, যদি জীবনটা কি জানতে চাস তবে চোখমেলে ঘুরে বেড়া, কিন্তু চৌরঙ্গীর আশেপাশের কুলীনপাড়ায় মানুষের দেখা পাবিনে, সেখানে যা দেখবি সেটা পুতুলনাচ। নফরদা বলেন—সমাজের শাসন, ধর্মের শাসনের নামে ভালো-মন্দর যে গণ্ডী কাটা আছে সে গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে গেলেই ঠকে যাবি, বিচারবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাবে; চোখও খুলবে না, মনও বাড়বে না, অন্ধ হয়ে থাকবি, বামন হয়ে থাকবি। মন যেখানে খাঁটি শ্বেতপাথরের তৈরি সেখানে নখের আঁচড়ে দাগ কাটতে পারে না।

মানুষের মন বিচিত্র রহস্য। তার একটি রহস্য হল সে কখনোই শূন্য থাকতে পারে না। একটা চিন্তা থেকে অন্য আর এক বিষয় চলে যায়, ব্রেক কষে থামানো যায় না। এণ্টনীরা আজ ভালো করে খাবে ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছিল। ঐ নিরানন্দ সংসারে দুটি হতভাগ্য স্বামীস্ত্রীর আনন্দে যোগ দিতে পারলে আমিও আনন্দ পেতাম হয়তো, কিন্তু প্রায়-অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে সেই আনন্দের ভাগীদার হয়ে উপস্থিত থাকা ভালো নয় ভেবেই তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম।

আসতে-আসতে দেখলাম কাঁচের বড় গাড়িতে ফুলে-ফুলে ঢাকা একটি শবযাত্রা। পিছনে অনেকগুলো গাড়িতে আস্তে-আস্তে মৃতের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবরা চলেছে। একেবারে শেষে কয়েকজন হেঁটেও চলেছে। রাস্তায় অনেকে টুপি খুলে মৃতের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে। শোকযাত্রার সকলেরই প্রায় কালোপোশাক। যারা কালো-পোশাক তাড়াতাড়িতে হাতড়ে পায়নি তারা নিদেন পক্ষে কালো টাই পরেছে।

আমাদের শবযাত্রায় দেখা যায় খালি পায়ে খালি গায়ের দল। কাঁধে গামছা, না হলে খাটিয়ার বাঁশের ডাণ্ডায় ওখানকার ছাল উঠে যায়। হালে সভ্যতার হাওয়া লেগেছে, তাই শহুরেরা খালি গায়ে পথে বেরুতে লজ্জা পায়, গেঞ্জী বা সার্ট চড়িয়ে তোয়ালে কাঁধে ভদ্র বেশে চলে। 'বলহরি' কিম্বা 'রামনাম সত্য হ্যায়' শবযাত্রার স্লোগানে দুপুররাতে বাচ্চা-কাচ্চারা ডুকরে কেঁদে বাবার বিছানায় আশ্রয় নেয়। পথেঘাটের লোক কোনোই সম্মান দেখায় না পরোলোকযাত্রীর প্রতি। বরঞ্চ ভাবে—ব্যাটা মরে গিয়ে রেহাই পেল রেশন-পেষণের হাত থেকে।

আজব শহর এই কলকাতা। শতকরা পঞ্চাশটি লোক অবাঙালী। গড়পড়তা দিনে পাঁচটি প্রসেসন বার হয়। শহরতলীগুলো বাদ দিলে খোদ-শহরটার চল্লিশ বর্গ কিলোমিটারের এক অষ্টমাংশই বস্তি, তাতে প্রায় আটলক্ষ লোক বাস করে। কলকাতার ৬৭% লোকের পরিবার-পিছু মাত্র একখানা ঘর; ১৭% লোকের শোবার ঘর নেই; ৮৭% লোকের নিজস্ব জলের কল নেই—দশ থেকে একশোটি লোকের মাত্র একটি জলের কলে সব কাজ চালাতে হয়; ১২% লোকের আলাদা পাইখানা নেই; ৭৪% লোকের আলাদা রান্নাঘর নেই। থাকবেই বা কেন?

লণ্ডনে এক একর জমিতে ৪৩ জনের বাস, নিউইয়র্কে ৩৩ জনের, আর শহর কলকাতায় একর-প্রতি ১৪০। জায়গা কম, ভাড়া গলা-কাটা। বারোজাতের বারোঘাটের বারোভূত আসছে তো আসছেই। সর্দারজী পণ্ডিতজী পাঁড়েজী লালাজী শেঠজী শেখজী সিংজী পাঁইজী বাবুজী মাদ্রাজী কাজী হাজী বাবাজী কালাসাহেব ধলাসাহেব মিঞাসাহেব টেঁসুসাহেব বিবিসাহেব মেমসাহেবদের এই জগাখিচুড়ির গন্ধে এসে জুটেছে সারা ভারতের অনেক চোর গুণ্ডা ছিনতাই কেপ-মার পকেটমার বাটপাড় ঠগ জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ কালোবাজারী ভেজালবাজ জুয়াড়ী ভিখিরি জালিয়াতের দল। ব্যবসা বাণিজ্যের রসালো-শাঁসালো জায়গায় বাঙালী কোণ-ঠেসা, এমন কি নিচের স্তরে মুটে মজুর মিস্ত্রী ঠাকুর চাকর বয় বাবুর্চি

আয়া দরোয়ান ড্রাইভার ঝাড়ুদার ফিরিওয়ালা বিক্রিওয়ালা ফলওয়ালা ট্যাক্সি-ওয়ালাদের মধ্যেও বঙ্গসন্তানরা গুরুতরভাবে সংখ্যা-লঘু। বাঙালী নিজের ভালোও বোঝে না।

কলকাতায় কলের জলের অভাব, কলের জলে ছোট মাছ ছোট সাপও মাঝে-মাঝে দেখা যায় শুনেছি। গঙ্গাজলের পাইপ-সিস্টার্ণ বেশির ভাগ সময়েই শুকনো ঠনঠন করে। অথচ দু-ইঞ্চি বর্ষার জলে অনেক রাস্তা জলে-জলময়, কারণ মাটির নিচের ঝাঝঝ়ড়ে নর্দমাগুলো ধর্মঘট করে বসে। নফরদা বলেন অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মের মতোই কলকাতার বহুবিধ সমস্যাই কলকাতাবাসীর পক্ষে অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয়। কর্পোরেশন সভায় চুলোচুলি গালাগালি এবং সরকারি কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে চিঠি চালাচালিতে অবস্থা ও ব্যবস্থা ভালোর দিকে যাচ্ছে না মন্দের দিকে তা বুঝে ওঠবার উপায় নেই।

এ-সব সত্ত্বেও কিন্তু কলকাতার প্রাণ আছে, যে প্রাণের স্পন্দন নাকি দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজ লক্ষ্ণৌ পাটনায় পাওয়া যায় না। কলকাতার রূপও বিচিত্রতাপূর্ণ, সে বিচিত্রতা অন্য কোথাও দেখা যায় না। বাঙালী বেহারী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী উড়িয়া আসামী মারাঠী গুজরাটি নেপালী রাজস্থানী প্রভৃতি বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার জীবনধারায় পরিপুষ্ট এই শহর অনৈক্যের ভিতর ঐক্যসূত্র রচনা করে ভারতমাতার কণ্ঠে বর্ণাঢ্য গৌরবে দীপ্যমান। নফরদা একটি ইংরেজ ভদ্র-লোকের কথা বলছিলেন সেদিন। গতযুদ্ধে ফৌজের ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন এ-দেশে, পরেও এসেছিলেন তিনবার। কলকাতা তাঁর এতই ভালো লেগেছে যে আবার আসতে চান। তিনি নাকি মনে করেন যে কলকাতা যতই এলোমেলোভাবে গড়ে থাকুক না কেন, পথঘাট যতই অপরিষ্কার হোক না কেন, এর একটা নিজস্ব রূপ আছে, যা তিনি লণ্ডন বার্মিংহাম, দিল্লি বোম্বাই রেঙ্গুন সিঙাপুর ম্যানিলা টোকিয়োয় দেখেননি। তাঁর মতে বাঙালীর মতো প্রাণবন্ত জাত ভারতে আর কোথাও নেই। যতই সে স্বপ্নবিলাসী হোক না কেন, যতই না সে আর্থিক মান-এ অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় পেছনে পড়ে থাকুক না কেন।

বাড়ি ফিরে জামা ছেড়ে বাথরুমে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, দরজায় টোকা শুনে গেঞ্জীটা চট করে গায়ে দিয়ে অভ্যাসমতো বললাম, "আসুন।"

দেখি ডোরিন গ্রে। আমার হাতে একটা প্যাকেট গুঁজে দিয়ে জানাল, "হ্যাপি নিউ ইয়ার টু ইউ।"

"সেম টু ইউ, অ্যাণ্ড মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস্। কি আছে এর ভেতরে মিস গ্রে? আর এক প্যাকেট চা?

"হ্যাঁ।"

"ধন্যবাদ, বস একটু।"

"না, বসব না। ম্যান্টেলপিস-এ ছবিগুলো তো ভারি সুন্দর বাঁধানো! এ কি তোমার মায়ের ছবি?"

"হ্যাঁ।"

"খুব সুন্দরী ছিলেন মনে হয়, বেঁচে নেই?"

"না।"

"তুমি তোমার মায়ের মতো দেখতে। এটি কার?"

"বাবার। তিনিও বেঁচে নেই।"

"চোখে মুখে খুব আভিজাত্যের শ্রী। তবে এরকম পোশাক কেন?"

"ব্রিটিশ আমলে উনি নাইটহুড পেয়েছিলেন, সেই পোশাকে এ ফটো তোলা হয়েছিল।"

"তুমি নাইট-এর ছেলে?" শেষের কথাগুলো বলতে ডোরিন গ্রে-র যেন গলা ধরে এল, "মাপ কর মিস্টার সানিয়াল, তুমি এত বড় ঘরের ছেলে বুঝতে পারিনি, তোমার সঙ্গে আলাপ করা আমার সাজে না।"

"কেন সাজবে না মিস গ্রে? আমি নিজে তো অপদার্থ হয়ে বেকার বসে আছি। জন্মগত ছোট বড় বিভেদ আমি মানি না। ও কি! চলে যাচ্ছ যে এরই মধ্যে?"

"হ্যাঁ যাচ্ছি, রান্না চড়াতে হবে, আমার চাকর নেই, রাখবার ক্ষমতাও নেই।"

"এক মিনিট দাঁড়াও দয়া করে।"

ভিতরের ঘর থেকে এক টিন চকোলেট নিয়ে এসে ওর হাতে দিয়ে বললাম, "না-না, তোমার কোনো কথা শুনব না, এটা তোমায় নিতেই হবে। মেয়েরা চকোলেট খেতে ভালোবাসে শুনেছি। অবিশ্যি আমার জন্যেই কিনেছিলাম, কিন্তু তুমিই খেয়ো, আমার নববর্ষের উপহার।"

"অনেক ধন্যবাদ" বলে ও চকোলেটের টিনটি নিয়ে বেরিয়ে গেল, চোখ তুলে আমার দিকে যেন তাকাতে পারল না।

নফরদা ঠিকই ধরেছেন আমি ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করতে শিখিনি, ঝোঁকের মাথায় কাজ করে বসি। নইলে চোদ্দ টাকা দামের চকোলেটের টিনটা একটা প্রায়-অচেনা কিস্তালি মেয়েকে দিতে গেলাম কেন? দামী চকোলেট, চকোলেট খেতে তো আমিও খুব ভালোবাসি? দুত্তোর, কোথার কে ও! চোদ্দটা টাকা একেবারে জলে গেল! নেভার, নেভার এগেন!

'নেভার, নেভার এগেন' বলেছিলেন একদিন বাবা। চন্দননগরে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর সাতপুরুষের ভিটে ওখানে, কিন্তু দারুণ ম্যালেরিয়ায় ভুগে ওখানেই ওঁর বাবা মারা যান। মামা নিয়ে গেলেন তাঁর চাকরিস্থল জব্বলপুরে। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশটাকা জলপানি পাবার খবর পৌঁছবার কয়েকটা দিন আগেই চিঠি পেলেন তাঁর মাও মারা গেছেন কলেরায়। তাই তিনি চন্দননগরকে 'নেভার নেভার এগেন' বলে বিদায় নিয়েছিলেন।

কলকাতা আসবার পরে সেই চন্দননগর একবার দেখব মনে ইচ্ছে ছিল। নফরদা বললেন, "দেখতে চাস ভালো কথা, নিয়ে যাব একদিন তোকে। আসছে মঙ্গলবার চন্দননগরের শাসনভার ভারতের দিশী সরকার হাতে নিচ্ছেন, বেশ ধুমধাম হবে, আমারও যেতে হবে রিপোর্টার হয়ে, অনেক ফটোগ্রাফও তুলতে হবে; সুতরাং হে বৎস কাঞ্চন, তোর সাতপুরুষের জন্মভূমি চন্দননগর যদি দেখতে চাস তবে আসছে মঙ্গলবার প্রভাত সাতটায় এণ্টালী মার্কেটের কাছে হাজির থাকিস আমাদের প্রাণ-প্রিয় পানের দোকানটার সামনে। জানিস তো আমার স্বভাব? সাতটা মানে ঠিক সাত ঘটিকা, সাতটা পাঁচ নয়। আমার ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান না থাকতে পারে কিন্তু সময়জ্ঞানটি খুব টনটনে। ঐ যাঃ, বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম, গঙ্গায় সাঁতার কেটে চান করব, আর এক দফা কাপড় গেঞ্জী নিয়ে যাস জীপ গাড়িতে যাচ্ছি, সামনের কাঁচের জানলায় লেখা থাকবে 'প্রেস', বেশ হাওয়া লাগবে, একটা গরম জামা নিতে ভুলিস না যেন।"

মঙ্গলবার এল। পথে যেতে-যেতে নফরদা মুখ খুললেন। একবার

খুললে নফরদার মুখ মেল ট্রেনের মতো চলে, অনেক দূর-দূর স্টেশনে থামে শুধু।

"চন্দননগরের কোন পাড়ায় তোর রিভিয়ার্ড পূর্বপুরুষরা থাকতেন জানিস ?"

"বাবার কাছে শুনেছি খলিসানী।"

"খলিসানী ? খুব পুরনো জায়গা, প্রায় বারোশো বছর আগের লেখা 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামের এক বইয়ে খলিসানীর নাম আছে, 'মহাগ্রাম' এই বিশেষণও দেওয়া হয়েছে তাতে, ওখানে রাজত্ব করত এক ধীবররাজা।"

"ধীবর কি ?"

"জেলে, মাছধরা যাদের ব্যবসা। কিন্তু সে অনেকদিন আগেকার কথা। ষোলো শতকের শেষের ভাগে ড্যুপ্লে নামে এক ফরাসী ভদ্রলোক মোটে ৪০১৲ টাকায় ষাট বিঘা জমি কিনে ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। তখনো ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম হয়নি। চন্দননগরে, তথা বাঙলাদেশে, যে জায়গাটা প্রথম অধিকার করলে ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেটার নাম 'ভাউৎখানা।' রাস্তা থেকে দেখাব তোকে, ওটা এখন চৌধুরীদের বাগান, তিন দিকে খাল কেটে ফরাসীরা কুঠীবাড়ি তৈরি করেছিল। প্রথম দিকটায় কোম্পানীর মোটা আয় ছিল দাস-ব্যবসা থেকে, জাহাজ ভর্তি-ভর্তি দাসদাসী বিদেশে চালান যেত। লর্ড ক্লাইভই প্রথমে চন্দননগরকে ফ্রান্সডঙ্গী নাম দেন, ফ্রান্সডঙ্গী থেকে হল ফরাসডাঙ্গা। ফরাসডাঙ্গার মসলিন ও সুতির কাপড় বহু দেশে চালান যেত। কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের নাম শুনেছিস ? 'অন্নদামঙ্গলের' লেখক ? তিনি ফ্রেঞ্চ কোম্পানীর এজেন্ট ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর খেয়ে-পরে মানুষ। ইন্দ্রনারায়ণ বিস্তর টাকা কর্জ করেছিলেন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার চন্দননগরে ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতে বেড়াতে এসে ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তি দেখে এতই মুগ্ধ হন যে ইন্দ্রনারায়ণের বিলকুল দেনা মাপ করে তার বদলে ভারতচন্দ্রকে নিয়ে নদীয়ায় ফিরে গেলেন। 'রায় গুণাকর' উপাধিটি কৃষ্ণচন্দ্রেরই দেওয়া। 'রতনে রতন চেনে, জানি না কেমনে।'

"সহিদ কানাইলাল দত্তও চন্দননগরের লোক। রোগা পটকা এই বিপ্লবী ছেলেটি বাঙলার অগ্নিযুগের সর্বপ্রথম বলি ইংরেজ শাসনের যূপকাঠে। ফাঁসির হুকুমের তিন সপ্তাহ পরে ফাঁসি হয়, এই একুশ দিনে তার একুশ পাউণ্ড ওজন বেড়েছিল। ফাঁসির

দড়ি সে নিজের হাতে গলায় পরে হাসতে-হাসতে জীবন দিল, ইউরোপিয়ান পুলিস কর্মচারীরা অবাক, নির্বাক।

"বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদারও চন্দননগরের লোক। হিমালয়ের গৌরী-শঙ্কর চূড়াটি কত ফুট উঁচু তা অঙ্ক কষে বার করলেন শিকদার মশাই, কিন্তু নাম হল এভারেষ্ট সাহেবের কারণ তিনি বড়কর্তা। 'মাউণ্ট এভারেষ্ট' না হয়ে ওটার নাম হওয়া উচিত ছিল 'মাউণ্ট শিকদার'। পরাধীন জাতকে অনেক কিছু মুখ বুজে সয়ে যেতে হয়।

"বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বাড়িও চন্দননগরে। জাপানে একবার গিয়েছিলাম, দেখেছি কি সম্মান তাঁর সেখানে। দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েও রাসবিহারী বসু দেশকে বাঁচিয়েছেন, ওঁর চেষ্টাতেই কলকাতা মাদ্রাজ দিল্লি বোম্বাই জাপানী বোমার গুঁতোয় ছাতু-ছাতু হয়ে যায়নি গতযুদ্ধে। ইংরেজরা তখন নিজেদের দেশ সামলাতেই বেসামাল, গোটা ভারতে মাত্তর দুটো অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্ গ্যন্ ছিল ও-ব্যাটাদের রাসবিহারী বসুর নামে একটা রাস্তাও আছে চন্দননগরে, রাসবিহারী এভেনিউ, দেখাব তোকে। আর দেখাব তোকে লালবাগান। লালবাগানের জঙ্গলে এসে লুকিয়ে থাকত বাঙলা মায়ের বীর বিপ্লবী সন্তানরা। ইংরেজের পুলিস শাদা কাপড়ে পিছু নিলে ফরাসী পুলিস ওঁৎ পেতে থাকত, পুলিস পুলিসের গন্ধ শুঁকে টের পায়, চন্দন-নগরে ফরাসী পুলিসরা বাঙালী হলেও ইংরেজের বাঙালী পুলিস বাছাধনদের রাম-প্যাদানী দিয়ে ভাগিয়ে দিত, আর হাঁড়ি-হাঁড়ি রসোগোল্লা সন্দেশ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসত ক্ষিদেয় ভাজা-ভাজা বাঙলার বীর সন্তানদের।"

"শ্রীঅরবিন্দও তো এখানে এসে কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন শুনেছি?"

"আমার সময় হবে না সব দেখাতে। তোকে নামিয়ে দেব গঞ্জের বাজারের কাছে একখানা রিক্সা নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সব দেখে নিস। শ্রীঅরবিন্দ লুকিয়েছিলেন মতিলাল রায়ের প্রবর্তক আশ্রমের একটা ছোট ঘরে। আর দেখে আসিস মোরান সাহেবের কুঠী, ওখানেই কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের হয়েছিল উদ্বোধন, তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে লিখে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষাও শুরু হয়েছিল চন্দননগরের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ নবীনচন্দ্র দাসের কাছে।"

"আপনার সঙ্গে কোথায় আবার দেখা হবে?"

"সব দেখাশোনা হয়ে গেলে সোজা চলে যাবি হরিহর শেঠমশাইর বাড়ি। শেঠ-

মশাই স্বনামধন্য পুরুষ, অমায়িক, মধুর স্বভাব, আশীবছর পার হয়ে গেছেন। ফরাসী সরকার তাদের শ্রেষ্ঠ তিনটি উপাধি ওঁকে দিয়েছিল। ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ আমি জানিনে, তবে মোটামুটি তর্জমা হল 'সেভালিয়র অফ দি লিজিয়ন অফ অনার,' 'অফিসিয়াল অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন,' 'অফিসিয়াল অফ দি এ্যাকাডেমি।' সাহিত্যরথী হিসেবে বাঙলাদেশের কয়েকটি সাহিত্য পর্ষদ তাঁকে তিনটে সম্মানে ভূষিত করেছে—'বিদ্যা-বিনোদ,' 'কৃতীনিধি,' 'সাহিত্যভূষণ।' কৃতজ্ঞ চন্দননগরবাসীরা তাঁকে ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছে—'দেশশ্রী' উপাধি দিয়ে। ওখানকার লাইব্রেরী স্কুল সেবাশ্রমে ওঁর যথেষ্ট দান রয়েছে, সর্বোপরি উনি আমার জেঠামশাই।"

"জেঠামশাই?"

"হ্যাঁরে কাঞ্চন, অনরারি জেঠামশাই, রক্তের সম্বন্ধ নয় প্রাণের টানের সম্বন্ধ। চন্দননগরে গেলে ওঁর বাড়িতে একবার যাবই আমি, কোনোবারই বাদ পড়েনি। গেলে উনি না খাইয়ে ছাড়েন না কিছুতেই। এই স্নেহময় অতিথিবৎসল মহাপ্রাণ ব্যক্তির বাড়ি গরমকালে কেউ গেলে ওঁর নিজের বাগানের 'চাটুয্যে' ও 'খাসচাটুয্যে' আম না খেয়ে ফিরতে পারে না। চন্দননগরের স্পেশ্যাল এই দুটো জাতের আমের নাম আছে। ওঁকে আগেই চিঠি পাঠিয়েছি তুই আমি আর ড্রাইভার ওখানেই মধ্যাহ্নভোজন করব। তার আগে গঙ্গায় সাঁতার কেটে চান। পার্ফেক্ট প্রোগ্রাম, কি বলিস? ফরাসী সরকার যখন ভারতভুক্তির চুক্তিতে একবছরের জন্যে স্থানীয় লোক-দের হাতে চন্দননগর তুলে দিয়ে যায় তখন শেঠ-জেঠামশাইকেই তারা সে ভার দিয়ে যায়, অর্থাৎ এক বছর উনিই ছিলেন প্রেসিডেণ্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেসন কাউনসিল, ওরেফ গভর্নর। সেই গভর্নরস্ হাউসে লাঞ্চ খাবি আজ। আমি তো এমন খাওয়া খাব যে খেয়েই শুয়ে পড়তে হবে। তবে এ-লাঞ্চে সুইট ভার্মুথ, কনিয়াক ব্র্যাণ্ডি, কুমেল, ক্রেম-দ্য-মন্থ, বেনেডিক্টিন, ইত্যাদি ফ্রেঞ্চ সুরাসার আশা করিসনে। শেঠ-জেঠামশাই পরমবৈষ্ণব, সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী।"



৯

"হ্যালো ইয়ং ম্যান!" খোলা জানলার সামনে এক বুড়ো এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। মুখের মধ্যে আছে শুধু একটি ধারালো নাক, বাকিটুকু চুপষিয়ে 'কাষ্ঠবৎ'। চোখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি উপচিয়ে পড়ছে, মাথায় ফেল্টহ্যাট, ধবধবে সার্টের কলার ঢলঢল করছে, কারণ গলাটি শুকিয়ে গেছে, ফুলকাটা টাই, হাতে রুপোবাঁধানো বেতের ছড়ি। যেন কবরখানা থেকে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে।

"এই তিনমাস এ-বাড়িতে এসেছ, তবুও আলাপ হয়নি, হোয়াট্ এ সেম্! আমি এ-বাড়িতে আছি বিশ বছর।"

"আসুন, পাশের দরজা খুলে দিচ্ছি স্যর।"

বুড়ো ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল। বলল, "স্যর-ফার নয়, ম্যাক বলে ডেকো।"

"পুরো নামটি জানতে পারি কি?"

"রুডল্‌ফ ম্যাক্সিম।"

"আমি কাঞ্চনবরণ সানিয়াল।"

"এখানে একাই থাক? ফ্যামিলি?"

"এখনো বিয়ে করিনি।"

"আমিও তোমাদের ভীষ্মের মতো ব্যাচিলর। তবে তোমার সময় এখনো আসেনি, আমার সময় চলে গেছে অনেক—অনেক বছর আগে। তুমি কি পার্শী?"

"বাঙালী।"

"কিন্তু বাঙালী তো এত ফরসা হয় না?"

"তবে কি বলতে চাও ভুল ঠিকানায় এসে জন্মেছি?"

"ভগবানের ভুল হয় না, আমারই বুঝবার ভুল। কি কর, চাকরি?"

"এখন পর্যন্ত কিছুমাত্র না, শুধু খাই-দাই আর টো-টো করে বেড়াই।"

হো-হো-হো হাসির গরগরায় ছাদ ফাটিয়ে বুড়ো হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হাতেতে হাত মিলাও বন্ধু। আমরা দুজনেই বন্ধনহীন মুক্তপুরুষ, দুজনেরই নেশা ও পেশা টো-টো করে বেড়ানো, মিলেছে ভালো। আজ থেকে তুমি এই ভ্যাগাবণ্ড কোম্পানীর জুনিয়ার পার্টনার, আমি সিনিয়র পার্টনার, অফিসের ঠিকানা দোতলার চার নম্বর ফ্ল্যাট, ক্যাপিটাল জিরো জিরো জিরো, লাইবিলিটিস লিমিটেড টু জিরো। যেখানে মূলধন নেই সেখানে লাভ লোক্সানও নেই। কেমন রাজী?"

"রাজী, কিন্তু শুভদিন দেখে এই অংশীদারী ফার্মটির উদ্বোধন করতে হবে যাতে কোম্পানীটি শীঘ্র পটল না তোলে। আচ্ছা তোমার বয়স কত ম্যাক? সত্তর হয়েছে?"

"দেখ কাঞ্চন, মহৎকে ক্ষুদ্র কর না। ভগবানকে গীর্জা বা মন্দিরের চার দেওয়ালের মধ্যে ধরে রাখতে চেও না। বয়সের ঘড়িতে যার কাঁটা চুরোনব্বুই পেরিয়ে গেছে তাকে সত্তরে ঠেলে নামাতে চেয়ো না।"

"বয়েস আন্দাজে বেশ চালু আছ তো? চুরোনব্বুই?"

"অবাক হবার কিছু নেই, মাই বয়। জার্মান রক্তের মতো সারী রক্ত দুনিয়ার কোথাও নেই। ও খাঁটি এরিয়ান ব্লাড, কিছু পাতলা হয়ে গেলেও ধক্ যায় না। দামী মদ যত পুরনো হয় ততই ঝাঁঝ বাড়ে। 'ভিন্টেজ' কথাটার মানে জানো তো?"

হরি হরি হরি! এও জার্মান কিস্তালি? নফরদা বলেছিলেন বটে জার্মান এমডেন কোম্পানীও ব্যবসার লোভে বাঙালাদেশে এসেছিল কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে কিছুদিন পরে দেশের দিকে লম্বা দিল। ওরাও যে ফিরিঙ্গীদের দল ভারি করে রেখে গিয়েছিল তার হাতে-হাতে প্রমাণ পেলাম এই রুডল্ফ ম্যাক্সিমের পরিচয়ে। তবু ওকে একটু যাচাই করে নেবার ইচ্ছা হল।

"ভুলে যাচ্ছ ম্যাক, জার্মানরা কোনোদিনই বাঙলায় আসেনি।"

ও একটু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, "আমার জুনিয়ার পার্টনার কদ্দূর পড়াশোনা করেছে?"

"এম. এ.।"

"বাঙলায় না হিন্দীতে?"

"ইংরেজীতে।"

"এখানে না ইংলণ্ডে?"

"নাগপুর ইউনিভার্সিটিতে।"

"কিন্তু তোমার ইংরেজী উচ্চারণ তো চমৎকার! তবে ইতিহাসে তুমি বেশ খাটো তা বুঝতে পেরেছি। জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটের রাজত্বে ১৭৫৩ সনে বেঙ্গলীসে হ্যাণ্ডেল গেজেলসাফ্ট নামে একটা জার্মান কোম্পানী বাঙলায় আসে এমডেন শহর থেকে, ওটার সহজ নাম ছিল এমডেন কোম্পানী। পার্ক স্ট্রীটে যে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরী আছে সেখানে গিয়ে বই ঘেঁটে দেখ।"

এবার আমার প্রশ্ন করবার পালা। জিগগেস করলাম, "ম্যাক, চিরদিনই বোধহয় ভবঘুরে ক্লাবের সদস্য ছিলে না? কি কাজ করতে? নিজে কত দূর লেখা-পড়া শিখেছিলে? এখন সময়ই বা কাটে কিসে?"

বুড়ো হুস্ করে শিষ দিয়ে উঠল। বলল, "এই তো চাই মাই বয়, সিনিয়র পার্টনারকে বাজিয়ে নিতে হয়, কোথাও কোনো খাদ আছে কিনা। তোমারা যাকে লেখাপড়া-জানা বল সেদিক দিয়ে আমি অষ্টরম্ভা। ব্যবসা করে দু-পয়সা গুছিয়ে নিয়েছিলাম, তারই সুদে বেশ কেটে যাচ্ছে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি ততক্ষণ হয় বেহালা বাজাই, নইলে একা-একা দাবা খেলি। না-না, হেস না কাঞ্চন, দুজন না হলেও দাবা খেলা যায়, আমি মাথা খেলিয়ে বার করেছি। কিন্তু সব সময় কুনো হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা যায় না। সকাল বিকেল খুব হাঁটি, আর প্রায় রবিবারই কলকাতার বাইরে চলে যাই, গ্রামে গিয়ে প্রজাপতি শিকার। ওটা আমার একটা বাই। ঝোপঝাড় জঙ্গলে প্রজাপতির পেছনে ছোটাপুটি হুটোপুটিতে শরীর ভালো থাকে, মনে আনন্দ পাই। সব সময়েই আমি আনন্দে থাকতে ভালোবাসি। মনটা শুকিয়ে গেলে বেঁচে লাভ কি বল? দেহ শুকিয়ে গেলেও তো মনটা তাজা রাখা যায়?"

"তোমাকে দেখাশোনা করে কে?"

"কেন? রুডল্‌ফ ম্যাক্সিমকে রুডল্‌ফ ম্যাক্সিমই দেখাশোনা করে। একটা বুড়ি মুসলমান আয়া আছে, সে ঘরদোর সাফ করে, দুপুরের রান্না করে। রাতের ডিনার স্রেফ একগ্লাস হর্লিক্স, একদলা গুড় মিশিয়ে।"

না হেসে পারলাম না।

"হাসছ যে? গুড়ে ভিটামিন আছে, আয়রন আছে, ক্যালসিয়াম আছে। গুড় থেকে যখন চিনি হয় দেখতেই শাদা ধবধবে দানা-দানা, ভিটামিন আয়রন

ক্যালসিয়ামের পোষ্টাই পদার্থগুলো খতম হয়ে যায়। বাঙালী গমের রুটি খেতে অভ্যেস করেনি, গুড় খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে তাই কমজোর হয়ে পড়েছে। তোমরা ভাতের মাড় ফেলে দাও, তরকারির খোসা ফেলে দাও, তেল-ঘি বেশি খাও, মসলা দিয়ে রান্না কর, তোমাদের শরীর তো ফাঁপা!"

"গুড় কখনো খাইনি তো? জিনিসটা কি?"

"আখের রস কিম্বা খেজুরের রস দিয়ে তৈরি, বলতে পার দিশি মণ্ট, খুব বলকারি এনার্জিফুড।"

"ম্যাক, তুমি কি ফ্রাস্ট্রেটেড ব্যাচিলর, না ভলাণ্টারী ব্যাচিলর? শপথ করে বল তো সত্যি কথা? ঘা খেয়ে মামুলি পথটা ছেড়ে বাউণ্ডুলে হলে, না নিজের খেয়ালেই অন্য পথটি বেছে নিলে?"

বুড়ো চটল না, গলার স্বর টলল না, প্রথম চালেই হার মানল না। দুষ্টু হাসির সঙ্গে জবাব দিল, "না, না, নিজেকে খুব চালাক ভেব না যে এক-আঁচড়েই বুড়ো রুডল্ফ ম্যাক্সিমের হাঁড়ির খবর টেনে বার করবে। কাঞ্চন তুমি শিশু, তোমার মুখে এখনো দুধের গন্ধ যায়নি। তোমার মাথাটা এগিয়ে দাও তো ভালো করে দেখি?"

আমার মাথাটা দু-হাতে টিপে-টিপে দেখে ও জিগগেস করল, "বয়েস ত্রিশের নিচে, পঁচিশের একটু ওপরে, কেমন?"

"কি করে বুঝলে?"

"কুকুর বেড়াল ঘোড়া গরু বাঘ সিংহ প্রভৃতি বেশির ভাগ ইতর প্রাণীই ছমাস থেকে এক বছরের মধ্যে শারীরিক পূর্ণতায় পৌছয়। মানুষের লাগে ষোলো থেকে আঠারো বছর, সর্বাঙ্গ পুষ্ট হতে লাগে পঁচিশ বছর, কিন্তু ত্রিশ বছরের আগে তার মাথার খুলির সেলাইগুলি শক্ত হয়ে হাড্ডিতে পরিণত হয় না। এবার হাঁ করে দাঁত দেখাও তো?"

হাঁ করলাম।

"ঠিক ধরেছি, তোমার একটা আক্কেল দাঁত এখনো গজায়নি, সুতরাং বয়েস তোমার সাতাশ কি আঠাশ। আজ উঠি, মাঝে-মাঝে আমার ঘরে যেয়ো, দোতলায় চার নম্বর ফ্ল্যাট। বলেছি তো ওটাই হবে আমাদের যৌথ কারবারের বেসরকারী অফিস।"

ও আমার পেটে আচমকা একটা খোঁচা দিয়ে খিল-খিল করে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই আনন্দময় পুরুষ। চুরানব্বই বছরের জরা ওর দেহকে শুষ্ক করেছে বটে, কিন্তু মনটাকে শুষ্ক করতে পারেনি। চুষে খাওয়া আমের শুকনো আঁটিটার ভিতরেও আর একটা শাঁস থাকে, অনাদরে ভাগাড়ে পড়ে থাকলেও সে শাঁস থেকে অঙ্কুর গজায়। ম্যাকও তেমনি যেন প্রাণবন্ত।

দিন দুই পরে গেলাম ম্যাকের ফ্ল্যাটে রিটার্ণ ভিজিটের পাওনাটা চুকিয়ে ফেলতে। ড্রইংরুমটা বেশ বড়। দেখে আশ্চর্য হলাম। শ্যাম মল্লিক বলেছিলেন সব কটা ফ্ল্যাটই এক মাপের, তবে এ-ঘরটি এত বড় হল কেমন করে? কলকাতার চতুর বাড়িওয়ালার আর এক দফা ধাপ্পা।

আমাকে বুড়ো প্রায় জড়িয়ে ধরল। মুখে সেই হাসি। সূর্যের আলোয় পাহাড়ের মাথা চিকচিক করে, কিন্তু ফাটল-ফোকর গুহাগুলোয় সে আলো পৌঁছয় না। সেরকম তোবড়ানো মুখে হাসির চকমকি দেখা যায় নাকের ডগায়, চোয়ালের উঁচু হাড়ে। গালের খোড়লে, থুতনীর গর্তে সে হাসির প্রকাশ হয় না।

বললাম, "ম্যাক, আমাদের বাঙলা ভাষায় দন্ত শব্দের মানে দাঁত, যার দন্ত নেই তাকে বলা চলে বে-দন্ত, বৈদান্তিক শব্দটার মানে দার্শনিক। তুমি বে-দন্তও বটে, স্বভাবগত দার্শনিকও বটে, সুতরাং এই ডবল যোগাযোগে কখনো-সখনো তোমাকে দার্শনিক বলেও ডাকব। রাজী? আমাদের বেদান্ত দর্শনের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ?"

"রাজী, তবে আমাকে ফিলিস্টাইনও বলতে পার, কারণ আমি অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। বাইবেলে ফিলিস্টাইনদের কথা নিশ্চয়ই পড়েছ?"

হঠাৎ একটা শিস দিয়ে উঠে গিয়ে ঘরের ওধারে একটা কাঠের ক্যাবিনেটের ডালাটা অর্ধেক নামিয়ে দিল। ভেতরে সারি-সারি বোতল, রকমারি রঙের তরল পদার্থে ভর্তি বা আধাভর্তি, পরের তাকে নানা মাপের গেলাস, বুঝলাম ওটা ককটেল-ক্যাবিনেট।

তাকিয়ে দেখলাম ঘরটি একটি জাদুঘরের সামিল। দেয়ালময় বাঘের মাথা, শম্বরের মাথা, হরিণের মাথা, বন্যবরাহের মাথা, ওস্তাদ কারিগরের হাতের কৌশলে যেন সজীব হয়ে আছে। মাঝখানের টেবিলটা কাঁচের, কিন্তু পায়া চারটে হাতির পায়ের, নখগুলো পর্যন্ত যেন টাটকা। ছাইদানীটা একটা ময়ালসাপের মুখ দিয়ে

তৈরি। তক্তাপোশের ওপর প্রকাণ্ড বাঘের ছাল পাতা, ছাত থেকে ঝুলছে হাতির দাঁতের চৌখুপির মধ্যে বসানো আলো, ঘরের দু-কোণে দুটো প্রকাণ্ড ফুলদানীর পায়া কটা প্রকাণ্ড মোষের শিঙের। বাকি দু-কোণে আস্ত দুটো চিতেবাঘ, মনে হয় এখুনি লাফিয়ে ঘাড়ে পড়বে। সবকটা আসবাবপত্র ঝকঝক করছে, যেন গতকাল পালিশ দেওয়া হয়েছে, বাজে আসবাবপত্র একটিও নেই।

"নাও কাঞ্চন। তোমাদের হয় একটার পর একটা অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাসন, পৈতে, বিয়ে, শ্রাদ্ধ—কেবল অনুষ্ঠান আর অনুষ্ঠান। আমাদের অনুষ্ঠান নেই, আছে উৎসব। ছোট বড় একটা কিছু খুশির দিন হলেই আমরা উৎসব করি, ফুর্তি করি। এবং একটু সুরা না হলে উৎসব জমে না। ধর আজকের এই সন্ধ্যা। প্রথম নম্বর তুমি আমার ফ্ল্যাটে প্রথম এসেছ, দ্বিতীয় নম্বর তুমি আমার নতুন নামকরণ করলে, তৃতীয় নম্বর আমাদের ভ্যাগাবণ্ড কোম্পানীর আজ শুভ উদ্বোধন, কাজেই আজ তিন দফা উৎসবের দিন। এই নাও, বেস্ট লাক্।"

"বাঃ, ভারি চমৎকার তো! কি দিয়েছ?"

"জিন স্লিং।"

"কি আছে এতে?"

"জিন, চেরিব্র্যাণ্ডি, নেবুর রস, চিনি, নেবুর খোসা, এঙ্গোস্ট্ুরা।"

বুড়ো ভিতরের ঘর থেকে এক প্লেট কাজুবাদাম আর আলুভাজাও নিয়ে এল। হাসতে-হাসতে বলল, "বাদাম চিবিয়ে খাবে তুমি দাঁত দিয়ে, আমি চিবিয়ে খাব মাড়ি দিয়ে, দেখে অবাক হয়ে যাবে। দন্তহীন মাড়ি আমার এত শক্ত হয়ে গিয়েছে যে মাংসের হাড় পর্যন্ত চিবোতে পারি। আমার বাবা ক-বছর বেঁচে ছিলেন জানো?"

"কি করে জানব ম্যাক? তাঁর আতুড় ঘরে তো আমি হাজির ছিলাম না?"

"একশো-ন-বছর। সিপাই মিউটিনির সময় তিনি কোলের বাচ্চা ছিলেন, তাঁর বাবা মা সিপাইদের হাতে খতম হলেন, আয়া সময়মতো বাচ্চাকে সরিয়ে ফেলল তরকারির ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে। এক মিশনারী পাদ্রী বাবাকে মানুষ করেন। আচ্ছা কাঞ্চন, তুমি ভগবান বিশ্বাস কর?"

"আধা বিশ্বাস করি, আধা বিশ্বাস করি না। এমন কারুর সঙ্গে এ-যাবত দেখা হয়নি যে বলতে পেরেছে ঈশ্বরকে চাক্ষুস দেখেছে। আমিও দেখিনি।"

"তাহলে জার্মানি নামে একটা দেশ আছে তা বিশ্বাস কর? সে-দেশটা তো তুমি দেখনি?"

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে বললাম, "তোমার ড্রইংরুমটা বেশ বড়।"

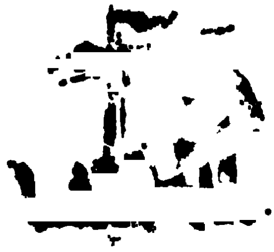
"ছোট ঘরে মন ছোট হয়ে যায়, কাঞ্চন। বড় কি আর ছিল? অনেক ভেঙে-চুরে বাড়িয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের পয়সায় বড় করে নিয়েছি। বাড়িওয়ালা একটা কিপটে র‍্যাস্কেল, একটি পয়সা খরচ করেনি কিন্তু ভাড়া বাড়িয়েছে।"

বুড়ো আরও দু-গ্লাস নিয়ে এল।

"খাও আর একটা ইয়ংম্যান, এটা ড্রাই মার্টিনি। জিন, ভার্মুথ, নেবুর খোসা, বরফ দিয়ে তৈরি। বাড়িওয়ালার কথা কি বলব, সমস্ত জগৎটাই একটা চিড়িয়াখানা। রাস্তায় চলতে-চলতে যাদের দেখ তারা মানুষের মতো দেখতে বটে, কিন্তু সবাই সত্যিকারের মানুষ নয়। হয়তো একটা লোক চলেছে নাদুসনুদুস, দেখতে গোবেচারী, কিন্তু আসলে ও শেয়ালের মতো ধূর্ত। তার কিছু বাদে দেখলে সেজেগুজে চলেছে একটি ফুটফুটে তরুণী, কিন্তু ভেতরে হয়তো নেকড়েবাঘের মতো হিংস্র। তার পেছনে-পেছনে আসছে হয়তো একটা রোগাপটকা ফোঁটাকাটা বুড়ো, ওর স্বভাব সাপের মতো খল। আরো কিছু দূরে দেখলে একটা বিশ্রীচেহারার গুণ্ডা-গোছের লোক, আসলে হয়তো ও গরুর মতো নিরীহ প্রকৃতির। ঐ যে থুড়থুড়ে বুড়ি কুঁজো হয়ে হাঁটছে, ও হয়তো এ বয়েসেও বেড়ালের মতো চোর। এ-জগৎ চিড়িয়াখানা, কে কেমন চেনা যায় না।"

"চমৎকার! চমৎকার! ম্যাক, সাধে তোমাকে দার্শনিক বলেছি? তোমার ভেতরের চোখ তো খুলে গেছে।"

"তবে আর একটু বস, তিন দফার উৎসবের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পানীয়টা নিয়ে আসছি। এবার দেব 'র‍্যম-কলিন্স।' হোয়াইট র‍্যম, চিনি, লেবুর টুকরো, বরফের গুঁড়ো, সোডাপানি। তোমাদের সাধুসন্ন্যাসীরা গাঁজার ধোঁয়ায় বুঁদ হয়ে দেবদেবীর দর্শন পায়, আমি সংসারে নিরাসক্ত পুরুষ, ককটেল পান করে মানুষের জীবন-দর্শন আগাগোড়া মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছি।"



১০

সকালের ডাকে একখানা চিঠি এসে হাজির। খামের উপরে ছাপা: ফার্গুসন অ্যাণ্ড রবসন লিমিটেড। মুন্নাদির বাড়ি যাব ভেবেছিলাম, যাওয়া হল না।

বিজ্ঞাপন দেখে মাসখানেক আগে চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম ওখানে, জবাব এসেছে দেখা করবার জন্যে। চিঠিখানা দুদিন আগেই আসা উচিত ছিল কিন্তু ডাক বিভাগের অপূর্ব খেয়ালে জি. পি.ও. থেকে এণ্টালী পোস্ট অফিসে আসতে যে তিনদিন লেগেছে তা ছাপ থেকেই ধরা পড়ল। দশটায় ইণ্টারভিউ, কাজেই মাত্র দু-ঘণ্টা সময় আছে।

যোসেফ বাজারে গিয়েছে। বাজারে একবার গেলে সে দেড়ঘণ্টার আগে ফেরে না। কারণ কোন জিনিসটার ওপর সে কত লাভ রাখবে এবং আমার কাছে হিসেব দেবার সময় কোন জিনিসটার কত দাম লেখাবে সেটা হিসেব করতে তার বেশ কিছু সময় লাগে, তার পরে গোটা কয়েক বিড়ি খাওয়া আছে, এর-ওর সঙ্গে খোশগল্প আছে, পকেট থেকে আয়না-চিরুনী বার করে কয়েকবার চুল ফিটফাট করা আছে, চা খাওয়ার তেষ্টাও আছে। অগত্যা নিজেই লেগে গেলাম জুতো পালিশ করতে, সার্ট ইস্ত্রী করতে।

দেরাজে টুকরো-টুকরো অনেক কাগজের মধ্যে থেকে বার করলাম বিজ্ঞাপনটা, যেন বঁড়শী ফেলে থৈথৈ পুকুরের জলের ভিতর থেকে মাছ টেনে তোলা। দেরাজটি আমার যাবতীয় টুকিটাকির সেফ ডেপজিট ভল্ট। লেখার প্যাড, খাম, চাবি, পিন, ক্লিপ, সিগারেট, দেশলাই, মোমবাতি, পেনসিল, কলম, স্ক্রু-ড্রাইভার, ছুরি, কাঁচি, একগাদা খবরের কাগজের কাটিং সবই থাকে। তবে যখন যেটি চট করে দরকার সেটাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিজ্ঞাপনটি দুবার পড়লাম—প্রয়োজন সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, কর্মঠ, ইংরেজী ও হিন্দীতে পারদর্শী। সর্বশেষে জানানো হয়েছে যোগ্যতা অনুসারে বেতন। প্রথম তিনটি দাবি করতে পারি, যোগ্যতা কি তা জানি না।

চিঠির দস্তখতটি অপাঠ্য, আরশোলাকে কালিতে ভিজিয়ে যেন কাগজের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েকটি আঁচড়-কাটা।

দশটা বাজবার দশমিনিট আগে ব্রেবোর্ণ রোডের উল্লিখিত ঠিকানায় পৌঁছে দেখি সাততলা বাড়ি। দুটো লিফটের সামনে জন পঁচিশেক নারী-পুরুষ লাইন দিয়েছে। একটা লাইনের পিছনে আমিও দলভুক্ত হলাম। লিফটে আটজন করে এক-একবারে পারাপার করে। এক-পা দু-পা করে এগোচ্ছি আর লিফট ফিরে আসবার অপেক্ষায় থামছি। এমন সময় মনে হল সামনের লোকটাকে জিগগেস করলে মন্দ হয় না কোন তলায় ফার্গুসন অ্যাণ্ড রবসনের অফিসটা। আমার প্রশ্নে লোকটি ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। মসীকৃত গায়ের রঙ, কপালে শাদা ফোঁটা, দাঁতে পানের ছোপ, তামিল ঢঙের ইংরেজীতে জবাব। ভুল জায়গায় দাঁড়িয়েছি, অন্য লিফটটি পাঁচ তলায় যাবে, যে-অফিসে যেতে চাই সেটা ওখানেই। মুখে তার গভীর অবজ্ঞা, বোধহয় এরকম ছেলেমানুষি প্রশ্ন কেউ কোনোদিন ওকে করেনি।

আবার অন্য লিফটটির লাইনের পিছনে দাঁড়াতে হল। আমারই বেকুবির সেলামী, কারণ এবার দেখতে পেলাম এদিকটায় স্পষ্ট লেখা আছে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম তলা। যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম এতক্ষণ ওখানেও তো এরকমই আর একটা নোটিস টাঙানো রয়েছে! এবার সামনে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। সেণ্টের গন্ধে তার শরীর ভুরভুর করছে। বিলেতের মেয়েদের অনুকরণে এদেশের ফিরিঙ্গি মেয়েরা মাথায় তেলজল দেয় না, সপ্তাহে একবার মাত্র মাথা ঘষে। কিন্তু এটা গরমের দেশ, ঘাম হয়, এদের চুলে একটা বোটকা গন্ধ লেগেই থাকে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত. রবিবার মাথা ঘষার দিন, সেদিন শুধু তাদের মাথার চুল নির্গন্ধ থাকে।

পাঁচতলায় লিফটের সামনেই প্রকাণ্ড কাঁচের দরজায় ফার্গুসন অ্যাণ্ড রবসন লিমিটেড লাল হরফে আত্মপ্রকাশ করল, তখন দশটা বাজবার একমিনিট বাকি। ঢুকেই একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিলের ওপর দেখি লেখা আছে—রিসেপসন্, আর অনেকগুলো টেলিফোনের কেন্দ্রস্থলে, একটি তরুণী। ঐ চেয়ারস্থ মোমের পুতুলটিকে যথারীতি সুপ্রভাত জানিয়ে সাক্ষাৎকারের চিঠিটা হাতে দিলাম। বড়-বড় সওদাগরী অফিসগুলোর অভ্যর্থনাকারিণীরা নবাগত আগন্তুককে একটা পেশাদারী হাসি দিয়ে সম্বর্ধনা জানায়। ওটা ওদের শিক্ষার অঙ্গ, রীতিমতো শিখে নিতে হয়। টেলিফোনের

বাক্সের হাতল ঘুরিয়ে ও কার সঙ্গে যেন কথা বলল, তার পরে আমাকে আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বসতে বলল।

ছাইরঙের কার্পেটের ওপর চারটে কোচ, সামনে বেঁটে কাঁচের টেবিলে নানারকম পত্রিকা, বুঝলাম এখানেই দর্শনপ্রার্থীরা এসে বসে, যতক্ষণ না ডাক পড়ে। দেবদর্শনে এলে ভক্তকে বাইরে বসে একটু ধ্যান করে নিতে হয়।

সওদাগরী অফিস-মহল আমার কাছে প্রায় অচেনা রাজ্য। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। একদিকে কাঁচের পার্টিসন-দেওয়া এক সারি ঘর। ঘরগুলোর সামনে বরাবর চলে গেছে লম্বা কার্পেট। কার্পেটের আর এক পাশে আবার বরাবর চলে গেছে কাঠের রেলিং। কাঠের রেলিঙের অন্যধারে প্রকাণ্ড হল্। একপাশে একটু আলাদা জায়গায় রেলিঙের ঘেরাওয়ের মধ্যে কাজ করছে টাইপিস্ট মেমসাহেবরা, তার কাছে আর একটা জায়গা আগাগোড়া লোহার জালি দিয়ে সুরক্ষিত, শুধু একটা ছোট জানলা, জানলার ওপর লেখা—ক্যাস ডিপার্টমেণ্ট। চারটি বড় টেবিল একসারিতে, তাছাড়া সারি-সারি সব ছোট টেবিলে কেরানীরা কাজ করছে। বুঝলাম বড় টেবিলগুলোর মালিকরা কেরানীশ্রেণীদের চেয়ে উঁচুদরের কিন্তু কাঁচের কেবিনগুলোর মধ্যে অদৃশ্যমান কর্তাব্যক্তিদের থেকে তফাতে।

"মিঃ সানিয়াল!"

"ইয়েস মিস?"

"মিস্টার ফার্গুসন সেলাম পাঠিয়েছেন।"

"আই বেগ ইয়োর পার্ডন?"

"সোজা চলে যাও বাঁয়ে, সব-শেষের ঘরটায় মিস্টার ফার্গুসনের দেখা পাবে।"

ক্যাবিনগুলোর দরজায় নেপথ্যচারীদের নাম পড়তে-পড়তে চললাম। পাঁজরের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা একটু বেশি টকাটক চলছিল। সাক্ষাৎকারে কি-কি প্রশ্ন আসতে পারে, কি জবাব দেব সারাপথ তালিম দিয়ে আসছিলাম, কিন্তু তার একটি জবাবও মনে নেই। এইচ. ডি. ফার্গুসন নাম-লেখা ঘরটি খুব তাড়াতাড়িই যেন সামনে এসে গেল। দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকে পড়লাম। পাশের টুলে বেয়ারা সেলাম দিল, দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

পাগলাসাহেব এই ফার্গুসন। পুরো একঘণ্টা সেক্সপীয়র মিল্টন শেলী বাইরন কিপলিঙ নিয়ে আলোচনা করল। এক-একটা কবিতার উদ্দেশ্য ও অর্থ ও কি

বুঝেছে ব্যাখ্যা করে, আমি কি বুঝেছি জিগগেস করতে লাগল। ওর টেকোমাথা এয়ার কণ্ডিস্‌নড্ ঘরেও ঘামে চকচক করছিল, ওর ধারাল দৃষ্টি যেন আমার কতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি আছে তা এক্সরে করে ছবি নিচ্ছিল। চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে এসেছি সওদাগরী অফিসে, না ইংরেজী সাহিত্যবাসরে এসেছি? চিঠিতে ওর সইয়ের তলায় পরিচিতি ছিল 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর,' কিন্তু যে এতখানি কাব্যরসিক সে কি কোনো বড় ব্যবসা চালাতে পারে? এই একঘণ্টায় অনেক টেলিফোন এল ক্রিং-ক্রিং ও প্যাঁক-প্যাঁক শব্দে। নফরদা তফাতটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রিং-ক্রিং বাইরের কল্, প্যাঁক-প্যাঁক নিজেদের মধ্যে অফিসের ঘরোয়া কল্। ও একটিও গ্রাহ্য করল না, রিসিভারও তুলল না। হঠাৎ ও একসময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এস আমার সঙ্গে পাশের ঘরে ডিকি ফেদার্স্টোনের কাছে।" পাগলের হাত থেকে বাঁচলাম, কিন্তু চাকরি হবার কোনো আশাই নেই মনে হল।

পাইপ টানতে-টানতে ফেদার্স্টোন এক পাশের ঠোঁট ফাঁক করে দু-এক কথা বলতে-বলতে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে বসতে বলল। ফার্গুসন চলে গেলে প্রায় দশমিনিট একটা ফাইলের মধ্যে ডুবে রইল। আমি ভূতের মতো বসে রইলাম। দেয়ালে অনেকগুলো ম্যাপ ও চার্ট। এক-একটা ম্যাপে এক-এক রকম রঙের পিন গোঁজা গোটা ভারতের বেবাক বড় শহরে। কোনো-কোনো চার্টে মোটা-মোটা থামের মতো কালো রঙের উঁচু নিচু দাগ-কাটা, কোনো-কোনো চার্টে এঁকে-বেঁকে গ্রাফ চলেছে। লেখাগুলো পড়তে পারলাম না, কিন্তু সাল, টাকার অঙ্ক, পরিমাণের খতিয়ান, লাভলোকসানের হিসেব যে চট করে বোঝা যায় ওগুলো থেকে সেটা আন্দাজ করতে পারলাম। ইংরেজ জাত পাকা ব্যবসায়ী। শাসন করতে যেমন ওস্তাদ, পরের দেশ শোষণ করে নিজের দেশের তল্লা ভারি করতেও তেমনি ওস্তাদ। সব ব্যাপারেই ওরা ষোলো-আনা চৌকস, সব বিষয়ই ওরা নখদর্পণে রেখে হুঁসিয়ার হয়ে কাজ করে।

"চল সানিয়াল, লাঞ্চের সময় হয়েছে, এস আমার সঙ্গে।"

অদ্ভুত লোক এরা দুজনে। ইণ্টারভিউ দিতে এসেছি কিন্তু এরা আমাকে কিছুই প্রশ্ন করছে না, এখন খেতে ডাকছে। নাঃ, চাকরিটা আর হলই না।

ফেদার্স্টোন আমাকে উপরের তলায় নিয়ে গেল। এখানে বড় একটা হল্ কিন্তু কাঁচের ক্যাবিন নেই, একটি মাত্র বড় টেবিল, বুঝলাম ওখানে বোধহয় বড়বাবু

বসেন। সওদাগরী অফিসে এই বড়বাবু নামক ব্যক্তিটি কেরানীদের কুলপতি, অফিস-শাসনতন্ত্রে সাহেবলোকদের পরমগতি। কিন্তু এই বড়বাবুর ছড়িদারি মেমসাহেব টাইপিস্টদের, একাউণ্টাণ্টদের, স্ট্যাটিসটিসিয়ানদের পিঠ স্পর্শ করতে পারে না। কেরানীবাবুরা আর দারোয়ান-বেয়ারারা এ-জীবটিকে ভয় করে, কারণ ছুটিছাটা মঞ্জুরের জন্যে আর পদোন্নতি করতে হলে এর সুপারিশ দরকার, এর চক্রান্তে চাকরিও যেতে পারে।

ওপরতলার এই হল্-এর চারপাশ উঁচু-উঁচু লোহার সেল্ফে ভর্তি। দেখলাম সেল্ফগুলো ফাইলে ভর্তি। নিচের হল্-এর মতো এখানেও সারি-সারি ছোট টেবিল কেরানীদের জন্যে। টিফিনের সময় হয়ে গিয়েছে বলে ওরা এখানে-ওখানে জটলা করছে, অনেকে বাড়ি থেকে আনা ছোট কৌটা খুলে টিফিন খাচ্ছে। সিগারেট ও বিড়ির গন্ধে নাক সুড়-সুড় করতে লাগল।

নিচের হল্-এ যেদিকটায় সাহেবদের জন্যে ক্যাবিনসঙ্কুল, উপরের হল্-এ সেখানে বাবুর্চিখানা ও খাবার জায়গা।

খানাঘরে ফেদার্স্টোন কয়েকজন দেশী-বিলিতি সাহেবপুঙ্গবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, এরা এক-এক বিভাগের কর্তা। সকলেই প্রায় আমাকে সোজা বা আড়চোখে দেখছিল, তাই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। খাবার পর ফেদার্স্টোনের সঙ্গে তার ঘরে ফিরে গেলাম।

"জুতো খুলে দাঁড়ালে তুমি কতটা উঁচু ?"

উত্তর দিলাম, "ছ-ফিট দেড় ইঞ্চি।"

"বুকের ছাতি।"

"আটচল্লিস।"

"কি খেলতে জানো ?"

"ক্রিকেট, হকি।"

"কোথায় পড়েছ ?"

"নাগপুরে।"

"দরখাস্তে লিখেছ তোমার বাবা নাইট ছিলেন, তিনি কি করতেন ?"

"ব্যারিস্টার।"

"বিয়ে করেছ ?"

"না।"

"আগে কোথাও চাকরি করেছ?"

"না।"

"খুব খাটতে পারবে?"

"পারব।"

"কাল বারোটায় আসতে পার?"

"পারি।"

"এই বইটা নিয়ে যাও, চারশো পৃষ্ঠার বেশি নয়, ছ কিম্বা সাত পৃষ্ঠায় লিখে নিয়ে এস পড়ে কি বুঝলে। এখন যেতে পার, গুড ডে।"

লিফটেই বইটার নাম দেখে নিলাম—'ব্রিটিশ বিজনেস ইন ইণ্ডিয়া,' লেখক কিঙস্‌লী মার্টিন, প্রকাশক হডার অ্যাণ্ড স্টটন, লণ্ডন।

পরের দিন বারোটায় হাজির হতেই অভ্যর্থনাকারিণী মোমের পুতুলটি চলতি কায়দামাফিক হাসির সঙ্গে জানাল সোজা ফেদার্স্টোনের ঘরে যেতে পারি। ও প্রবন্ধটি পড়ল, কয়েকটা প্রশ্নও করল, তারপর লেখাটা ফার্গুসনের কাছে পাঠিয়ে দিল। ভালো হয়েছে কি খারাপ হয়েছে আঁচ পেলাম না।

খানাকামরায় একটার কিছু আগে পৌঁছে দেখি ফার্গুসন আরো আগে এসে ওখানে বসে আছে। খাবার টেবিলের একটু দূরে লাল চামড়ার গদি-আটা খান-কয়েক কোচ, এবং লাল পায়াওয়ালা একটা নিচু কাঁচের টেবিল।

"গুড আফটারনুন সানিয়াল, তোমার লেখাটা ভালোই হয়েছে। ডিকি তোমাকে বেশ নীরস একটা বই পড়তে দিয়েছিল, না? কিন্তু দেখ ইয়ং ম্যান, ব্যবসায় ঢুকলে সরস মনও নীরস হয়ে যায়।"

একে-একে সবাই এসে খেতে বসল, আমাকে সামান্য একটু হাসি বা মাথা দুলিয়ে স্বাগত জানিয়ে।

খাবার পরে আর সবাই চলে গেল। রইলাম শুধু আমি, ফার্গুসন, ফেদার্স্টোন এবং মিস্টার ঘোষাল। ফার্গুসন চুরুট ধরাল, ফেদার্স্টোন পাইপ, মিস্টার ঘোষাল তাঁর সিগারেট কেস খুলে একটা আমাকে দিলেন, একটা নিজে ধরালেন।

কোম্পানীর বড়সাহেব ফার্গুসন। তিনি শুরু করলেন, "দেখ সানিয়াল, বাজার বড্ড খারাপ, তার ওপর আমদানী নিয়ন্ত্রণের সাংঘাতিক প্যাঁচ। নতুন-নতুন পথ

বার করতে না পারলে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তাই একটা রপ্তানি-বিভাগ চালাতে চাই। এই মিস্টার হারীণ ঘোষাল নতুন বিভাগটা হাতে নিয়েছেন, এঁরই সঙ্গে তোমাকে কাজ করতে হবে, যদি এর পছন্দ হয় তোমাকে। যাও ওঁর সঙ্গে।"

ঘোষাল-সাহেবের শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা, গালে ভাঁজ পড়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে, বয়েস মনে হল পঞ্চাশের লাগোয়া। পরনে সিল্কের ডোরাকাটা সার্ট, দামী গ্যাবার্ডিন টাই, মুখে বুদ্ধির শ্রী।

ঘোষাল-সাহেবের ঘরটাও ফেদার্স্টোনের ঘরের মতো, চেয়ার টেবিল একই ধরনের, কেবল বেশির মধ্যে কতগুলো স্টীলের 'লকার।' দেয়ালে দুটো ছবি, একটি যীশুখৃষ্টের, আর একটি খৃষ্টজন্মের দৃশ্য।

"তোমার পুরো নাম কি?" তাঁর গলার স্বরও বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ।

"কাঞ্চনবরণ সান্যাল।"

"পরশুদিন পয়লা এপ্রিল, হালখাতার পর প্রথম দিন, কাজে যোগ দিতে পারবে?"

"কিন্তু স্যর, আমাকে তো কিছু জিগগেস করলেন না, যাচাই করলেন না যে আমি কাজ পারব কিনা?"

"পারবে ভাই, এমন কোনো কাজ নেই যা মানুষে পারে না। তুমি বাঙালী, ভালো ঘরের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছ, তোমাকে পারতেই হবে।"

শ্রদ্ধা হল। এক অপরিচিত যুবক, যে তাঁর অধীনে কাজ করবে, তাকে এমন মিষ্টি সম্বোধন করা এবং তার ভিতরের শক্তির এত বড় মর্যাদা দেওয়া সবাই পারে না।

"পারব স্যর, তবে ব্যবসায়িক চিঠিপত্র লেখার কায়দা জানি না।"

"শিখিয়ে নেব।"

"ধন্যবাদ, স্যর।"

"স্যর নয়। এখানে আমরা এক্‌জিকিউটিভরা নিজেদের ভিতরে নাম ধরে ডাকি। তবে তুমি বাঙালীর ছেলে, আমাকে হারীণদা বলে ডাকতে পার। আর সবাই আমাকে হারীণ বলে ডাকে। ফার্গুসনকে ডাকবে হ্যারি বলে, ফেদার্স্টোনকে ডিকি।"

"বুড়োদেরও নাম ধরে ?"

"হ্যাঁ এটাই এদের নিয়ম। এদের শ্রেণীবিভাগ আছে, বয়েসের বিভাগ নাই। ফার্গুসন ফেদাস্টোন তুমি আমি আর যারা সব ক্যাবিনগুলোতে বসি, একসঙ্গে লাঞ্চ খাই, সব এক শ্রেণীর, একজিকিউটিভ শ্রেণী। বাবুরা আর এক শ্রেণী। টাইপিস্টরা আর এক শ্রেণী।"

"বাবুরা ?"

"কেরানীরা সব বাবু, আমরা সাহেব। কেরানীবাবুদের সুরেনবাবু, নরেনবাবু, বিজয়বাবু ইত্যাদি যার যে নাম তার পেছনে বাবু যোগ করে ডাকবে। টাইপিস্ট মেয়েদের মিস মিসেস ইত্যাদির পরে পদবী ধরে ডাকবে, একটু বয়েস যখন হবে তোমার তখন ভারিক্কী চালে ওদেরও নাম ধরে ডাকতে পার। যেমন, আমাদের নতুন স্টেনোটাইপিস্টের নাম মলি টেভারেস্, এখন তুমি ডাকবে মিস টেভারেস, আমি ডাকব মলি।"

"স্টেনোটাইপিস্ট মানে ?"

"যারা সর্টহ্যাণ্ডে ডিক্‌টেশন নেয়, আমাদের কাছে তারা স্টেনোটাইপিস্ট, ছোট কথায় স্টেনো। যারা ডিক্‌টেশন নিতে জানে না, শুধু টাইপ করতে জানে তারা টাইপিস্ট। কাজে পাকা হলে স্টেনোগ্রাফাররা এক-এক সাহেবের খাসনবিস, মানে সেক্রেটারীর পদে প্রমোশন পায়। আর একটা কথা, বাবুদের সঙ্গে কখনো বাঙলায় কথা কয়ো না, তা হলে ওরা পেয়ে বসবে।"

"চিঠিপত্তর লেখার তো কিছুই জানি না হারীণদা ?"

"প্রথম যখন ঢুকেছিলাম তখন আমিই বা জানতাম নাকি ? গ্লাসগো থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে ওখানেই এ-কোম্পানীর হেডঅফিসে মাস ছয়েক শিক্ষানবিসী করি। কিন্তু সেটা ওদের কারখানায়, অফিসে নয়। এখানে এসে দেখি এ যে টেবিল-চেয়ারে বসে চাকরি। আমিই প্রথম ভারতীয় এ অফিসে ঢুকেছিলাম, আমার যে ওপরওয়ালা ছিল সে-ব্যাটা নিজেই নিরেট মূর্খ এক স্কটস্‌ম্যান, আমাকে কিছুই শেখায়নি, নিজেই সব শিখে নিতে হল, তাই জানি তোমার প্রথম-প্রথম কোথায় অসুবিধে হবে। গড়েপিটে তোমাকে আমিই মানুষ করব, সেজন্যে ভাবনা কর না, আপাতত পার্ক স্ট্রীটের অক্সফোর্ড বুক ডিপো থেকে একখানা বিজনেস করেস্পণ্ডেন্সের বই কিনে নাও।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঘোষাল-সাহেব বললেন, "কি সর্বনাশ, তিনটে বাজে! যাক কাজের কথা বলি, এখন মাসে ছশো টাকা পাবে, ছমাস প্রবেশনারি পিরিয়ড, কাজ ভালো করলে কনফার্মেশন। তখন কন্‌ট্রাক্ট হবে। প্রথম তিন বছর সাড়ে সাতশো, তিন বছর অন্তর নতুন কন্‌ট্রাক্ট। মাইনে একশো টাকা করে বাড়বে। আমাদের এটা নতুন ডিপার্টমেন্ট, তাই এর বেশি দেওয়ার সাধ্য নেই। এখন যেতে পার।"

অফিস থেকে নেমে সোজা চলে গেলাম নিউ মার্কেটে। এতদিন হাওয়াইসার্ট আর চারটে প্যাণ্টেই চলেছে, কিন্তু রোজ অফিসে যেতে হলে কিছু কেনাকাটার দরকার। অনেক বাছাই করে গোটাছয়েক সার্ট কিনলাম, একডজন টাই, একজোড়া জুতো, একবাক্স রুমাল, তিনটে সিল্কের গেঞ্জী। দুই বগলে প্যাকেটগুলোর তাল সামলাতে-সামলাতে লিণ্ডসে স্ট্রীটের ফটকের কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় কে যেন একবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। দুপদাপ করে প্যাকেটগুলো ধরাশায়ী। খেঁকিয়ে উঠলাম, "বাঙাল না মাতাল, ইউ ইডিয়ট!"

"কাঞ্চন যে! আমি বাঙাল বটে, কিন্তু মাতালও নই, ইডিয়টও নই।"

"আরে নফরদা যে!"

নিচু হয়ে প্যাকেটগুলো আমার হাতে দিতে-দিতে নফরদা অনলবর্ষী দৃষ্টি হেনে শ্লেষ করলেন, "ইডিয়ট তো তুই, একপয়সা রোজগার করিস না, অথচ পয়সা উড়োচ্ছিস, শেষে পথে বসবি!"

টাইয়ের প্যাকেটটা ছিড়ে গিয়ে ফসফস করে টাইগুলো পড়ে যাচ্ছিল, সামলাতে-সামলাতে বললাম, "দোহাই নফরদা, গালমন্দ দেবেন না, এগুলো বাবুয়ানি নয়, প্রয়োজনীয়, চাকরি পেয়েছি।"

"চাকরি করবি না তো বলেছিলি?"

"পেলে আর কে না করে? পল্টনের সেপাইদের যেমন উর্দি লাগে, সাহেব কোম্পানীর চাকরিতেও তেমন সার্ট, টাই, রুমাল, জুতো লাগে। ট্রাউজারের অর্ডার দিতে হবে, তাছাড়া কয়েকটা পুরো স্যুট।"

"আমার হাতে কিছু দে, তুই পারছিস না, ট্যাক্সিতে তুলে দিচ্ছি। কয়েক আনা কুলি ভাড়া দিস।"



১১

৩১শে মার্চ। একটু সকাল-সকাল ঘুম ভাঙল। কাল থেকে চাকরিজীবন শুরু হচ্ছে! চাকরি রাখতে পারব কিনা জানি না। অনেক কারণ থাকে চাকরি যাবার, তার সবগুলো নিজের এক্তিয়ারে নয়। মুনাফার অঙ্কই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শোণিত। রক্তাল্পতায় যেমন দেহ টিকে থাকতে পারে না মুনাফার ঘাটতি হলেও ব্যবসা বাঁচে না। নতুন রপ্তানি-বিভাগের কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে হারীণদাই আমার সারথী।

এ জগতে আমার কেউ নেই যে চাকরির খবরে খুশি হবে। বাবা বেঁচে থাকলে কি খুশি হতেন? তিনি স্থর ছিলেন বলেই তো আমার এই চাকরি! আমার মতো এম. এ. পাশ চাকরির বাজারে গড়াগড়ি খাচ্ছে শয়ে-শয়ে, আশী টাকা জোটাও মুশকিল, বাসকণ্ডাক্টর বা কনেস্টবলের চাকরি পেলেও তারা বর্তে যায়! আমি জানি বাবার ইচ্ছে ছিল আমি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসি, নিদেনপক্ষে অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজ থেকে পাশ করে প্রফেসর হই। তার বদলে করতে যাচ্ছি গোলামি? ছেলেবেলায় কোলে বসিয়ে তিনি বলেছিলেন—কানু, অনেক টাকা রোজগার না করিস দুঃখ নেই, আমি যা রেখে যাব তাতে তোর খুব ভালোভাবেই চলে যাবে কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হস। আবার এও বলে ছিলেন যে সাতঘাটের জল না খেলে মানুষ হওয়া যায় না।

মনে-মনে বললাম, আমার ডাক তোমার কাছে পৌঁছবে কি না জানি না বাবা, তবে মনে কর সেই সাত ঘাটের এক ঘাটের দিকে পা বাড়িয়েছি। তুমি স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ কর।

আশ্চর্য লোক এই নফরদা। নিজের কথাও যেমন বলেন না, আমাকেও কোনো ঘরোয়া প্রশ্ন করেন না। গতকাল আমার চাকরি পাওয়ার খবর দিলাম, কিন্তু একটি বারও জিগগেস করলেন না কোথায় চাকরি, কি চাকরি। পরের সম্বন্ধে ওঁর

কোনোই যেন কৌতূহল নেই। আমার বাবা কে, কি করতেন, ভাইবোন আছে কিনা কোনোদিনই জানতে চাননি। আর পাঁচজন বাঙালীর মতো উনি নন।

আগের দিন নিউ মার্কেট থেকে আসবার পথে অক্সফোর্ড বুক ডিপো থেকে তিনখানা বই কিনে এনেছিলাম : এ. বি. সি. অফ বিজনেস করেসপণ্ডেন্স, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, রুডিমেণ্টস অফ বুক কিপিং। ভোরে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে সেগুলো নিয়ে বসলাম।

প্রথমখানা বেশ ভালো লাগল। 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি' রকমের চিঠি কিভাবে লিখতে হয় বুঝলাম। মিষ্টি কথায় কিরকম জুতো মারা যায়, গভর্নমেণ্টের কাছে কিভাবে দাবিদাওয়া ওজর-আপত্তি ধারালো শাঁসালো ভাষায় ঢালাই করতে হয়, অধীনস্থদের কিরকম কড়াকথা না বলে চোখরাঙানো যায়, পড়তে-পড়তে মনে-মনে স্বীকার করতেই হল কি আশ্চর্য এই ইংরাজী ভাষা! এই ভাষা ও কথার বাঁধুনিতেই ওরা এতবড় রাজত্ব গড়ে তুলতে পেরেছিল, আর ব্যবসাবাণিজ্য ফাঁপিয়ে তুলতে পেরেছে।

দরজায় টোকা পড়ল। হাঁক দিলাম, "আসুন।" দুষ্টু-দুষ্টু একগাল হাসি নিয়ে রুডল্‌ফ ম্যাক্সিম। অদ্ভুত বেশ! খাকি হাফপ্যাণ্ট, খাকি হাফসার্ট, বুটজুতো, দুহাতে দুটো ব্যাগ এবং একটি বেতের ঝুড়ি।

"বেরিয়ে এস কাঞ্চন, ঘরের ভেতর বন্দী থাকলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। ভগবান খোলা আকাশ খোলা বাতাস দিয়েছেন, আর আমরা কীটের মতো ইট-পাথরের বাড়িতে নিজেদের বন্ধ করে রেখেছি। চল আমার সঙ্গে, যে-ভাবে আছ। শুধু দুটো তোয়ালে সঙ্গে নাও। আমি গীর্জায় যাই না, সেখানে ভগবানকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই আজ রবিবার কিন্তু গীর্জায় যাইনি। প্রত্যেক রবিবার সকালে আমি যাই গ্রামে, ঘুরে বেড়াই জঙ্গলে-জঙ্গলে। সেখানে ফুলে-ফলে, লতায়-পাতায়, কীট-পতঙ্গের পাখনার রঙে, গ্রামবাসী ছেলে-মেয়ের সরল শান্ত মুখে দেখি ভগবানের প্রকাশ। ইয়ংম্যান, তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে, মনের দরজা বন্ধ করে, বন্ধ হাওয়ায় অন্ধ হয়ে এভাবে থেক না। উঠে পড়।"

আমার ওজর-আপত্তি কিছুই শুনল না। বুড়ো জোর করে টেনে নিয়ে গাড়িতে তুলল। লোয়ার সার্কুলার রোড, পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, ভবানীপুর, কালীঘাট, বেহালা, বঁড়শে, সখেরবাজার, ঠাকুরপুকুর ছাড়িয়ে গাড়ি পাকারাস্তা ছেড়ে এক মেঠোপথ

ধরল। বুড়ো একটি কথাও কইছে না, পেছনে হেলান না দিয়ে একেবারে সোজা হয়ে বসে আছে, একটা চাপা উত্তেজনায় যেন ওর শরীর মাঝে-মাঝে কেঁপে উঠছে।

এবড়োখেবড়ো মেঠোপথে এ-কাত ও-কাত হতে-হতে প্রায় মাইল-খানেক যাবার পর গাড়ি একটা গ্রামের ভিতরে গিয়ে থামতেই ম্যাক লাফ দিয়ে নেমে হর্নটা খুব জোরে বাজাতে লাগল। চোখের নিমেষে ছুটে এল দশ-বারোটা ছেলে-মেয়ে। "গুডমর্নিং, গুডমর্নিং, দাদু"-র হুল্লোড়ে তারা বুড়োকে এসে জড়িয়ে ধরল।

একি চুরানব্বই বছরের বুড়ো ইন্দো-জার্মান বংশজ রুডল্ফ ম্যাক্সিম, না ঐসব দরিদ্র গৃহস্থপরিবারের অর্ধ-উলঙ্গ বাচ্চাকাচ্চাদের সমবয়সী সমশ্রেণীর এক পুরনো বন্ধু? ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে, হেসে, মুখভেঙচি কেটে, চেঁচিয়ে লাফিয়ে ও যে ওদের সঙ্গে একেবারেই প্রাণখুলে মিশে গেছে? আর আমি ওদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছি!

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বয়েস অ্যাণ্ড গার্লস, দাঁড়াও ফোর ফিট দূরে, তোমাদের ওয়াস্তে হোয়াট প্রেজেণ্ট এনেছি—সী?"

ওরা কিন্তু কথাগুলো সব বুঝল, একটু দূরে সরে দাঁড়াল।

ম্যাক গাড়ির পিছন থেকে একটা ব্যাগ বার করল, ব্যাগের স্ট্র্যাপ খুলে ছুঁড়ে দিতে লাগল লাল শাদা হলদে নীল ছোট-ছোট রবারের বল। লেগে গেল ওদের হুটোপুটি।

ছোট একটা খুকি কাঁদতে শুরু করে দিল। হুটিপুটির ডামাডোলে ও কাড়া-কাড়িতে সুবিধে করতে পারেনি। ম্যাক ডাকল, "কাম হিয়ার লিটল গার্ল, এই বলটি টেক।" মেয়েটি এগিয়ে এসে বলটি নিয়ে কান্না বন্ধ করে হাসতে লাগল। এরা যেন সাহেবের মুখের কথা সব না বুঝতে পারলেও মনের কথা বোঝে।

এই গণ্ডগ্রামের প্রভাতকালীন আনন্দবাসরে চুরানব্বই বছরের বাধক্য হাতে হাত মিলিয়েছে সাত-আট বছরের বাল্যের সঙ্গে। যেন পশ্চিমাচলের অস্তোন্মুখ সূর্য এবং পূর্বাচলের তরুণ আলোকের মধ্যে বর্ণাঢ্য রামধনু যোগসূত্র রচনা করেছে বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণদিনে। এই মিলনবাসরে বয়েসের বৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য, ধনবৈষম্য, কোনো বৈষম্যই নেই, আছে শুধু প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ। বাল্যের কলকণ্ঠকাকলির সঙ্গে বার্ধক্যের কলহাস্যের সাগরসঙ্গমতীর্থ। এখানে আমি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি। এ-মহাতীর্থে আমার স্থান নেই।

আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল ছেলেমেয়েগুলোর চিৎকারে, "দাদু, সুইট কই, লজেঞ্জ কই ?" ম্যাক তার হ্যাফপ্যান্টের দুই পকেট থেকে মুঠো-মুঠো লজেঞ্জ ছুঁড়ে মারতে লাগল। ওরা আনন্দ করে খেতে লাগল।

ম্যাক বলল, "কাঞ্চন, এদের জন্যে দুঃখ হয়, দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, ছেঁড়া জামাকাপড় পরে থাকে, কারো বা তাও জোটে না, অথচ এটা ওদের বাড়বার বয়েস। ঐ যে দুটো ন্যাঙ্‌টা ছেলেমেয়ে দেখছ ওরা বুড়ো বাপমায়ের সন্তান, ওদের আগে পাঁচ-পাঁচটা বোন, কি খাওয়াতে পারে ওদের ? আর ঐ যে কাঠির মতো সরু হাত-পাওয়ালা বাচ্চাটাকে দেখছ ও বাপ-মায়ের নটি সন্তানের পরে জন্মেছে। তোমরা হিন্দুরা ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে চেঁচাও, তর্ক কর, উপনিষদের শ্লোক আওড়াও কিন্তু দেশের এই চরম দারিদ্র্য কি করে তাড়াতে হয় জানো না। প্রবৃত্তির তাড়নায় বছর-বছর সন্তান পয়দা করে যারা দারিদ্র্যকে বাড়িয়ে তোলে তাদের জন্যে তোমাদের মহাভারতে কি উপদেশ লেখা আছে বল তো ? কলকাতার আশে-পাশে প্রায় চল্লিশটা গ্রাম আমি খুব ভালো করে জানি, সব জায়গায়ই এই হতভাগ্য শিশুর দল। অন্নাভাব, রোগে চিকিৎসার অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানের অভাব, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, আনন্দ দেওয়ার আয়োজনের অভাব। কুকুর বেড়ালের ছানার মতো এই সব সোনারচাঁদরা আঁস্তাকুড়ে মানুষ হচ্ছে। ভাবতে বসলে রক্তে আমার আগুন জ্বলে ওঠে। তোমাদের অনেক শাস্ত্র আছে আমার কাছে, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়।"

এর জবাব কি দেব ! জবাব নেই।

আবার ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল, "দাদু তুমিও সুইট, ভেরি সুইট।"

ম্যাকের সঙ্গে ওদের একটা মিষ্টি সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে কয়েকবছরে, সেটা বুঝলাম। ওর কাছে কয়েকটা ইংরেজী বুলিও শিখে ফেলেছে।

বুড়ো ব্যাগের ভিতর থেকে দুটো জালের থলি বার করে হাঁক দিল, "কুইক্, ব্রিং ব্যাম্বু স্টিক।" একটু বড় দুটো ছেলে ছুটে গিয়ে সরু দুটো বাঁশ নিয়ে এল। বাঁশের মাথায় থলি বেঁধে একটা হুইসেলে ফুঁ দিয়ে ম্যাক ছুটল, আমার হাতে আর একটি থলি দিয়ে। বাচ্চারাও ছুটল। ওরা খেলাটা জানে, আমি জানি না, তাই আনাড়ির মতো থাবড়ে গিয়ে কিছুটা পেছনে পড়ে রইলাম।

ঝোপঝাড় ভরা একটা মাঠের কাছে যেতে পেছনের একটা ছেলে চিৎকার করে

উঠল, "দাদু, স্টপ-স্টপ।" আমিও এ-সুযোগে এগিয়ে গেলাম, দেখি একটা ব্যাঙের ইহজন্ম পায়ের তলায় শেষ হয়েছে। ম্যাক হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল, বেল্টের সঙ্গে একটা ছুরি ঝোলানো ছিল, সেটা খুলে নিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগল। বাচ্চারাও সব হাঁটুগেড়ে বসে পড়েছে দেখে আমিও তাই বসলাম।

গর্ত খোঁড়া শেষ হলে একটা ছেলে মরা ব্যাঙটাকে ওর ভেতরে মাটিচাপা দিতে লাগল। বুড়ো প্রার্থনা করতে লাগল, আর সবাই কথাগুলো একযোগে পুনরাবৃত্তি করতে লেগে গেল, "ব্যাঙ ব্রাদার, কসুর ফর্গিভ, না জেনে তোমার লাইফ নিয়েছি ফর্গিভ প্লিজ। ক্রাইষ্ট আমাদের দয়া কর। তোমার স্বর্গরাজ্যে টেক হিম। আমেন।"

কে বলবে ছেলেমেয়েরা এ-সাহেবের সব কথা বোঝেনি। ওদের মুখ দেখে মনে হল প্রত্যেকটি ইংরেজী কথা ওরা যেন বুঝেছে, এবং এরকম শেষকৃত্য ওদের কাছে এই প্রথম নয়। একটা মেয়ে কেঁদে ফেলল।

ম্যাক আবার বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ছুটলে খেলা পুনশ্চ শুরু হল। ঘণ্টা দেড়েক ছোটাছুটির পরে দেখা গেল ও ধরেছে এগারোটা প্রজাপতি, আমি একটিও না। ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘিরে ধরে চেঁচাতে লাগল, "এ-সাহেব বোকা বোকা বোকা, তিনসত্যি তিনসত্যি তিনসত্যি, এবার দাও জরিমানা।" দুটো টাকা ওদের হাতে জরিমানা বাবদ দিয়ে তবে ছাড়া পেলাম। খেলা শেষ হয়েছে জেনে ওরাও "ভেরি গুড দাদু" "ভেরি গুড দাদু" চিৎকার করতে-করতে চলে গেল।

"কাঞ্চন, তোমার নামটা বড় কটমট, তোমাকে 'কনি' বলেই ডাকব। চল গাড়ির কাছে গিয়ে খাবার ব্যাগটা আর চানের পোশাক নিয়ে আসি, কাছেই একটা পুকুর আছে, চান করবে? ওখানে মেয়েছেলেরা যায় না। দুটো তোয়ালে আনতে বলেছিলাম?"

"এনেছি। আগে জানলে চানের পোশাক নিয়ে আসতাম।"

"ভেতরের ইজার পরেও চান করতে পার। সাঁতার কেটে চান করার মতো আরামের আর কিছু নেই গরমের দিনে।"

"কিন্তু দেরি হয়ে যাবে না? মোটরটা কোথায় পেলে?"

"ফুর্তি কর ইয়ং ম্যান, কেউ গাড়িটার জন্যে অপেক্ষা করছে না। একটা গ্যারাজে আমার কিছু টাকা খাটছে, প্রতি রবিবার একখানা গাড়ি পাঠায় ওরা, ড্রাইভার তার খাবার নিয়ে আসে।"

সাঁতার কেটে স্নান করতে ভালো লাগল। বুড়ো দেড়ঘণ্টা হুটোপুটি করেছে প্রজাপতি ধরতে, তাই ছিল এ-প্রজাপতি শিকারের মানেও বুঝলাম না, কারণ ও শেষকালে সবকটাকেই আবার উড়িয়ে দিয়ে এল। একটা প্রজাপতি কতকটা বেহুঁস হয়ে পড়েছিল, সেটাকে মুখের গরম হাওয়া দিতে-দিতে তাজা করে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল।

স্নানের শেষে একটু জিরিয়ে ম্যাক ব্যাগ থেকে বার করল ছুটো প্ল্যাস্টিকের ডিস, তিন বোতল বাঙ্গালোর বিয়ার, একগাদা চিকেন স্যাণ্ডুইচ ও হ্যাম স্যাণ্ডুইচ, ছুটো বড় আপেল। ছুটো গ্লাসে বিয়ার ঢেলে বুড়ো বলল, "কনি, রোজ একরকম খেতে হবে, গরম খাবার খেতে হবে, কেন? আমরা কি মেসিনে ঢালাই-করা মাল? আমাদের কি কোনো মৌলিকতা থাকতে নেই। প্রত্যেকদিন একভাবে বাঁধাধরা নিয়মে চলব কেন? বিয়ারটা আর ঠাণ্ডা নেই তবু খাও—চিয়ার্স। আমি বরাবরই নিজের খুশিমাফিক চলেছি।"

"তাই বুঝি তুমি আর দশজনের মতো বিয়ে-থা করনি?"

এ প্রশ্নের জবাব পেলাম অনেক পরে, যখন ও পুরো তু-বোতল বিয়ার শেষ করেছে। আমি প্রথম একগ্লাশের পরে আর খাইনি, বাকিটাও ওকে ঢেলে দিলাম। পান করি বটে, তবে কখনো-সখনো, তাও একটু-আধটু।

"কনি, নিজের খেয়ালমতো চলতে পারাটাও খুব সুখের নয়। যার জন্যে ভাববার কেউ নেই, যাকে দেখবার কেউ নেই, যার আর কাউকে খুশি করবার নেই, কারো কাছ থেকে সত্যিকারের ভালোবাসার প্রত্যাশা নেই, জীবনপথে যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, সে হতভাগ্যই নিজের খেয়ালমাফিক চলতে পারে। সে বাঁচতে চায়, ভুলতে চায়, হাসতে চায়। এটা হয়তো তুমি বুঝবে না।"

চোখ বুজে ম্যাক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আমিও চুপ। তারপর বলল, "কনি, আমি বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, দিনও ঠিক হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্য হল বিরূপ। বাবা হবার স্বপ্নও দেখেছিলাম, কিন্তু সে স্বপ্ন আর বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু আজ তো দেখলে এখানেই আমার কত নাতি-নাতনী আছে, 'দাছু'-'দাছু' ডাকছে? কলকাতা থেকে যে-কটি পাকা রাস্তা বেরিয়ে গেছে দক্ষিণে ডায়মণ্ড-হারবার রোড, সোনারপুর রোড, পুবে যশোর রোড, পশ্চিমে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, ওগুলোর আশেপাশে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে

আমার এরকম নাতি-নাতনীর দল নেই। এরাই বুড়ো বয়েসে আমার খেলার সঙ্গী। ওদের ভিতরেই আমার হারানো জীবন খুঁজে পেয়েছি। ওদের অনেকের বাবা-দাদারাও আমার খেলার সাথী ছিল ওদের জন্মাবার আগে। ছেলেমেয়ের শখই বল, স্নেহই বল, তাদের দিয়ে মিটিয়েছি আমার প্রৌঢ় বয়সে। তাই কলকাতা ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছে করে না, অনেকবার যেতে চেয়েছি কিন্তু যেতে পারিনি, বাঙালী ও বাঙলাদেশকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।"

কি বলব খুঁজে পেলাম না। ম্যাককে সদাই দেখেছি হাস্তমুখ, আজ এই ভাবান্তর আমাকে বিস্মিত করল। চোখদুটো ছলছল করছে ওর।

"ম্যাক, কিন্তু তুমি তো আনন্দময় পুরুষ, তোমার মনে যে কোনো দুঃখু আছে তা তো জানতাম না?"

"দুঃখুকে ভুলে থাকবার জন্যেই জোর করে আনন্দ করা। সুখ পাওয়াটা আমাদের হাতে নয়, কিন্তু আনন্দ করা আমাদের হাতে। তোমরা হিন্দুরা না বল ঈশ্বর অখণ্ড আনন্দস্বরূপ? আর মানুষ এসেছে সেই অখণ্ড আনন্দলোক হতে? আর ফিরেও যাবে সেই আনন্দলোকে? তবে তো আনন্দ করবার অধিকার মানুষের সব সময়েই আছে?"

"কিন্তু দুঃখু ভুলতে গিয়ে তো তুমি নিজের সঙ্গে ছলনা করছ? ছোটদের সঙ্গে হৈহুল্লোড় করায় আনন্দ আছে মানছি, কিন্তু প্রজাপতির পেছন-পেছন দৌড়ে কি আনন্দ বুঝি না।"

বুড়ো গেলাশে আর এক চুমুক দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর জবাব দিল, "তবে শোনো কনি। সত্তর বছরের আগের কথা। র‍্যালি ব্রাদার্স-এর নাম শুনেছ? খুব বড় ফার্ম, গ্রীক কোম্পানী। তখন এ্যাডলফাস ডাইওনেসিয়াস ছিলেন ও কোম্পানীর মেজসাহেব। আইওনিয়ান গ্রীক। তাঁর মেয়ে এঞ্জেলীনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। বত্তিচেলির ভেনাস মূর্তির মতন ছিল দেখতে। ভেনাস মূর্তি শুধু পটে আঁকা, এঞ্জেলীনা জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল, রক্তমাংসে গড়া। পটের ছবি হাসে না, কথা বলে না, তার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইরের সৌন্দর্যের আবরণে যদি একটি সরস সাবলীল দরদী মনের দীপশিখা দেখা যায় তবে কি মনে হয়? এই প্রজাপতি ধরার নেশা এঞ্জেলীনারও ছিল, আর ছিল সাঁতারের। এই সূত্রেই আমাদের পরিচয় পরিণত হল প্রণয়ে। তখন আমার বয়স

ছিল চব্বিশ, এঞ্জেলীনার বাইশ। তখনকার সমাজ এখনকার সমাজের মতো ছিল না, আমাদের লুকিয়ে-চুরিয়ে বেরিয়ে পড়তে হত। এখন ঘণ্টাখানেক প্রজাপতির পেছনে ছোটাছুটি করলেই হাঁপিয়ে পড়ি, সাঁতারে দম পাই না, তখন চার-পাঁচ ঘণ্টাতেও কোনো ক্লান্তি বোধ করতাম না।"

বুড়োর মন যেন কালস্রোতে কোন অতীতের বেলাতটে ভেসে গিয়েছে। দৃষ্টি উদাস। এতক্ষণে বুঝলাম এই দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে ঐ বিগত যৌবনের স্মৃতি, এঞ্জেলীনার স্মৃতির তর্পণ করছে প্রতি রবিবার একনিষ্ঠভাবে।

জিগগেস করলাম, "সে তোমাকে ভালোবেসেছিল ?"

ধরা-গলায় জবাব এল, "হ্যাঁ।"

"তবে বিয়েটা হল না কেন ?"

"এঞ্জেলীনার মায়ের আপত্তি ছিল, কেন না শত হলেও আমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। আমার বাবা ছিলেন খাঁটি জার্মান, কিন্তু আমার মায়ের রক্ত খাঁটি ইউরোপীয়ান ছিল না। এঞ্জেলীনার বাবার বিশেষ আপত্তি ছিল না, তিনি আমাকে স্নেহই করতেন যখন থেকে এঞ্জেলীনা তাঁর কাছে মনের কথা প্রকাশ করল। আমার ব্যবসা সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে, আমার চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে, তিনি হয়তো বুঝেছিলেন তাঁর মেয়েকে আমি সুখেই রাখতে পারব। স্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তিনি প্রায় রাজীও করেছিলেন, বিয়ের দিনও ঠিক হল। আমি তখন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে যেন আকাশে ভেসে যাচ্ছি মেঘের ভেলায়। হঠাৎ এল দারুণ আঘাত। স্বপ্ন ভেঙে গেল মর্মান্তিক ঘটনায়।"

বুড়োর দুই গাল বেয়ে জল নেমেছে। বললাম, "থাক ম্যাক, যা বহুদিন আগে হয়ে গিয়েছে তা কবর থেকে খুঁড়ে বার করে মনকে কষ্ট দিও না।"

"না কনি, আর একটু বাকি আছে শুনে যাও। বিয়ের তিন দিন বাকি, এমন সময় এঞ্জেলীনা পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করল। মা'র সঙ্গে বোধহয় আবার ঝগড়া হয়েছিল, তাই অভিমান করে সে চলে গেল। বালিসের তলায় সে দুখানা চিঠি রেখে গিয়েছিল, একখানা পুলিসের নামে, আর একখানা আমার নামে। খাম ছিঁড়ে দেখলাম কিছুই লেখা নেই শুধু আছে দুটি শুকনো প্রজাপতি।"

বুড়োর হাত ধরে বললাম, "চল ম্যাক এবার বাড়ি যাই। খাওয়া তো হয়ে গেছে, আমিই জিনিসগুলো ব্যাগে ভরে নিচ্ছি।"

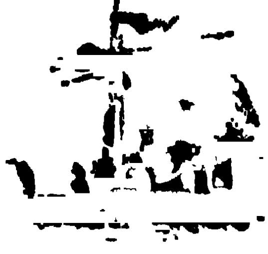
যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলাম সে-পথ দিয়েই ফিরলাম। চৈত্র মাসের রৌদ্রে ছ্যাঁকাপোড়া হয়ে কলকাতার শহর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। পথে লোকজন খুব নেই এই তাপদগ্ধ অপরাহ্নে। শহরে বসন্ত-কাল কখন আসে কখন যায় জানা যায় না, শুধু বসন্তমহামারীর ভয় ছড়িয়ে পড়ে। কোকিল ডাকে না, দখিন হাওয়া ঝিরঝির করে শিহরণ জাগায় না, ছড়ায় আগুনের হল্কা।

বুড়োকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলাম। এঞ্জেলীনার ফোটোও দেখলাম। ফোটোটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। সাবেককালের বড়হাতা গলাঢাকা জ্যাকেট, গোড়ালি পর্যন্ত গাউন, হাতে ফুলকাটা কাপড়ের ছাতা, মাথায় পালকগোঁজা সেকেলে বড় টুপি। কালের অবক্ষয়ে এবং সৌন্দর্যের মাপকাঠির পরিবর্তনে মুখখানির মধ্যে আমার এ-কেলে চোখদুটো কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ভাবলাম এঞ্জেলীনাকে বিয়ে করলেই যে ম্যাক খুব সুখী হত কে বলতে পারে? স্ত্রীলোক কল্পনার তুলিতে স্বামীর যে আদর্শ মানসপটে এঁকে তোলে এবং পুরুষ তার জীবনসঙ্গিনীর যে আদর্শ মনে-মনে রচনা করে বিয়ের আগে, বিয়ের পরে সে ছবির রেখাগুলো কি ক্রমে শুকিয়ে কর্কশতা ফুটে ওঠে না? আদর্শের তুলনায় আসলটি কি ক্রমে অনেক ছোট হয়ে দেখা দেয় না? স্বল্পগণ্ডীর আবেষ্টনে সান্নিধ্যের প্রখর আলোকে কি পরস্পরের অসম্পূর্ণতা স্বার্থপরতা অসহন-শীলতার ছোটখাটো দোষগুলো অবিচার অবহেলা ও দরদহীনতার ছদ্মবেশে পরস্পরের বিরক্তিসঞ্চার করে না?

নফরদাও একদিন বলেছিলেন: বুঝলি কাঞ্চন, স্ত্রীরা যে স্বামীদের ভালোবাসে সে ভালোবাসা স্বার্থপূর্ণ। নিজের জন্যে, সংসারের জন্যে, ছেলেপুলের জন্যে স্ত্রীলোকের এ-টা ও-টা চাওয়ার শেষ নেই, সে-চাওয়ার যোগানদারি ভালোভাবে করতে পারলেই ওদের মন পাওয়া যায়। ভেবে দেখ তোর মুন্নাদির কথা। কিন্তু হ্যাঁ, বলতে পারিস মাতৃস্নেহের কথা, মা ছেলেমেয়েকে ভালোবাসে শুধু ভালোবেসেই তৃপ্তি পাওয়ার জন্যে, সে ভালোবাসায় প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা নেই।

যাকগে এ-সব ভেবে আমার কি হবে? আমি নফরদার শিষ্য, কোনোদিন তো বিয়েই করব না। ঘরে এসে আবার বই তিনখানা নিয়ে বসলাম, আগামীকাল অফিসের জন্যে প্রস্তুত হতে। কিন্তু বারবার ডোরিন গ্রে-র কথা মনে আসছে। ওর সঙ্গে আমার মেশামিশি একটু বেশি হচ্ছে কি?



১২

ভেবেছিলাম ন'টা থেকে পাঁচটা অফিসের চাকার সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে হাঁপিয়ে উঠব। কিন্তু হাঁপিয়ে উঠিনি, কাজে মনও বসেছে। যে বয়েসের যা ধর্ম। উঠতি যৌবনে বেকার জীবন কর্মশক্তি ও বুদ্ধিশক্তিতে মরচে ধরিয়ে দেয়, আত্মবিশ্বাস ভোঁতা করে দেয়। যা ভেবেছিলাম পারব না, তাও পারছি। হারীণদা আমার কাজে খুশিই হচ্ছেন মনে হয়, কিন্তু মুখে কিছু বলেন না। ভুলচুক হতে যাচ্ছে দেখলে শিখিয়ে দেন, এরকম মাস্টার আর বোধহয় পেতাম না এ-বয়েসে।

"দেখ কাঞ্চন, দেবতাদেরও ভুলচুক হয়, কিন্তু বেকুবের মতো কোনো মারাত্মক ভুল যদি না কর তবে সে-ভুলের খেসারত আমি দেব, কারণ দায়িত্ব আমার। আর যদি মাথা খাটিয়ে কিছু ভালোভাবে করতে পার তবে প্রশংসাটা পাবে তুমি, কারণ আমি ওদের বলব তুমিই করেছ।"

'ওদের' বলতে উনি বাঁ হাত সোজা করে দেখিয়ে দিলেন যে দিকটায় ফার্গুসন, ফেদার্স্টোন বসে। ফার্গুসন ও ফেদারস্টোনের কামরার পরেই ঘোষাল-সাহেবের এই কামরা, অফিসের সবাই জানে ও-দুজন অবসর নিলে ঘোষাল-সাহেবই হবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এখন ফার্গুসন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ফেদার্স্টোন জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ঘোষাল-সাহেব ওরফে হারীণদা ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। এ কামরার ডানপাশের ক্যাবিনগুলোতে যে-সব শাদা ও কালো সাহেবরা বসে তারা মুখে ডাকে হারীণ, কিন্তু মনে-মনে করে ভয়।

একদিন কাজকর্ম একটু কম ছিল, তাই স্টেটসম্যান কাগজের ক্রসওয়ার্ডটা একটু দেখছিলাম। হারীণদার চোখ পড়ল। গম্ভীর ভাবে বললেন, "সানিয়াল, অফিসে যে সময়টা থাক তার দাম দিচ্ছে কোম্পানী। কোম্পানীর পয়সায় কোম্পানীর সময় নিজের কাজে নষ্ট করতে পার না। যাও, এ-মাসে যে-কটা চালান পাঠানো হয়েছে চেকোশ্লোভিয়া, জাপান, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সেগুলোর দাম

আলাদা-আলাদা করে হিসেব কষে নিয়ে এস। প্রতিমাসেই এ-রকম রিপোর্ট একটা আমাকে দেখাবে।”

শুনেছি কেরানীবাবুদের জানা আছে ঘোষাল-সাহেব ভারি কড়া লোক, সেটা এ-ঘটনা থেকে বুঝলাম। মনকে প্রবোধ দিলাম গোলামি করতে চাকরিতে ঢুকেছ, মাঝে-মাঝে চাবুক খেতে হবে বইকি ?

হারীণদার নিজের কথাও কথার ফাঁকে-ফাঁকে অনেকবার ধরে ফেলেছি। ওঁর বাবা ছিলেন রংপুরে উকিল, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অনেক হাঁ-না করে ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। গ্লাসগোতে রয়াল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়বার সময় উনি এক পাদ্রীদুহিতার প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই পাদ্রীসাহেবের কাছে খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য শুনে-শুনে হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধও হন। শেষ পরীক্ষায় কৃতীত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সেই পাদ্রীকন্যা হিল্‌ডা ম্যাহনের সঙ্গেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিয়েটা রেজিস্ট্রি অফিসের সাড়ে তিন শিলিঙ খরচায় হল না। রেভারেণ্ড ক্রিস্টোফার ম্যাহন গোঁড়া ক্যাথলিক খৃষ্টান, মেয়েও তাই, সেজন্যে গীর্জায় বিয়ে হল, বিয়ের আগের দিন ব্রাহ্মণসন্তান হারীন্দ্রনাথ ঘোষাল খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। হিল্‌ডা ম্যাহন তার ধর্ম রক্ষা করলে ক্যাথলিক খৃষ্টান হ্যারি ঘোষালকে বিয়ে করে। বিয়ের খরচটা অবিশ্যি দিয়েছিলেন হারীণদার বাবা। বেচারা বুঝতে পারেননি যে এই পাঁচশো টাকা ডিগ্রী নেওয়ার জন্যে নয়, আসলে ডিগ্রীধারী ছেলের বিয়ের খরচা। একমাত্র পুত্রের প্রতারণার ফাঁদে স্নেহান্ধ পিতা আসল ব্যাপারটি বুঝলেন না।

নববধূকে নিয়ে হারীণদা হানিমুন করতে গেলেন প্যারিসে। নগরীযূথ মুকুটমণি নিখিলচিত্ত সোহাগিনী বিচিত্রাভরণী নয়নবিজয়িনী রসবিলাসিনী প্যারি ! ঘোষাল-দম্পতি যখন সীন নদীতে নৌকাবিলাস, আইফেলটাওয়ারে চকোলেট পান, মোমার্ত-এর পথবিপণীতে বলিঙ্গার শ্যাম্পেন বা পোমার্দ বারগাণ্ডির নেশায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন জমাচ্ছেন, লা-প্লাস-দ্য-কঙ্কর্দ কিম্বা লুভ্‌র মিউজিয়ম কিম্বা শাঁজেলিজেয় হাতধরা-ধরি করে বেড়াচ্ছেন, তখন ওদিকে রংপুরে ঘোষালসাহেবের বাবা হঠাৎ রক্তের চাপ বেড়ে শয্যাশায়ী, বাতে পঙ্গু জননী কায়ক্লেশে রান্নাবান্না বাসন-মাজা করছেন, যা-কিছু অল্প সঞ্চয় তা গেছে গ্লাসগোর ব্যাঙ্কে ছেলের ফিরে আসার খরচের জন্যে।

এ-সবই আমি হারীণদার মুখে তাঁর দুর্বল মুহূর্তে জেনে নিয়েছি। গ্লাসগোর ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন ক্যাথলিক, তিনিই ওঁকে গ্লাসগোর কার্ণ্ডসন

এ্যাণ্ড রবসন লিমিটেডের হেড অফিসে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাই চাকরিটা তখনই হয়ে গেল। ক্যাথলিকদের ধর্ম-ভ্রাতৃত্ববোধ খুব জোরাল।

কিন্তু হারীণ ঘোষাল জীবনে খুব সুখী হননি বলে মনে হয় আমার। বম্বেতে নেমেই ওঁর বাবার টেলিগ্রাম পেলেন—রংপুরে আসবার দরকার নেই। কলকাতায় এসে মা'র চিঠি পেলেন—খোকা, তুমি কি যে ভুল করেছ আমি কি বলব? তুমি ধর্মত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছ ও মেম বিয়ে করেছ এখবর তুমি না দিলেও লণ্ডন থেকে আমাদের একজন জানিয়েছিল। সে-চিঠি যেদিন এল সেদিনই তোমার বাবার রক্তের চাপ খুব বেড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান, সেই অবধি উনি বিছানায় শুয়ে। কিভাবে যে আমার দিন কাটছে তা তুমি বুঝবে না। এখানে আসবার চেষ্টা কর না, উনি বলেন এ-বাড়িতে খৃষ্টানের স্থান হবে না। পাশের বাড়ির লক্ষ্মীর মা'র ঠিকানায় শ্রীমতী বৌমার একখানা ফটো পাঠিয়ে দিও, হাজার হলেও সে আমার খোকার বউ, তাই কেমন হল দেখতে ইচ্ছে করে।

হারীণদা নাকি পর-পর তিনমাস রংপুরে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠান, প্রতিবারেই টাকা ফেরত আসে। হারীণদা মুখ নিচু করে একটা কাগজে হিজিবিজি দাগ কাটতে-কাটতে ধরাগলায় শেষ করলেন: "এমনই অধম সন্তান আমি যে রংপুরের একটি লোকও আমাকে বাবার মৃত্যুসংবাদ পাঠাল না। মাসখানেক পরে খবর পেয়ে সেখানে ছুটে গেলাম, লক্ষ্মীর মা পথ রুখে দাঁড়ালেন—তোমার মা'র ঘরে যেওনি বাপু, আচায্যিমশাই শালগ্রাম নিয়ে এসেছেন, মা'র শ্বাস উঠেছে, তুমি ঢুকলে শালগ্রামেরও জাত যাবে। গ্রাহ্য করলাম না। শেষবারের মতো আমার স্নেহময়ী মাকে দেখব না? ঘরে ঢুকতেই আচায্যি মশাই চিৎকার করে উঠলেন, সে-চিৎকারে মা একবার চোখ মেললেন, মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল, ফিস-ফিস স্বরে বললেন 'খোকা?' তার পর মুহূর্তেই সব শেষ। যেন শুধু আমাকে একটিবার দেখতেই বেঁচে ছিলেন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীদের ঘৃণা-মিশ্রিত নির্মম ব্যবহারে মনে অত্যন্ত ব্যথা পেলাম, স্বর্গতা মায়ের পা-ও আমাকে ছুঁতে দেওয়া হল না। কাঞ্চন, আমি পিতৃহন্তা মাতৃহন্তা ঘোরপাপী—প্রভু যীশু আমায় ক্ষমা করুন।"

আর একদিন কথা হচ্ছিল। সামনের বছর ফার্গুসন অবসর নেবে। হালে এক মাদ্রাজী মহিলাকে বিয়ে করেছে। বাঙ্গালোরে থাকবে, দেশে আর ফিরে যাবে

না। একটু চঞ্চল হলে হারীণদা কাগজে হিজিবিজি দাগ কাটতে থাকেন গায়ের জোর দিয়ে। হিজিবিজি আঁকতে-আঁকতে বললেন, "মিশ খায় না কাঞ্চন, একগাছের ছাল অন্যগাছে জোড়া লাগে না। যারা ওদেশে গিয়ে বিয়ে করে তাদের ওদেশেই থেকে যাওয়া ভালো, আবার ওরা যদি এদেশে এসে বিয়ে করে তবে এদেশেই থেকে যাওয়া ভালো। হ্যারি ফার্গুসনের আগের স্ত্রী বেঁচে থাকলে ও বিলেতেই ফিরে যেত, কিন্তু দ্বিতীয়বারে যখন এদেশে বিয়ে করল তখন এদেশে থেকে যাওয়া বুদ্ধিমানেরই কাজ হবে। আমরা যখন ইউরোপে গিয়ে মেম বিয়ে করি তখন শাদা আর কালোর তফাতটা ওদেশে ওরা বড় দেখে না, কিন্তু সে-মেয়েই আমাদের দেশে এসে শাদা-কালোর তফাতটা যে কতখানি—তা প্রতিদিন দোকানে বাজারে রাস্তায় ক্লাবে দেখতে পায়। হিল্ডা ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের মেম্বার, অথচ ভারতীয় বলে আমার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। স্যাটার্ডে ক্লাবেও ওকে মেম্বার করিয়ে দিলাম। কিন্তু তখন স্যাটার্ডে ক্লাব ছিল শুধু শ্বেতাঙ্গদের, আমাদের কৃষ্ণাঙ্গদের নেওয়া হত না। ইদানীং অবিশ্যি স্বাধীন ভারতে এসব কড়াক্কড়িগুলি ভেঙে যাচ্ছে ক্রমে, কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে শাদাচামড়ার খাতির তোয়াজ এখনো বেশ কায়েম রয়েছে। দুশো বছরের দাসমনোভাব এত সহজে যায় না। মেয়ের নাম রেখেছি অনীতা, দার্জিলিঙে কনভেণ্ট স্কুলে পড়ে, ছুটিতে কলকাতায় এলে তার মা'র সঙ্গেই বেরোতে পছন্দ করে বুঝতে পারি। ছেলেটাকে এডিনবারায় ডাক্তারী পড়াচ্ছি, হয়তো আর এদেশে ফিরে আসবে না, আমি যেমন আমার বাবার মনে দুঃখু দিয়েছি, আমার পুত্র হয়ে সে-ই বা কেন আমাকে দুঃখু দেবে না? ভগবানের বিচারে সে-দুঃখু আমার পেতেই হবে জানি।"

হারীণদা বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কথাটা চাপা দিয়ে জিগগেস করলাম, "মাদ্রাজী মিসেস ফার্গুসনকে আপনি দেখেছেন?"

"দেখেছি। বাঙ্গালোরে একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিল। দেখতে ভালো নয়, কালো, মোটা, কিন্তু খুব হাসিখুশি, কথাবার্তাতেও সপ্রতিভ।"

"হারীণদা, প্রথম দিনই আমার মনে হয়েছিল ফার্গুসনের মাথায় বেশ ছিট আছে। না হলে ইণ্টারভিউয়ের সময় কাজের প্রশ্ন একটিও না করে কেবল বাজে কাব্য আলোচনা করল কেন?"

"মোটেই নয়। ওটা একটা চাল, লোকটি গভীর জলের মাছ। তোমাকে

ভুলিয়েই দিল যে তুমি ইণ্টারভিউ দিতে এসেছ, সেই সুযোগে ও খতিয়ে যাচাই করে নিয়েছে তুমি কতখানি জানো, কতটুকু শিখেছ, প্রশ্নের জবাবে কি ভাবে সমালোচনা করছ, কি রকম চটপটে তোমার মন, কতখানি মানসিক স্থৈর্য তোমার, সহজে এবং সোজাভাষায় তোমার চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পার, না বেশি বকবক কর। মোট কথা শুধু-চোখে ও তোমার মন ও মগজের আগাগোড়া একটা ফিল্ম তুলে নিয়েছিল।"

"যদি এত হিসেব করে কাজ করে তবে হঠাৎ একটি মাদ্রাজী বিয়ে করতে গেল কেন?"

"আকর্ষণ শক্তির নিয়ম। চুম্বক দেখেছ? দুটি চুম্বক যদি পরীক্ষা কর তবে দেখবে একটার পজিটিভ দিক আর একটার নেগেটিভ দিককে আকর্ষণ করছে, বৈপরীত্যের প্রতি অনুরাগ অনুরূপের প্রতি বিরাগ, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় অ্যাট্রাকশন বিটুইন অপোজিট পোলস, চুম্বকত্বের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-বেগ। অনেক প্রেমঘটিত বিয়েতেই দেখবে ছেলেটি সুপুরুষ, মেয়েটি বাঁদরীর মতো। অথবা মেয়েটি সুন্দরী, ছেলেটি বাঁদরের মতো। সাহেবরা ভারতীয় মেয়েদের খুব পছন্দ করে, আমরা মেমসাহেব কাছে পেলে গলে যাই। কাজেই আমাদের শাস্ত্রকাররা বিয়ের ব্যাপারটা ছেলেমেয়েদের বাপমায়ের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। চোখের মোহ বিচারশক্তিকে অন্ধ করে, যৌবন আরো অন্ধ। সাহেব-মেমদের দেশে ওরা বিয়েও করে চট করে, বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যাও তাই বেড়ে চলেছে।"

হারীণদা কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। ওঁর টেবিল থেকে সে বোতামের লাইন গেছে দরজার ওপরে বাইরের দিকে। বোতামটি টিপলে সেখানে জ্বলে উঠবে একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি, আওয়াজ হবে গাঁক-গাঁক-গাঁক, বেয়ারার ঘুম ছুটে যাবে, সে চলে আসবে।

"নয়া মেমসাবকো আনে বোলো।"

নতুন মেমসাহেব মলি টেভারেস। সে-ও ১লা এপ্রিল থেকে কাজে ভর্তি হয়েছে। বড় ভীতু স্বভাব, কিন্তু কাজে ভালো। আমি এখনো চিঠি মুখে বলে যেতে পারি না, খসড়া করে হারীণদার কাছে দিলে উনি কেটেছেঁটে দেন, তারপরে মিস টেভারেস টাইপ করলে উনিই সই করেন, শুধু চিঠির নিচে বাঁ পাশে থাকে আমার নামের একটা ছোট সঙ্কেত—কে. বি. এস্. পাশে মিস টেভারেসের নামের এম্. টি.।

হারীণদা কিন্তু গড়গড় করে চিঠি মুখেই বলে যান, চমৎকার ইংরিজী, চমৎকারভাবে গুছিয়ে সাজানো। কোথায় নতুন প্যারাগ্রাফ, কোথায় কমা, কোথায় সেমিকোলন, কোথায় ফুলস্টপ বসবে সেইসঙ্গে বলে যান, আমি কান পেতে শুনি। ওঁর ঘরে আমার বসবার জায়গা দিয়ে ভালোই করেছেন। উনি আপসোস করেন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ইংরিজী ভাষায় বড় কাঁচা. মাতৃভাষা বলে ব্যাকরণ ভালো শেখে না, অনেক কথার মানেই জানে না, বানান ভুল করে। ওঁর খুঁতখুঁতে স্বভাব, তাই একেবারে নির্ভুল না হলে চিঠি সই করেন না, আবার মিস টেভারেসের কাছে ফিরে যায় নতুন করে টাইপ করার জন্যে।

খানকয়েক চিঠি লেখাবার পরে হারীণদা বললেন, "এখন যেতে পার মলি, সদানন্দবেয়ারার হাতে ইনভয়েসের ফাইল পাঠিয়ে দাও মিস্টার সানিয়েলের কাছে।"

হারীণদা আমাকে বললেন, "ইনভয়েসের ফাইলটা এখন রপ্তানি-বিভাগে আছে, টেভারেসের খুঁজে বার করতে একটু দেরি হবে, ততক্ষণ তোমাকে একটা এই বিপরীতের প্রতি আকর্ষণের গল্প বলছি :

"আমাদের রংপুরে এক বামুনের ছেলে এক মেথরের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। তখন স্যানিটারি পাইখানার আবির্ভাব হয়নি, শহরেও খাটা-পাইখানা ছিল। কুলীন-বামুন মুখুজ্যে বংশধর মেথর-শ্বশুরের সহকারী হয়ে পাইখানা সাফ শুরু করতে শহরে দারুন হৈচৈ। প্রায় তিনশো লোকের সই-করা এক দরখাস্ত গেল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে, মোকদ্দমা রুজু হল সদর ডেপুটির এজলাসে। অভিযোগ এই যে ছেলেটিকে মেথররা ভুলিয়ে নিয়ে জোরজবরদস্তি করে মেথরকন্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সব মাটি করল ছেলেটা। সে হাকিমের কাছে হলফ করে বলল, সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে, কেউ জোর করে তার বিয়ে দেয়নি। কোর্টে লোকে লোকারণ্য, দাঙ্গা বাধবার আশঙ্কায় বন্দুকধারী একদল পুলিস পাঠিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব।

ছেলেটি সুশ্রী, একটু রোগাপটকা। হাকিমের সন্দেহ হল, হুকুম দিলেন, 'তিন নম্বর সাক্ষী সেই মেয়েটাকে নিয়ে এস।'

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল ঝানু লোক, আগেই প্রস্তুত ছিলেন, মেয়েটাকে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতে বললেন।

হাকিম ও কোর্টসুদ্ধ লোক অবাক। কালো, ট্যারাচোখ, রোগা, লম্বা। কেউ-কেউ মুখটেপাটিপি করে হাসতে লাগল।

হাকিম ছেলেটিকে জিগগেস করলেন, 'সত্যি তুমি একে ভালোবেসে বিয়ে করেছ?'

'হ্যাঁ ধর্মাবতার।'

'তুমি বামুনের ছেলে, পৈতে ছুঁয়ে বলতে পার?'

'হুজুর, পৈতে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি।'

'এ মেয়েটির চেহারায় তুমি এমন কি পেলে যার জন্যে ভালোবেসে ফেললে?'

'হুজুর, যদি আমার চোখদুটো দিয়ে দেখতেন তবে বুঝতেন ও কতখানি সুন্দর।'

ফলে মামলা ফেঁসে গেল।"

সদানন্দ বেয়ারা ফাইল নিয়ে এল।

"সদানন্দ, এ টেলিগ্রামটা বিলেতে যাবে, ডাকবাবুর কাছ থেকে আমার হিসেব থেকে টাকা নিয়ে যেও।"

সদানন্দ চলে গেলে হারীণদা বললেন, "এই সেই সদানন্দ মুখুজ্যে, যে মেথরানী বিয়ে করেছিল। রংপুর পাকিস্থানে চলে যাবার তিনবছর পরে সর্বস্ব খুইয়ে ও চলে এল কলকাতায়, আমার নাম ঠিকানা যোগাড় করে এসে পায়ে ধরে কেঁদে পড়ল, তাই পিওনের কাজে লাগিয়ে দিলাম এ-অফিসে, ওর প্রাণরক্ষাও হল আর বামুনজাতের মান রক্ষাও হল। কত বামুন তো আরো বেশি নেরশা কাজ করছে! হিন্দু সমাজ ওকে ত্যাগ করেছিল মেথরের কাজ করত বলে, আমাকেও ত্যাগ করেছিল মেম বিয়ে করেছিলাম বলে, তাই ওকে পায়ে ঠেলতে পারিনি। অথচ আগে কখনো ওকে দেখিনি, কাহিনীটাই শুধু শুনেছিলাম। ওর সেই মেথরানী স্ত্রী এখানে আমার বাড়িব বাসন মাজে, খাবার জল ভরে রাখে। ওদের ছেলেটা হয়েছে আশ্চর্য চালাক-চতুর, সেন্টজেভিয়াস স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, খরচাটা অবিশ্যি আমার।"

হারীণদা এবার ফাইলের ভিতর ডুবে গেলেন। আমি ইনভয়েস-ফাইলের গবেষণায় লেগে গেলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি মন আমার ফাইলে নেই, ভাবছি ডোরেন গ্রে-র কথা।

একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। অফিসের উঁচু মহলে হারীণ ঘোষালের খুব

খাতির। নিচের মহলে ঘোষাল-সাহেবের উপর তেমনি শ্রদ্ধা। একদিকে হাসিখুশি মিশুক লোক, অন্যদিকে বড্ড কড়া মনিব। কোনো অন্যায় অবিচার ভুলচুক উনি বরদাস্ত করতে পারেন না। দরকার হলে ফার্গুসন ও ফেদার্স্টোনকেও দুকথা শুনিয়ে দেন। একবার এক বুড়ো কেরানীবাবু কি একটা গলতি করে ফেদার্স্টোনের কাছ থেকে চাকরি যাওয়ার নোটিশ পেল। বেচারীর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কি কান্না। হারীণদা বাথরুমে যাচ্ছিলেন, ওকে ঐ অবস্থায় দেখে কাছে গিয়ে জিগগেস করলেন কি হয়েছে। বিধবা মা, স্ত্রী, চারটি সন্তান নিয়ে বেচারী পথে বসবে শুনে তিনি সোজা চলে গেলেন ফেদার্স্টোনের ঘরে। কেরানীবাবুরা কলম থামিয়ে, কান খাড়া করে, ও-ঘরে দারুণ তর্কবিতর্ক শুনল, কিন্তু কথাগুলো বোঝা গেল না। ঘোষাল-সাহেব বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যাবার পরেই ফেদার্স্টোনের হাঁড়িমুখ দেখা গেল বড়বাবুর টেবিলের সামনে। দুপুরের পর সবাই জানলে নোটিস বাতিল হয়ে গেছে। পরের দিন ফেদার্স্টোন সকালে তার অফিসঘরে ঢুকে দেখে প্রকাণ্ড এক ফুলের তোড়া। লেখা আছে তার সঙ্গে লাল সুতোয় বাঁধা এক কার্ডে—ফার্গুসন অ্যাণ্ড রবসন কোম্পানী লিমিটেড-এর কর্মীদের তরফ থেকে। সেদিন মধ্যাহ্নভোজের সময় ও ঠাট্টা করল হারীণদাকে, "হারীণ, তোমার জিত হল না আমার জিত হল বোঝা গেল না।" আমরা সবাই শুনেছিলাম ব্যাপারটা, সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগলাম।

তবে হারীণদার একটা ভারি বিশ্রী দোষ এই যে কাজের বেলায় কাউকেই বিশ্বাস করেন না, ওতে নিজের খাটুনিই বেড়ে যায় ওঁর।

বব্ ওয়ালেস, রামু ভেঙ্কট, জন আর্মস্ট্রং, ফ্রেডী নেভিল, বিনু সেনগুপ্ত, মিনু দিগলানী, কিষণ দুবে, জহর কোঠারী—এরা সবাই হারীণদার পরেই। আমি সবচেয়ে কনিষ্ঠ বলে খাবার টেবিলে এক সারির শেষের আসন পেয়েছি অন্য সারির জহর কোঠারীর মুখোমুখি। শুনেছি জহর কোটিপতির ছেলে, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে এমন দীনহীন যে মাঝে-মাঝে ধমক খায় ফার্গুসনের কাছে—জহর, তোমার সার্টটা পেতে কি এতক্ষণ বসেছিলে যে এত ভাঁজ পড়েছে? অথবা—জহর, তোমার পোশাক কদিন ইস্ত্রী হয়নি বল তো? জহর নির্বিকার।

খানাঘরে যাবার আগে সবাইকে টাই পরে যেতে হয়, যদিও নিজস্ব ক্যাবিনে সবাই টাই খুলে কাজ করে। জহর প্রায়ই টাই আনতে ভুলে যায়। তখন ওর

ভরসা জন আর্মস্ট্রং। জন প্রায়ই টাই বদলায়, তাই ওর ঘরে পাঁচ-সাতটা টাই ঝোলানোই থাকে।

একদিন দুপুরের খাবার পরে ফার্গুসন ফেদাস্টোন হারীণদা ওখানেই এককোণে কি একটা পরামর্শ করছিলেন সেই সুযোগে ওরা আমাকে ঘিরে ধরল।

বব্ জিগগেস করল, "কবে আমাদের খাওয়াচ্ছ বল তো? কেবল হারীণের ঘরে বাইবেল শুনলে জীবনে কি আনন্দ পাবে?"

ফ্রেডী নেভিল ফোড়ন কাটল, "কেবল কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে জীবন যৌবন ব্যর্থ হয়ে যায় ভ্রাতা।"

জন আর্মস্ট্রং আমার কাঁধে হাত দিল, "আমার ঘরে মাঝে-মাঝে যেও। কাজকর্ম কম আছে কদিন, দরজা বন্ধ করে ফক্সট্রট্, ওয়াল্জ্, ট্যাঙ্গো টুইস্ট, নাচ শিখিয়ে দেব। আনন্দ কর বন্ধু কাজের ফাঁকে-ফাঁকে।"

মিনু দিগলানী আমার কাঁধ থেকে আর্মস্ট্রঙের হাতটা ছুঁড়ে দিয়ে ধমকাল, "কি বাজে বকছ জন? ওর বাবা নাইট ছিল, ও উঁচু সমাজে মিশত, আর ভেবেছ ও নাচতে জানে না? তুমি একটা আস্ত ইডিয়ট।"

বিজু সেনগুপ্ত জিভ তালুতে ঠেকিয়ে স্স্স্-স্স্স্ শব্দের সঙ্গে দিগলানীকে চুপ করিয়ে দিল, বলল, "মিনু, তুমি আরো বড় ইডিয়ট, ইডিয়ট কথাটা বললে কেন জনকে? ওটা আনপার্লামেণ্টারি—লোকসভা বিধানসভায় চলে না।

কিষণ দুবে ছাড়ল না, বিজুকে বললে, "বিজু তুমি দেখতেও হোঁতকা বুদ্ধিতেও হোঁতকামার্কা, পার্লামেণ্টারি কথাটার মানে জানো?"

রামু ভেঙ্কটের মাদ্রাজী কথার টান এখনো যায়নি, বললে, "হি হু স্পিক্স লাস্ট-অ স্পিক্স্ বেস্ট-অ। টু ও ক্লক পাস্ট-অ।"

অক্সফোর্ড থেকে পাশ করে এসেও ওর খাঁটি মাদ্রাজী উচ্চারণ! এতদিন কলকাতায় আছে, বললেই হত বাঙলায় 'যে শেষে মুখ খোলে সে-ই বুদ্ধিমান, দুটো বেজেছে, চল যার-যার কাজে।'



১৩

পরের দিন খাবার ঘরে বব ওয়ালেস ফিসফিস করে কথাটা আবার পাড়লে, "চার মাসের ওপর আমাদের সঙ্গে কাজ করছ, কবে আমাদের ভোজ দিচ্ছ বল কাঞ্চন?"

বুড়ো কর্তারা খেয়ে চলে গেলে আর সবাই আমাকে ছেঁকে ধরল।

মিনু দিগলানী প্রস্তাব করল, "সামনের রবিবার ডিনারে তোমাদের কারো অসুবিধে আছে? যদি কারো কোনো এনগেজমেণ্ট থাকে তবে বাতিল কর কাঞ্চন সানিয়ালের প্রথম পার্টির খাতিরে। কি, কাঞ্চন তুমি যে কোনো কথা বলছ না? তোমার নিজের কোনো অসুবিধে আছে ডিনার দিতে?"

কি আর করি। বললাম, "বেশ, ডায়মণ্ড নাইটক্লাবে, এই রবিবারই হোক।"

জহর কোঠারী আর ফ্রেডী নেভিল একযোগে চেঁচিয়ে উঠল, "হুররে ফর কাঞ্চন, আমরা সবাই ভোট দিচ্ছি।"

জন আর্মস্ট্রং হাত তুলে সাবধান করে বললে, "ভোট দেবার আগে মনে রেখ চাবিকাঠি আমার হাতে। কি করে ছুটির দিন রাত্রে তোমরা ডায়মণ্ড নাইটক্লাবে পৌছবে যদি আমি দয়া করে গাড়িগুলোর গেটপাশ, ড্রাইভারদের ওভারটাইম মঞ্জুর না করি?"

কিষণ দুবে জন-এর পিঠে এক চাঁটি মেরে মুখ ভেঙচে বলল, "ব্ল্যাক সীপ, ব্ল্যাক সাক আর্মস্ট্রং, শনিবার গাড়ি কেউ ফিরিয়ে দেবেন, করবে তুমি কচু।"

ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেণ্ট-এর গাড়িগুলো আর্মস্ট্রং-র এক্তিয়ারে। আগে নাকি সবাই একটি গাড়ি পেত রাত-দিনের জন্য। কিছুদিন হল কেদার্স্টোন খরচা বাঁচাবার জন্যে নিয়ম করেছে জোর সন্ধ্যেয় যার-যার বাড়ি পৌছে দিয়ে গাড়িগুলো অফিসের গ্যারাজে ফিরে আসবে, অসময়ে কারো কোনো দরকার থাকলে জন আর্মস্ট্রংকে বলে গাড়ির 'পাশ' নিতে হবে। গোটা-দুই গাড়ি বিক্রি করতে দেওয়া হয়েছে, তাই গাড়ির সংখ্যাও এখন কম, সবার ভাগে একটি জোটে না।

জন আর্মস্ট্রং আবার হাত উঁচু করে ঘোষণা করল, "রাজী হচ্ছি না কিছুতেই। কাঞ্চন আমাদের নেমন্তন্ন করল কিন্তু আমাদের গিন্নীদের বলেনি, ওহে সব স্বার্থপর পুরুষ, তোমাদের আর কি বলব? ডায়মণ্ডে ভালো নাচ চলেছে, 'ব্রেজিলিয়ান বিউটি'র নাচ, আমাদের স্ত্রীরা বাদ যাবে কেন?"

বললাম, "ঠিকই বলেছ জন, তাঁরা বাদ যাবেন কেন? তাঁরা সবাই যেন আসেন, আমি টেলিফোন করে দেব আজই, চল তোমার ঘর থেকেই ফোন করি, ঘোষালের ঘর থেকে নয়। তবে আমি অবিবাহিত, হংস মধ্যে বকের মতো শোভা পাব। আর একটা কথা, আমি একা-একা মানুষ হয়েছি, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গুলিয়ে যাই, তাই যদি কোনো বেকুবি করে বসি তবে শ্রীমতীরা যেন দয়া করে আমাকে ক্ষমাঘেন্না করে বরদাস্ত করেন।"

অফিসে কে কি করছে, কে কি বলছে, গোপন রাখা মুশকিল। টাইপিস্ট মেয়েগুলো এর কাছ থেকে সে, তার কাছ থেকে ও, ওর কাছ থেকে আর একজন, জেনে ফেলে। এদের গার্ল না বলে, বলা উচিত গুপ্তচর, স্পাই। জন-এর ঘর থেকে ফোন করছিলাম শ্রীমতীদের, তখন জন-এর গার্ল মিস ক্রফোর্ড বার দুই কি সব কাগজপত্র নিয়ে তার কাছে এসেছিল, খবরটা যে ইতিমধ্যেই এ-কান ও-কান হয়ে পড়েছে তা বুঝলাম যখন আমার টেবিলে ফিরে গেলাম।

"কি হে কাঞ্চন, এত দেরি যে?"

"জন আর্মস্ট্রং-এর ঘরে একটু কাজ ছিল।"

শুনলাম মিস্ টেভারেস হারীণদার কাছে সকাল বেলার টাইপ-করা চিঠিগুলো দিয়ে গেছে, আমার ফিরতে যে একটু দেরি হবে তাও আভাস দিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে ঘোষালসাহেব শ্লেষ করলেন, "কাঞ্চন, তোমাকে যে হিসেবটা দিতে বলেছিলাম তা তো দিলে না? মন তোমার কোথায় পড়ে আছে বল তো?"

বুঝলাম মিস্ টেভারেস ডিনার পার্টির কথা বলে গেছে হারীণদাকে! মেয়েদের পেট আলগা, মিস ক্রফোর্ডের কাছে যা শুনেছে তা বলে গেছে।

হারীণদা হাসতে-হাসতে আবার ব্যঙ্গোক্তি করলেন, "ভায়া, তুমি গুরুভক্তি শেখনি। একলব্য ডান হাতের বুড়ো-আঙুল কেটে দ্রোণাচার্যকে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিল, মহাভারতে পড়েছ? শিষ্য আরুণী সারারাত ঠাণ্ডায় শুয়ে থেকে ধানক্ষেতে বানের জল রুখেছিল। আর তুমি তোমার শিক্ষাগুরু আমাকে না জানিয়ে আর সবাইকে

সস্ত্রীক ডিনারে নেমন্তন্ন করলে, এটা কি ঠিক করেছ? ফার্গুসন ও ফেদার্স্টোনদেরও বলা উচিত।"

লজ্জা পেলাম। বললাম, "ঐ ছেলেছোকরাদের দলে কি আপনাদের ভালো লাগবে?"

"তোমাকে তো আরও একদিন বলেছিলাম, বয়েসের মাপকাঠি ভুলে যাও। একই বৈঠকে সবাইকে বলে ফেল, নইলে দোকর হাঙ্গামা আর খরচা। তোমার প্রথম পার্টি যাতে ভালো মতো হয়ে যায় সেটা আমার আর হিলডারই দেখতে হবে, যাও ফার্গুসন আর ফেদার্স্টোনকে বলে এস, আমি হিলডাকে ফোন করছি। আরো কয়েকটা কথা বলছি শুনে যাও। নেভিলের স্ত্রী এককালে ওয়ালেসের স্ত্রী ছিল, কেলেঙ্কারিটা সব তোমার জানবার দরকার নেই, ফার্গুসন ব্যাপারটায় এতই চটে গিয়েছিল যে নেভিলের চাকরি যায়-যায়, ওয়ালেসই বলে কয়ে তাকে শান্ত করল। ওয়ালেস মহাপ্রাণ ব্যক্তি, শেষে ও পাঞ্জাবী মেয়ে বিয়ে করেছে, মেয়েটি সুইজারল্যাণ্ডে মানুষ, খুব মার্জিত। ভেঙ্কটের স্ত্রী দেখবে খুব গোবেচারা, ইংরেজী ভালো বলতে পারে না, মিশতে পারে না লাজুক বলে, স্বামীকে বাগে রাখতে জানে না, তাই ব্যাটা স্মার্ট মেয়েদের পেছনে ছোটে। দিগলানীর স্ত্রীকে দেখবে একটি রঙিন পুতুল, পুরুষঘেঁষা, আলাপ হলে হয়তো প্রায়ই তোমাকে বাড়িতে ডাকবে, যতদূর পার এড়িয়ে যেও। তোমার ও দিগলানীর মধ্যে এ-নিয়ে যেন কোনো মনকষাকষি না হয়। ফার্গুসনের স্ত্রীর কথা আগেই বলেছি, ফেদার্স্টোনের স্ত্রী বৃদ্ধা। রবিবার আধঘণ্টা আগেই আমার লাউডন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে চলে এস, হিলডার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। তোমাকে ডিনার স্যুটের অর্ডার দিতে বলেছিলাম, সেটা এনেছ?"

"হ্যাঁ, হারীণদা সে-সব ঠিক আছে।"

রবিবার সন্ধ্যের পরেই লাউডন স্ট্রীটে হারীণদার ফ্ল্যাটে হাজির হলাম। দরজায় লেখা আছে এইচ. ঘোষাল, পাশেই কলিং বেলের শাদা বোতাম। সেটা টিপতেই বেয়ারা এসে ড্রইংরুমে নিয়ে বসাল। আমার ঘোশেকের মতো জামাকাপড় পরা নয়, শাদা ধবধবে প্যাণ্ট ও শাদা কোট-পরা বেয়ারা, সেলাম ও আদবকায়দায়েও দোরস্ত।

ড্রইংরুমটা বেশ বড়। সাজানোও পরিপাটি। বড় সবুজ গালচে, সবুজ পর্দা,

সবুজরঙের সোফাসেটি, ঘরের রঙও সবুজ। শ্বেতাঙ্গিনী গৃহকর্ত্রীর হাতের ছাপ খুব স্পষ্ট।

পাশের দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি যে হারীণদার স্কটিস মেমসাহেব তা কেউ না বললেও বোঝা যায়। উঠে দাঁড়াতেই তিনি দুই-হাতে নমস্কার জানালেন, "মিস্টার সানিয়াল?" পরিষ্কার বাঙলা উচ্চারণ। শাদা বেনারসী শাড়ির সঙ্গে শাদা জর্জেটের ব্লাউজ, সপ্রতিভ, কিন্তু মুখে কোনো লালিত্য নেই। নকরদা একদিন বলেছিলেন মানুষের মনের ছবি মুখে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু এই ফিকে চুল, খটখটে শাদা রঙ, ফিকে চোখের মধ্যে মমতাময়ী দরদীমনের প্রতিচ্ছায়া কোথায়? হারীণদা কি দেখে একে ভালোবেসেছিলেন? এর কোন আকর্ষণে ধর্ম, সমাজ ও পিতৃমাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়েছিলেন? বিপরীতের আকর্ষণ?

"একটু হুইস্কি আনতে বলি? স্কচের মতো আর কোনো পানীয় নেই।"

"না, মিসেস ঘোষাল, ধন্যবাদ।"

"খাও না মোটেই?"

"মাঝে-মাঝে খাই, খুব ভক্ত নই।"

"জিন অ্যাণ্ড বিটার্স?"

"তাও না।"

"লেবুর রস?"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন।"

ঘোষালমেমসাহেবের নখে লাল পালিস, ঠোঁটে রঙ, আঁকা-ভ্রূ, দেখে আমার মায়ের রঙচঙ্-বিবর্জিত সৌম্য শান্ত মাতৃমূর্তি মনে পড়ল। এ-দেশের আর ও-দেশের মধ্যে কি দুস্তর ব্যবধান!

হারীণদা এলেন।

"মাপ কর কাঞ্চন, তোমাদের পরিচয় করে দেওয়া হয়নি, ইনিই মিসেস ঘোষাল।"

ঘোষালমেমসাহেব হেসে উঠলেন। সভ্য ধরনের হাসি, হাসিখুশি দেখাবার চেষ্টায় হাসি। মাপাজোখা হাসি। এ-হাসির সঙ্গে প্রাণের কোনো ছোঁয়া নেই মনে হল।

"আলাপ করিয়ে দেবার আগেই আলাপ হয়ে গেছে, ডার্লিং!"

ভিতরের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল, হারীণদা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

"তোমার মা আছেন মিস্টার সানিয়াল?"

"মিস্টার সানিয়াল বলবেন না দয়া করে। আমার বয়স যখন সাত বছর তখন মা মারা যান। আমার নাম কাঞ্চন।"

"ভাইবোন কটি?"

"ও-দিকটাও ফাঁকা।"

হারীণদা ফিরে এসে বললেন, "কাঞ্চনের এই প্রথম পার্টি, হিলি। জমানোর ভারটা তোমাকেই নিতে হবে।"

কলিং বেল বেজে উঠল। বেয়ারা ছুটে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখা গেল জন আর্মস্ট্রংকে।

"গুড ইভিনিং এভরিবডি। একটু মুশকিলে পড়েছি। আমার নিজের জন্যে কোনো গাড়ি নেই, বলতে ভুল হয়ে গেছে। মিসেস ঘোষাল, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না তো আমাকে নিতে?"

মিসেস ঘোষাল একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, আর একটা আর্মস্ট্রংকে দিয়ে বললেন, "কি বাজে বকছ, ড্রাইভারকে আসতে বলিনি, আমিই গাড়ি চালাব, সুতরাং গাড়িতে বেশ জায়গা থাকবে। বার্বী যাবে কার সঙ্গে?"

বার্বী মানে বার্বারা, আর্মস্ট্রং-এর মেমসাহেব।

"যদি ট্যাক্সি পায় ভালো, না পেলে হণ্টন দেবে। ও চান করতে গেছে, তারপরে সাজতে-গুজতে ঝাড়া একঘণ্টা। আগেই বেরিয়ে পড়েছি।"

"ভারি কাঠখোট্টা তুমি, জন, আমি ফোন করে দিচ্ছি, আমরা ওকে তুলে নিয়ে যাব।"

"ধন্যবাদ হিলডা, তার আগে একগ্লাস ঠাণ্ডা বিয়ার পেতে পারি? বড্ড গরম ছুটেছে।"

ঘোষালমেমসাহেবের মিহিগলার আহ্বানে বেয়ারা চলে এল, এবং হুকুমদারীতে দু বোতল বিয়ার নিয়ে এল। তিনটে গ্লাসের জায়গায় দুটো গ্লাস আনায় ঘোষালপত্নী এমন বিশ্রী ধমক দিলেন যে আমার ভালো লাগল না। টাকার বদলে মানুষ মানুষকে এভাবে দাঁত খিঁচুবে কেন? আমাদের নাগপুরের বাড়িতেও তো বয় বাবুর্চি বেয়ারা ড্রাইভার একদল ছিল, কিন্তু বাবা আর মা কি মিষ্টি ব্যবহার করতেন তাদের সঙ্গে! বুড়ো বাবুর্চিকে আমি দাদু বলে ডাকতাম, ড্রাইভারদের

মামা, বেয়ারাকে দাদা, মালিকেও কাকা। মালিকে একদিন নাম ধরে ডেকে বকে ছিলাম, মা খুব ধমক দিলেন, "ওরা পেটের দায়ে কাজ করছে বলে তুমি ওদের ওপরে চোপা চালাচ্ছ? কোথায় শিখলে এটা? আমাদের কাছে তো নয়!"

হয়তো চাকরবাকরদের প্রতি এই রূঢ় ব্যবহার ঘোষালমেমসাহেবের শাসক-জাতিগত নেটিভদের প্রতি অবজ্ঞার ফল। এবং হয়তো এটা হারীণদার স্নেহান্ধ চোখে মোটেই পড়েনি। একই মানুষ, একই জিনিস, ভিন্ন-ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়।

নফরদা এই বহুরূপী জগৎটাকে একদিন ভারি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আকাশের সঙ্গে তুলনা করে: "বুঝলি কাঞ্চন, ঐ আকাশটাকে আমাদের ঋষিরা বলেছেন 'শূন্য' অর্থাৎ যা ধরা যায় না, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, যেখানে কোনো অবলম্বন নেই। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু যন্ত্র দিয়ে দেখলেন ওটা স্রেফ শূন্য নয়, ওখানে শব্দতরঙ্গ আলোকতরঙ্গ জীবাণুতরঙ্গ মাধ্যাকর্ষণতরঙ্গ রয়েছে। তাঁরা ওটার নাম দিলেন ব্যোমতরঙ্গ বা 'ইথার'। বিংশশতকের বৈজ্ঞানিকেরা আরো সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ ও মহাকাশের পদার্থতত্ত্ব রসায়নতত্ত্ব জৈবতত্ত্ব গ্রহতত্ত্ব অক্ষতত্ত্ব গবেষণা করে ওটার নাম দিলেন কো-ডাইমেনশনাল কোয়ান্টাম, বিভিন্ন শক্তিধারার বিভিন্ন গতিবেগের আদি-অন্তহীন স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে এক সু-সংবদ্ধ ঐক্যের বন্ধনে। এবং এজন্যেই বিশ্বজগত ঘাতপ্রতিঘাতে ছাতু-ছাতু হয়ে যাচ্ছে না। ঐ শূন্যের ভিতরেও বায়ুস্তরের অবলম্বনে উড়োজাহাজ, মহাকাশযান ওরা চালাচ্ছে। আবার ধর একই লোককে কেউ ডাকছে বাবা, কেউ ডাকছে ভায়া, কেউ ডাকছে ওগো। ওকে কেউ ভক্তি করছে, কেউ স্নেহ করছে, কেউ ভালোবাসছে। তা হলে দেখ এক-একজনের কাছে ঐ একই ব্যক্তির এক-এক রকম রূপের প্রকাশ। এ-রূপ বাইরের রূপ নয়, ভিতরের রূপ। আবার রূপ ও রুচির বাজারেও রকমারি খদ্দের, রকমারি চাহিদা। কেউ শ্যামবর্ণ রঙ ভালোবাসে, কেউ খুব ফরসা ভালো-বাসে। কেউ চোখা নাক পছন্দ করে, কেউ ঢলঢলে মুখ পছন্দ করে। কেউ খুব পাতলাসাতলা গড়ন চায়, কেউ নিটোল গড়ন পছন্দ করে। সকলের চাওয়া এক রকম হতে পারে না, যার চোখে যেটা ভালো লাগে তার মন তাতেই মজে যায়।"

হয়তো হারীণদা নিজে শ্যামবর্ণ বলে খুব ফরসা রঙ দেখে ভুলেছিলেন? ফার্গুসন-বুড়ো সাহেব হয়েও কালো রঙে ভুলল?



১৪

পার্টিটা যে বেশ তাড়াতাড়ি জমে উঠল সে-বাহাদুরি অনেকটা মিসেস ঘোষালের।

সুরার একটা গুণ এই যে সন্ত-সন্ত পেটে গেলে মনের দুয়ার খুলে যায়। কারো গেলাস যাতে অনেকক্ষণ খালি না থাকে তার দিকে উনি প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন। মহিলাটি সুরসিকাও বলতে হবে, মজার-মজার টিপ্পনি কেটে সবাইকে হাসাচ্ছিলেন খুব। সেই ফাঁকে-ফাঁকে আমার ভুলচুকগুলোর প্রতিও আমাকে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছিলেন, যেমন :

"—মেয়েদের সঙ্গে কথা বলছ না যে বড়, ঘাবড়াবার কিছু নেই, মিসেস ফাগু'সনের কাছে এগিয়ে বস।"

অথবা—"ওদিকে মিসেস ভেঙ্কট একেবারে চুপটি করে বসে আছে, ওর চেয়ারটা কাছে সরিয়ে আনো।"

অথবা—"মিসেস দিগলানী সিগারেট খাওয়ার জন্যে হাঁসফাস করছে, যাও সিগারেট দিয়ে এস, ধরিয়ে দিও কিন্তু।"

অথবা—"বুড়ো ফাগু'সন ককটেল সসেজ খুব ভালোবাসে, প্লেটটা চালান কর ওর দিকে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এটা আমার প্রথম বড় পার্টি বলেই হোক, অথবা এতগুলি মেয়েদের সান্নিধ বলেই হোক, সত্যিই বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। তান্ত্রিক সাধনার পঞ্চ 'ম'-কারের মধ্যে শুধু একটু-আধটু মদ্যপানই আমার কখনো-সখনো অভ্যাস আছে একটি মাত্র ছোট পেগ জিন-অ্যাণ্ড-বিটার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম, কেন না সেটা খালি হলেই চারিদিক থেকে হুকুম ও খবরদারি আসবে—আর একট খাও, আউর একঠো লে আও বয়, ওহি সাহাব কা ওয়াস্তে। মেয়েরা সবা হুইস্কি খেলেন, এবং বেশ ঘন-ঘন তাঁদের গেলাস খালি হতে লাগল। এটা আমা কাছে একটা আশ্চর্য ব্যাপারই বটে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই বুঝে ফেলেছিলাম বুড়ো কার্গুসন কেন এই মাদ্রাজী মহিলাটিকে বিয়ে করেছে। প্রখরবুদ্ধিশালিনী, কথাবার্তা ও ব্যবহারে ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকত্ব সুস্পষ্ট, অক্সফোর্ড উচ্চারণ, বইও খানকয়েক লিখেছেন শুনলাম। গায়ের রঙ কালো হলেও প্রসাধন-যোগে পটপরিবর্তন করার প্রয়াস নেই, শাদা শাড়ি-ব্লাউজ। এতেই ভালো মানিয়েছে।

ওঁর উল্টোটি হচ্ছে মিসেস দিগলানী। সেজেছে যেন একটি রঙিন প্রজাপতি। পার্টি জমাতে সেও মিসেস ঘোষালের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। সুন্দর মুখের যে সর্বত্র জয় সে আত্মপ্রত্যয় ও জয়লিপ্সাটাও এর বেশ আছে মনে হল।

মিসেস ভেঙ্কট শাদাসিধে গোবেচারী। টকটকে নীল শাড়ি ও লাল ব্লাউজ পরে এসেছে। নাকের হীরের ফুলটি জ্বলজ্বল করছিল, যেন মোটরের হেডলাইট। খুব স্মার্ট নয় বলে ওর স্বামী ওকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, পার্টিতে না আসলে চলে না বলে বাধ্য হয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসে মাত্র।

মিসেস নেভিল, হারীণদা বলেছেন, এক সময় ওয়ালেসের স্ত্রী ছিল। বেশ দেখতে, ওয়ালেসের সঙ্গে হেসে-হেসে দু-একটা কথাও বলল, কিন্তু ওয়ালেসের এখনকার পাঞ্জাবী স্ত্রীটি স্বামীর পূর্বপরিণীতা এ-মেমসাহেবটির সঙ্গে একটিও কথা বলল না, সেটা লক্ষ্য করলাম। পাঞ্জাবী মেয়েটি একটু লাজুক ধরনের, চোখা নাখ, ছোট-ছাঁট চুল, হাসলে খুব মিষ্টি দেখায়। মিসেস দুবের মুখ একেবারে আলুর মতো গোল, গালে টোল খায় হাসলে, চুল কোঁকড়া, পিঠ-খোলা ব্লাউজ। মিসেস কোঠারী খুব লম্বা, সুর্মা-আঁকা চোখ এবং লিপস্টিকরঞ্জিত ঠোঁটের মাঝ-খানে উপরোষ্ঠে একটি গোঁপের রেখা আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজু সেনগুপ্তের স্ত্রী মদনপল্লির যক্ষ্মা হাসপাতালে, তাই অনুপস্থিত। আর্মস্টং-এর মেমসাহেবকে দেখে একটু হতাশই হলাম, আমস্ট্রং নিজে খুব আমুদে লোক, স্ত্রীটি মোটেই হাসিখুশি নয়, বয়সেও বোধহয় বড়। মিসেস কেদাস্টে'নকে যেমনটি দেখব আশা করেছিলাম, ঠিক সেরকমই দেখলাম—বিগতাযৌবনা প্রৌঢ়া শ্রীবিবর্জিতা শুষ্ককাষ্ঠসমা। হঠাৎ ডোরিন গ্রের কথা মনে এল, তাকে খাইয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

শাদা জাতের একটা বড় গুণ এই যে অফিসের বাইরে ছোট-বড় কোনো ভেদ রাখে না। স্ত্রী জাতির খাতিরও এদের কাছে খুব বেশি। তেমনটি আমাদের নেই। বড়সাহেব থেকে একেবারে ছোটসাহেব সবাই যেন এক-দানের কড়ি, বাইরের লোক

বুঝবে না কে ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আর কে সর্বকনিষ্ঠ অ্যাসিস্টান্ট। ফার্গুসন মাথা নিচু করে যে-রকম সব মিসেসদের স্বাগত জানাল তা দেখে একটু অবাক হলাম। শুনেছি স্বাধীনতা পাবার আগে লাঞ্চ, ককটেল, ডিনারে শাদায়-কালোয় এত মেলা-মেশা চলত না। ফেদার্স্টোন দাঁড়িয়ে উঠে প্রত্যেকটি মিসেসের হাতে গেলাস এগিয়ে দেওয়া, আলু ভাজা আর সসেজ এগিয়ে দেওয়া, সিগারেটের টিন এগিয়ে দেওয়ার হুঁসিয়ারিতে ব্যস্ত। হারীণদা, বব, ডিক, জন, দিগলানী, দুবে, বিজু, সবাইকেই দেখলাম পার্টির আদব-কায়দায় পাকা। নিজের আনাড়ীপনা আর কাউকে বুঝতে না দিলেও মনে খচখচ করতে লাগল।

প্রায় দশটা বাজে দেখে মিসেস ঘোষাল আমার কানে-কানে বললেন, "এখন খানা শুরু করিয়ে দাও, ওরা তো একটার পর একটা গেলাস এখনো খেয়ে চলেছে। তোমার টাকা যদি কম পড়ে, আমাকে বোলো, আমি বেশি কিছু সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

বললাম, "না, মিসেস ঘোষাল, দরকার হবে না বোধ হয়, ধন্যবাদ।" সুরা-সরবরাহের বয়রা তখনো আমাদের টেবিলের পাশে ঘুরঘুর করছে, যত লম্বা বিল হবে, তত বেশি ওদের বকশিশ। বারের স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে বিল নিয়ে এসে ওদের কেউ-কেউ যে হাতসাফাইয়ের মারপ্যাচে কিছু বেশিও আদায় করে না এমনও বলা যায় না। মিসেস ঘোষাল ওদের চোখ ইশারায় জানিয়ে দিলেন আর দরকার নেই।

অর্দোভ আর সুপ শেষ হতেই নাচের পর্ব শুরু হল। মনে একটু খটকা ছিল এতক্ষণ, কিন্তু 'ব্রেজিলিয়ান বিউটি' যে ডোরিন গ্রে নয় সে-বিষয়ে এখন নিশ্চিন্ত হলাম। মেয়েটি তিনরকম সাজে তিনটি নাচ দেখাল—ব্রেজিলিয়ান 'হেট্রোয়া,' রাশিয়ান 'পল্‌কা,' এবং হাওয়াই দ্বীপের 'স্যামোয়া।' তিনটিই ভারি চমৎকার, আমার অতিথিরা খুশি। এক-একটা নাচ শেষ হয়, আর বিরাট হলটি যেন করতালিতে ফেটে যাবার উপক্রম।

একজন খানসামা আমার হাতে একখানা কাগজ দিয়ে গেল। জন আর্মস্ট্রং লিখেছে—সখা, একসঙ্গে আনন্দ পাওয়া ও আমাদের আনন্দ দেবার জন্যে তুমি স্বর্গরাজ্যের দিকে এক সিঁড়ি উঠে গেলে, সে-হিসেবে তোমার খরচাটা কিছুই নয়। কবে আবার আনছ এ-আনন্দধামে?

ফ্রেডী নেভিলের কাছ থেকে আর এক টুকরো কাগজ আর একজন বয় এসে আমার হাতে দিল—মিসেস দিগলানী তোমার সম্বন্ধে কি বলেছে জানো?—বলেছে তোমার নাকি ক্লাসিকাল চেহারা, গ্রীকদেবতা 'এরস'-এর মতো। সাবধান, ওর স্বামীকে বলো না।

খাবার টেবিলটা ছিল লম্বা, তাই ওরা আমার বেশ দূরে বসেছিল।

খানার অর্ডার দিয়েছিলাম আ-লা-কার্ট মেনু থেকে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে সেদিনকার সাধারণ ডিনারের একটা মেনুকার্ড ঘুরতে-ঘুরতে আমার কাছে এসে পৌছল, দেখি আর সবাই সই করে দিয়েছে। বুঝলাম এটা ভেঙ্কটের চাল, আমার প্রথম ডিনার পার্টির 'সুভেনির,' স্মৃতিপত্র।

মিসেস ওয়ালেস জিগগেস করল, "তুমি বাইরে কোথায়-কোথায় গেছ?"

বুঝতে পারলাম 'বাইরে' কথাটার মানে ভারতের বাইরে। হারীণদার কাছে শুনেছিলাম এ পাঞ্জাবী মেয়ে হলেও সুইজারল্যাণ্ডে মানুষ হয়েছে। জবাব দিলাম, "বাইরে কোথাও যাইনি এখনো।" ও তখন আমাকে ব্রেজিলিয়ান বিউটির নাচগুলোর অনেক নিগূঢ় ভাবভঙ্গীর টেকনিকাল বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিতে লাগল। তখন মনে হল ব্যালে নৃত্যের এ একটি সমঝদার ব্যক্তি। পরে শুনেছিলাম জিনিভার আঁতেতু অ-ব্যালে ইণ্টারন্যাশিওনেলে রীতিমতো নাচ শিক্ষা করেছে। ব্যালে নাচে দেহাবরণের স্বল্পতার বিষয়ে একটু অভিযোগ তুলতেই মহিলাটি আমাকে থামিয়ে দিল, "না, মিস্টার সানিয়াল, আর্টের চোখ দিয়ে যদি দেখ তবে ভঙ্গীটাই চোখে পড়বে, দেহটা দেহ বলেই মনে হবে না।"

সকলে বিদায় নিলে হারীণদার গাড়িতেই বাড়ি ফিরলাম। মিসেস ঘোষালকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বাড়ির গেটের সামনে পা বাড়িয়েছি, অন্ধকার থেকে যেন মাটি ভেদ করে সুলতান মিঞা এসে সেলাম দিয়ে জানাল মুন্নাদি পাঠিয়েছেন, এণ্টনীদার হঠাৎ খুব অসুখ।

হাতঘড়ি চকচক করছে। দেখলাম একটার ঘরে দুটো কাঁটাই এসে ঠেকেছে, মানে একটা বেজে পাঁচ মিনিট। ভাবলাম ওর সঙ্গে এত রাতে যাওয়া কি ঠিক? সত্যি কথা বলছে, না কোনো ফাঁদ পেতেছে? এই তো গত রবিবারও মুন্নাদির বাড়ি গিয়েছিলাম, জন এণ্টনীকে তো বেশ ভালোই দেখলাম?

সুলতান মিঞার কথায় চমক ভাঙল, "বাবু সাহেব খানাপিনার জলসায়

গিয়েছিলেন ? কিন্তু পোশাক না ছেড়েই জলদি আসতে পারলে আচ্ছা হয়, মুন্না-বেগম বহুৎ ঘাবড়ে গেছে। আইয়ে আমার সোঙ্গে, ট্যাক্সী মিল যাবে জরুর।”

পথঘাট নির্জন, রাতের অন্ধকার হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বিরাট শহরটার ওপর। বাড়িঘরের আলো নিভে গেছে, রাস্তার গ্যাসলাইটগুলোর শীর্ণালোকে অন্ধকার যেন আরো বীভৎসভাবে দাঁত বার করে আছে, কারণ গ্যাসের সরবরাহে নাকি সঙ্কট উপস্থিত। ডায়মণ্ড রেস্টরান্টের আলোকের উজ্জ্বলতা ও প্রাণের উচ্ছ্বাস-মুখরতার পরে এই নির্জনতা ও অন্ধকার যেন এক প্রেতপুরীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস। এ গুণ্ডা মুসলমান আমাকে মুন্নাদির নাম করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? বড় রাস্তার দিকে তো নয় ? একটা সরু এঁদোগলির দিকে মনে হচ্ছে ? কিন্তু কিছু ঠাওর হচ্ছে না। দাঁড়িয়ে পড়লাম।

“ডর লাগছে বাবুসাহেব ? সুলতান মিঞাকে ভোয় না করে এমন বদমাস আদমী এ-তল্লাটে নাই। আমার সোঙ্গে থাকলে আপনাকে কেউ কিছু করতে পারবে না বুঝে লেবেন। আপনার হাতটা আমার হাতে দিন বাবুসাহেব, কুছু ভোয় নাই। আমি যদিভি কাছেও না থাকি তবে কোনো গুণ্ডার হাতে পড়লে হামার নাম বলবেন এ-তল্লাটে। দেখবেন আপনাকে সেলাম করে ভাগিয়ে যাবে। এণ্টালী মহল্লায় এমুন কোনো মরদের বাচ্চা মরদ ছুরি নিয়ে বেড়ায় না যে, আমাকে ওস্তাদ বলে ভোয় করে না। আপনি বাবুসাহেব মুন্নাবেগমের ধরমভাই, আপনার জান বাঁচানোর জিম্মেদারি হামার।”

সুলতান মিঞা আমার হাত ধরল, আর এক হাতে প্রায় আমাকে বুকের ভিতর জড়িয়ে নিয়ে চলল। ও হয়তো টের পেয়েছিল যে আমার পা কাঁপছে। ওর কোমরে লুঙ্গির নিচে একটা বড় ছুরির ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগছিল আমার গায়ে। ভাবলাম এই দুশমনের সঙ্গে এই পদযাত্রাই হয়তো আমার জীবনের শেষ অধ্যায়। মা-বাবাকে মনে পড়ল ; নফরদা, হারীণদা, মুন্নাদি, ম্যাক, ডোরিন, মল্লিকমশাই সবাই হয়তো ভাববে কাঞ্চন সানিয়ালের শেষমেষ কি হয়েছিল ? আমি যেন প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

হঠাৎ কানে এল, “উঠ্‌ উঠ্‌ শালা রুমহৎ, সরাব পিয়েছিস ? জলদি উঠ্‌, শালা হারামী। এই বাবুসাহেবকে মুন্নাবেগমের কাছে লিয়ে যাচ্ছি, বহোৎ জরুরী, উঠ্‌ শালা উঠ্‌। জোরসে চালা হাওয়াই জাহাজকে মাফিক।”

মুন্নাদি আমাকে দেখে হাত ধরে কেঁদে ফেলল, "ওঁকে বাঁচা কাঞ্চন, আমার যে আর কেউ নেই? এত রাতে ডাক্তার পেলাম না, তাই তোকে কষ্ট দিলাম।"

নাগপুরে সেন্টজনস্ অ্যাম্বুলেন্স কোরে-এ লেফটেনেন্ট ছিলাম। ডাক্তারির ছোটখাটো কতগুলো ব্যাপার তখন শিখতে হয়েছিল। কোট টাই খুলে সার্টের আস্তিন গুটিয়ে রুগীর কাছে এগিয়ে গেলাম। "কি হয়েছিল এন্টনীদার আগে বল তো মুন্নাদি? পেটটি তো বেজায় ফেঁপে উঠেছে দেখছি, তাই অত ছটফট করছেন, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, হার্টে বায়ুর চাপ লেগে।"

যে-নারীকে মিনিটখানেক আগে অত অসহায় ভাবে চোখের জল ফেলতে দেখেছিলাম তার জীবনের সর্বস্বধন হারাবার আশঙ্কায়, তার মুখ দিয়ে এবার আগুনের হল্কা বার হল, "না খেয়ে না খেয়ে পোড়ারমুখো হারামজাদার যে পেটের নাড়ি শুঁটকো হয়ে গেছে সেটা হুঁস নেই, লালচ বেড়েছে, আজ কিছু টাকা পেয়েছে, বললে—পর্ক-ডাল রান্না কর, অনেকদিন খাইনি। মানা করলাম শুয়োরের মাংস আর ছোলার ডাল হজম করতে পারবে না, তবু শুনল না। খৃষ্টেন কিনা, তাই শুয়োর খায়। ওর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বার বার 'না' বলতে পারলাম না। এখন আমাকে পথে বসিয়ে সরে পড়বার ফিকির। তোর পোড়ারমুখে আগুন, আগুন, এণ্টনী।"

মুন্নাদিকে বললাম, "তুমিও তো খৃষ্টেন? কিন্তু সে-কথা থাক, ঘরে তার্পিন তেল আছে? যদি থাকে নিয়ে এস, আর এক কেটলী খুব গরম জল, একটা তোয়ালেও এনো।"

এন্টনীদা আমার সার্টের হাতাটা ধরে কাতরভাবে বললেন, "খুব নিঃশ্বাসের কষ্ট, বোধহয় হার্ট-অ্যাটাক।"

মুন্নাদি একটা বেশ বড় কাগজের বাক্স এনে বললেন, "আমার মাথা ঠিক নেই কাঞ্চন, তুই নিজেই দেখ। আমি জল গরম করে আনি।"

স্পিরিট টার্পেনটাইন পেলাম, আরো কয়েকটা ওষুধ পেলাম যা এ-অবস্থায় চলতে পারে। ওদিকে জন এন্টনীর মুখ নীল হয়ে গেছে শ্বাসকষ্টে।

জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, সুলতান মিঞা ইশারা করে ঘরের এককোণে নিয়ে বলল, "বাবুসাহেব হামার সাতপুরুষ মুন্নাবেগমের বাবা নবাবসাহেবের নিমক খেয়ে

মানুষ, জরুরত হলে বড় ডাগদারসাহেব বোলাইয়ে, হামার কাছে প্রায় হাজার রূপেয়া আছে, বাবুকে বাঁচাইয়ে।"

ওর চাপাগলার কাকুতি যেন ওর অন্তরের গভীরস্থান থেকে বেরোচ্ছে, অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালাম। এই দুশমন জানোয়ার হয়তো অনেকের বুকে পিঠে ছুরি বসিয়েছে টাকার লোভে, পকেট মেরে কত লোকের সর্বস্ব লুঠেছে, কত মেয়ে-ছেলের সর্বনাশ করছে, আর ওর মুখে এই কথা? চওড়া বুকের দুই পাশে সিংহের মতো শক্তিমান দুটি হাত এবং মাংসল কাঁধের উপর বীভৎস মুখটিই দেখেছি এতদিন, আজ গভীর নিশীথে ক্ষীণ আলোকে দেখলাম অন্য একটি রূপ। গড আল্লা ভগবান যিনিই থাকুন না কেন আজ এই দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মোল্ডরা বস্তীর মধ্যে তাঁকেই এক পলক দেখে কাঞ্চনবরণ সান্ন্যাল মাথা নিচু করে প্রণাম জানাল।

"না সুলতান, ঘাবড়াবার কিছু নেই, যদি বড় ডাক্তার ডাকতে হয় তোমাকে বলব। এখন এক গ্লাস পানি নিয়ে এস।"

মুন্নাদির ওষুধের তহবিল মন্দ নয়। বুঝলাম ওর নার্সিঙ ট্রেনিং এখানেও কাজে লেগেছে, স্বামীর কি-কি ওষুধ লাগতে পারে তা অভাবের পয়সায়ও যোগাড় রাখতে ভুল হয়নি।

হার্টের জন্যে এক ডোজ 'কোরামিন' খাইয়ে লেগে গেলাম টার্পেণ্টাইন পেটে মালিস করে সেঁক দিতে। মুন্নাদির হাতে পায়ে জোর ছিল না দেখলাম, সুলতান মিঞাই হল আমার সহকারী। যেমন ডাক্তার তেমনি তার সহকারী! যেন কাঁচ-কলার অম্বলে কচুরডগা!

ঢাকের মতো পেটটি কমছে না দেখে সুলতানকে বললাম, "এই গ্লাসে কিছু গরম জল ঢেলে খানিকটা ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে দাও।" দু'চামচ সোডা সেই জলে ঢেলে রুগীকে খাইয়ে দিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে হড়হড় করে অনেকটা বমি হয়ে গেল। টুকরো টুকরো পর্ক আর আস্ত-আস্ত ডাল, তার সঙ্গে পেটের বেশ কিছু শ্লেষ্মা। গলার কাছে তোয়ালেটা বিছিয়ে দিয়েছিলাম, সুলতান বমি-মাখা তোয়ালেটাকে ধুয়ে নিয়ে এল। ধন্যি তুমি সুলতান মিঞা, মনে-মনে ভাবলাম।

বমিটা হয়ে গিয়ে জন এণ্টনী অনেক সুস্থ হল। রাত তখন চারটে। মুন্নাদির মুখে একটি কথাও নেই, সুলতানই বলল, "বাবুসাহেব, আপনার বহোৎ তকলিফ হল। এখন বাড়ি যেতে পারেন, ট্যাক্সিটা ঠ্যারিয়েই আছে, যেতে মানা করেছিলাম।"

"হ্যাঁ কাঞ্চন, তুই এখন যা, একটু ঘুমিয়ে নে, উনি তো বেশ আরামে ঘুমোচ্ছেন দেখছি।" মুন্নাদির প্রাণের সবটুকু কৃতজ্ঞতা যেন এ-কটি কথার ভিতরে ফুটে উঠেছে।

কোট-টাই হাতে নিয়ে বাইরে এসে সুলতানকে জিগগেস করলাম, "ট্যাক্সি-ওয়ালাকে কত দিতে হবে?"

"এক পয়সা ভি নেহি বাবুসাহেব। আরে, শালা রহমৎ! বাবুসাহেবের লিয়ে যদি রুপেয়া মাঙ্গিস তো তোর জান বরবাদ।"

আসতে-আসতে ভাবলাম রাত একটায় তো আমারই জান বরবাদ হতে চলেছে ভেবেছিলাম সুলতান মিঞার হাতে। এখন অন্ধকার থাকলেও আমার কোনো ভয় নেই। সুলতানই আমার জান বাঁচাবার ভার নিয়েছে।

ভিস্তীরা রাস্তায় জল দিচ্ছে, মুটেরা সব্জীর ঝাঁকা নিয়ে বেরিয়েছে বাজারের পথে, খবরের কাগজওলারা সাইকেলে কাগজ আনতে ছুটছে। আর একটি কর্মব্যস্ত দিনের প্রস্তুতি শুরু। মহানগরী ঘুম ভেঙে এখুনি জেগে উঠবে। জন এণ্টনীও ঘুমুচ্ছে। সারারাত আমিই ঘুমোইনি, আমি এখনো জেগে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে রহমতের হাতে দশটাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, "এটা ট্যাক্সিভাড়া নয়, তোমার বকশিশ, সুলতানকে বল না।"



১৫

নকরদার কাছে শুনেছি যে গীতার সার কথা নাকি কর্মযোগ।

"কাজ করে যা, কাঞ্চন কাজ করে যা। কিন্তু ফলের আশা করিস নে। যা-কিছু করবি ভাববি তাঁরই জন্যে করছিস, তিনিই মানুষ পাখি জন্তুর মধ্য দিয়ে তা সেবার মতো গ্রহণ করছেন। যা-কিছু দেখছিস সবই তো তিনি, তিনি-ছাড়া আর কি আছে জগতে? সব কাজই তাঁর কাজ। অফিসের কাজও কোম্পানির সেবা, সে সেবা তিনিই নিচ্ছেন।"

বললাম, "নকরদা অবাক হয়ে যাচ্ছি আপনার মুখে ভগবানের নাম শুনে, এ-যেন ভূতের মুখে রাম নাম। আপনি না ঘোরতর নাস্তিক?"

"বোকা ছেলে, মুখে যারা বলে আমরা নাস্তিক, তারা আসলে বেশি বিশ্বাস করে ভগবানকে। তবে অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাস করে না। ভালো করে বিচার করে দৃঢ়বিশ্বাসে মেনে নেয়। ভেড়ার পালে যোগ দিয়ে মন্দিরে তীর্থে গুরুর কাছে ছোটে না।"

"আপনি একদিন বলেছিলেন ভগবান নামে কেউ নেই, 'কসমিক ফোর্সে' সৃষ্টি গড়ে উঠেছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যে এককোষবিশিষ্ট অ্যামিবা দেখা যায় তাই থেকে নাকি ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষের আবির্ভাব হল?"

"ঠিকই বলেছিলাম রে! আমাদের বিষ্ণুপুরাণে আছে অচেতন পদার্থে বিশ-লক্ষ জীবন, জলজ লতা ও কীটের স্তরে ন-লক্ষ জীবন, কূর্ম-কচ্ছপ-শামুখ-ব্যাঙের স্তরে ন-লক্ষ জীবন, পাখি-প্রজাপতি-ফড়িঙের স্তরে দশ-লক্ষ জীবন, পশুর স্তরে তিরিশ-লক্ষ জীবন, বানরজাতীয় স্তরে চার-লক্ষ জীবনের পরে মনুষ্যজীবন লাভ হয়। এখনকার জীববিজ্ঞানীরাও বলেন অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত তিপান্ন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে ডারউইনের থিওরির ভুল কোথায়? বাইবেলের অ্যাডাম ও ইভের কাহিনীকে নস্যাৎ করে দিল বলেই তো খৃষ্টান গির্জা

ডারউইনকে ত্যাগ করল ? ঐ-ভাবে দেখতে গেলে পুরাণ মহাভারত গীতার কথাও তো বুজরুকি ? আমি টিকিধারী পণ্ডিতদের কথা মানিনে, কিন্তু যুক্তিতর্ক জ্ঞানের দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে সেটা মানি।"

যাই হোক, নকরদার কথামতো কর্মযোগে ডুবে আছি আপাতত। অফিসে কাজকর্মও খুব বেড়েছে। মুন্নাদিদের খবরও অনেকদিন রাখি না। তবে সুলতান মিঞা একদিন এসেছিল, জানিয়ে গেল জন এণ্টনী ভালো আছে। ওরই হাতে এক বোতল হর্লিকস, ওভালটিন, গুঁড়োদুধ, আর একটা হজমের ওষুধ পাঠিয়েছিলাম। ও বলল, "আপনার দিল খুব সরেস আছে বাবুসাহেব, আল্লার মেহেরবানীতে বহোৎ রুপিয়া কামাই হোবে।"

জিগগেস করলাম ওদের চলে কিসে।

"মুন্নাবেগম কভি কভি নার্সের কাম করে। দেখুন বাবুসাহেব কেমুন আফসোস-কা-বাৎ, নবাবসাহেবের লেড়কী, কিন্তু কি হালত হয়েছে। এণ্টুনীবাবুর বাবাও আমীর আদমী ছিল। একেই বলে নসীব।"

"মুন্নাবেগমের মা কি নবাবের বেগম ছিলেন ?"

"একই বাৎ বাবুসাহেব। বেগম আর বাইজী কুছু ফারাক নেই।"

অফিসফেরতা মনে পড়ল আজ প্রায় মাসখানেক হল ডোরিন গ্রের কোনো খোঁজ নিইনি। ওর দরজায় টোকা দিতেই ওর গলার স্বর ভেসে এল, "আসুন।"

একটা ছোট সিল্কের সার্ট সেলাই করতে-করতে ও গুনগুন করে গান করছিল, আমাকে দেখে চুপ করল।

"বসো মিস্টার সানিয়াল।"

"পাড়ার গরীব ছেলেদের কাউকে বুঝি দান করবে এটা ?"

ওর হাত যেন একটু কেঁপে উঠল, বলল, "দান করবার ইচ্ছে থাকলেও পয়সা নেই, যার জন্যে শেলাই করছি সেও গরীবেরই ছেলে, আমার ছেলে।"

চমকে উঠলাম। ওর ছেলে ? ও কি তবে একটা ভ্রষ্টা মেয়ে ? যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই ?

"তোমার ছেলে মিস্ গ্রে ?"

ও এ-কথার জবাব দিল না, শুধু দুফোঁটা চোখের জল গালের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ওর মুখের দিকে তাকালাম। মাতৃত্বের শান্তশ্রী! আর যাই হোক, মাতৃত্বকে ঘৃণা করবার আমার অধিকার আছে কি? সে-মাতৃত্ব আইনের চোখে যতবড়ই হেয় হোক না কেন!

কিন্তু মনের ভিতরে কি-যেন একটা খচখচ করতে লাগল। যতই রূপসী হোক না কেন এ একটি ভ্রষ্টা নারী। ঐ শান্ত সংযত রমণীয় খোলসটার মধ্যে হয়তো জ্বলছে উদগ্র কামনার বহ্নিশিখা। সেই বহ্নির আভাসই দেখা দেয় ওর নৃত্যগীত-বিলাসে। সেটাই ওর সত্যিকারের পরিচয়। ছিঃ, ওর সঙ্গে কথা বললেও পাপ হয়। উঠে পড়লাম।

"বসো মিস্টার সানিয়াল।"

"না, কাজ আছে।"

"কোনো কাজ নেই, বসো।"

ভদ্রতার খাতিরে আবার বসলাম। জিগগেস করলাম, "কিছু বলতে চাও মিস্ গ্রে?"

"হ্যাঁ মিস্টার সানিয়াল। ইচ্ছে হলে আমাকে মিসেস ব্রাউনও ডাকতে পার।"

"মিসেস?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না, এ-ছেলে আমার বড় দুঃখের ধন, ওর জন্যেই বেঁচে আছি, নইলে গলায় দড়ি দিয়ে নিষ্কৃতি পেতাম। আমার দুঃখের কাহিনী আজ তোমাকে শুনতেই হবে, যা আর কেউ জানে না কলকাতায়।"

এটা কি মোহিনী নারীর আর একটি অভিনয়? কিন্তু ওর চোখেমুখে তো কোনো ছলনার আভাস নেই? আছে যেন এক দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক!

প্রায় একঘণ্টা ডোরিন গ্রের ঘরে ছিলাম। শুনলাম ওর জীবনের এক অধ্যায়। এক আইরিশ ইঞ্জিনীয়ার এসেছিল কাশ্মীর সরকারের চাকরি নিয়ে, বিয়ে করল এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণকন্যাকে, তাদেরই সন্তান এই ডোরিন গ্রে। ডোরিন যখন ছ'মাসের মেয়ে তখন মিস্টার গ্রে সপত্নীক গিয়েছিলেন ঝিলাম নদীর উপরে একটি সেতু নির্মাণের জরীপে। প্রচণ্ড তুষারপাতে চারিদিক ঢাকা, পথ ভুল হয়ে গাড়িখানা অদৃশ্য হল ঝিলামের হিমশীতল বুকে। পিতৃমাতৃহীন শিশুকে দেওয়া হল অনাথ-আশ্রমে। রূপই হয় নারীর সর্বনাশের কারণ, অসহায় বালিকার পক্ষে সংসার বড় বিষময় স্থান। ডোরিন যখন ষোলো বছরে পা দিয়েছে তখন অনাথ-আশ্রমের

বৃদ্ধ সেক্রেটারী রাদারফোর্ড ব্রাউন ওকে ভয় দেখিয়ে জোর করে বিয়ে করে। ছ'মাসের মধ্যে এই ছেলে ওর পেটে এলে সেই নরপিশাচ ওকে তাড়িয়ে দেয়। পাষণ্ডটা ডোরিন-এর দেহকেই চেয়েছিল, অবাঞ্ছিত পুত্রের পিতৃত্ব চায়নি। তারপরে দিল্লির এক মিউজিক স্কুলের সহৃদয়া প্রিন্সিপাল ওকে আশ্রয় দিয়ে দু'বছর তার কাছে রাখেন। সন্তান হয়ে গেলে সেখানেই ও ক্যাবারে নাচ ও গান শেখে। ছেলে হার্বার্ট এখন পাঁচ বছরের বালক, দার্জিলিঙে মিশনারী স্কুলে পড়ছে। লাহোর করাচী দিল্লি সিঙ্গাপুরে নাচের কয়েকটা কণ্ট্রাক্ট শেষ করে ও কলকাতায় আছে বছর তিনেক। বুড়ো রাদারফোর্ড ব্রাউনও মারা গেছে। কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে ও এখন ছেলেকে মানুষ করছ।

কাহিনীটির আরো অনেক ডালপালা আছে, সে ডালপালা দুঃখের কণ্টকে পূর্ণ, তিক্তফলে বিষাক্ত। ডোরিন থেমে-থেমে বলছিল, অনেক জায়গায় বলবার মতো অবস্থা ছিল না, গলার স্বর কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কখন যে আমার এক-খানা হাত তার হাতের উপর এগিয়ে গেছে টের পাইনি। জীবনের যে এক নির্মম ছবি আমার কাছে এই সন্ধ্যায় প্রকাশিত হল তার সঙ্গে পরিচয় আমার ছিল না। কোনো-কোনো মানুষ মানুষের ছদ্মবেশে পিশাচ। আমার সমস্ত অন্তর যেন এই হতভাগিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

"ডোরিন!"

"বলুন মিস্টার সানিয়াল?"

"মিস্টার সানিয়াল নয়, শুধু কাঞ্চন। চল আমার সঙ্গে, খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসবে।"

"না কাঞ্চন, আমার সঙ্গে বেড়ানো তোমার ঠিক নয়। আজ তো জানলে আমি একজন ক্যাবারে গার্ল, রেস্টরাণ্ট-ক্রুনার, তোমার সঙ্গে মিশবার যোগ্য নই।"

"কোনো কাজ আছে আজ?"

"না, আজ পনেরো দিন কোনো চাকরি নেই, বসে আছি।"

"তবে না বলো না, চল, একেবারে ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরব।"

"না, দরকার নেই।"

"তবে থাক এই ছোট ঘরের ভিতরে পচে।"

ডোরিন যে-রকম বসে ছিল, ঠিক সেই রকমই পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল,

শুধু বলল, "আলোটা দয়া করে নিভিয়ে দিয়ে যাও, অন্ধকারই আমার ভালো লাগে, অন্ধকারেই আমি নিজেকে খুঁজে পাই।"

যাকগে, মরুকগে, আমার কি? চলে এলাম।

রাত প্রায় নটা বাজে। যোশেফ আমার খাবার ঢাকা রেখে সিনেমায় গেছে। মেয়েটির কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে আছে। পা দুটো আমাকে যেন টেনে নিয়ে গেল ওর দরজার দিকে, ধাক্কা দিতেই শুনলাম ওর সাড়া, "আসুন।"

ঘর এখনো অন্ধকার।

"পাগলামো করো না ডোরিন, পনের মিনিট সময় দিচ্ছি, তৈরি হয়ে নাও।" হাতড়াতে-হাতড়াতে এগিয়ে যেতে হুড়মুড় করে একেবারে ওর ঘাড়ে পড়ে গেলাম।

খিলখিল করে হাসি।

"পাগল আমি না তুমি?"

"হয়তো দুজনেই, আমি চললাম, পনের মিনিট মনে থাকে যেন।"

"যদি ষোলো মিনিট লেগে যায়?"

মাঝামাঝি রফা হল, সাড়ে পনের মিনিট। ডিনার সুট পরে বাইরে বেরোতেই দেখি ডোরিন গ্রে ইভিনিং ফ্রক পরে বেরোচ্ছে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বলল, "বেশ মানিয়েছে, কম বাঙালীকেই ডিনার সুটে এরকম মানায়।"

গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের শেরী-বার এবং ম্যাক্সিমের খানা একদিন খুব ভালো লেগেছিল, সেখানেই গেলাম।

বার-এ একটা দুজনের মতো ছোট টেবিল বেছে বসতেই একজন বয় ছুটে এল। ডোরিন বলল, "আজ আমি নিজেকে ভুলতে চাই কাঞ্চন, হুইস্কি খাব, যা জীবনে কখনো ছুঁইনি। অ্যাকসিডেন্টে বা কলিক পেইনে তো মর্ফিন ইন্‌জেকসনে অসাড় করানোর ব্যবস্থা আছে!"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি বলছি, আজ আর লাইমজুস নয়। আজ আমার জন্মদিন।"

"সত্যি?"

"মিছে কথা বলতে জানি না কাঞ্চন।"

ডোরিনকে নিয়ে যখন শেরীতে ঢুকছিলাম তখন সবাই ওর দিকে হাঁ-করে তাকিয়েছিল, এখনো অনেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে, একটু অস্বস্তি লাগছিল।

দেশী-বিদেশী অনেক নারীরত্ন এ-আকাশে বিরাজিত, কিন্তু ডোরিন-এর মতো সুন্দরী কেউ দেখলাম না। দেবদেবীর সভায় যেন উর্বশী অপ্সরা।

গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে ও বলল, "কি করে খাও এই ছাই পাঁশ তোমরা? গলা জ্বালা করে যে?"

"ডোরিন, তোমার পাশে আমাকে বানরের মতো দেখাচ্ছে বোধ হয়।"

"মিস্টার সানিয়াল যদি বানর হয় তবে আমি তো পেত্নী, তবে বানরীও বলতে পার, কারণ ব্রাউন পাজিটা ছিল বানরের মতো দেখতে। তার স্ত্রী ছিলাম, তাই বানরী। তার চুল সবই পেকেছিল, কিন্তু কাঁচা বয়েসে ও যে বানরের গায়ের মতো কটা লোমশ ছিল তা ওর ভ্রূদুটো আর চোখের পাতা দেখেই বোঝা যেত। কিন্তু হার্বার্ট তার বাপের মতো হয়নি, হয়েছে আমার মতো।"

ডোরিন দুটো হুইস্কি খেল, কথাও একটু বেশি বলছে। বলল, "কাঞ্চন, আমি আর ডোরিন গ্রে নই। মনে হচ্ছে যেন আকাশে ভেসে যাচ্ছি, আর তুমি একটি এঞ্জেল, আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছ যেখানে কোনো দুঃখ কষ্ট নেই। চল এখন খেতে যাই, দুপুরে খাইনি, খিদে পেয়ে গেছে। ঘুমও পাচ্ছে।"

"ডোরিন, তুমি যদি ছোট একটি বাঙালী মেয়ে হতে তবে ঘুমপাড়ানী গল্প করতাম তোমার কাছে। এক হলুদবরণ রাজকন্যার কথা, তার মেঘবরণ চুল। সে এক স্বপনপুরীর রাজপুত্তুরের সঙ্গে পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে, বরফঘেরা পাহাড় ডিঙিয়ে, নীলসাগর পার হয়ে আকাশে উড়ে চলেছে। তার চোখ ঘুমে ঢুলু-ঢুলু হলে গান গাইতাম—ঘুমোও খুকি ঘুমোও খুকি দেখ নয়ন বুজে, স্বপনপুরীর রাজপুত্তুর দাঁড়িয়ে আছে সেজে, তোমায় নিয়ে সোনার ভেলায় ভাসবে অকূল জলে, ক্ষীরসাগরের ঢেউয়ের তালে হেলে দুলে-দুলে।"

ওর চোখও ঢুলু-ঢুলু, মনেও ওর রঙ ধরেছে, আনন্দ করে খেল। কি জানি কেন ওকে খাওয়াতে আমার খুব ভালো লাগে। ওর মুখ দেখে মনে হয় ও নিজেকে সব থেকে বঞ্চিত করে ছেলেকে মানুষ করে তুলছে। দার্জিলিঙে স্কুলের খরচা, বোর্ডিঙের খরচা, কাপড়জামা, এটা-সেটার খরচা বড় কম নয়।

বাড়ি ফিরে ওর দরজার কাছে এসে বললাম, "গুড নাইট, হ্যাপি ড্রিম্‌স্‌।" হঠাৎ ও একটা কাণ্ড করে বসল—আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হু-হু করে কেঁদে উঠল।

দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম "ডোরিন, ডোরিন, তুমি প্রকৃতিস্থ নেই, নিজেকে সামলাও, স্থির হও।"

"ওঃ, আমি খুব দুঃখিত" বলে ও ছুটে ঘরে চলে গেল।

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। ওদের কান্না-হাসির মানে আমি বুঝি না, তাতে আবার ও একটু সুরামত্ত হয়েছে। রুমাল দিয়ে আমার ঠোঁট ঘষে-ঘষে মুছে ফেললাম ঘৃণায়। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

স্বপ্নের কোনো মানে আছে? বাবাকে দেখলাম গাড়িতে উঠছেন হাইকোর্টে যাবার জন্যে, আমি দৌড়ে গিয়ে হাত ধরতে তিনি তুলে ধরে গালে চুমো দিলেন, বললেন—যাও খোকা, দুধ খেতে গোলমাল করো না, ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে খেলা করব।

বাবার গাড়ি চলে গেলে আমি পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চড়ে আকাশে উঠেছি. আকাশে বড় চাঁদ উঠেছে, চাঁদ যেন মানুষের মুখের মতো, টিপিটিপি হাসছে, এ যে ডোরিনের মুখ! বললাম—হাসছ যে বড়? আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ না? আমার কোমরে তরোয়াল ঝুলছে দেখছ না? চাঁদ বলল—মোটেই ভয় পাচ্ছি না খোকবাবু, এস আমার কাছে, একটা চুমো খেয়ে যাও।

তারপরে হঠাৎ দেখলাম কলকাতার রাস্তায় হেঁটে চলেছি, নফরদার সঙ্গে দেখা। নফরদা বললেন—বুঝলি কাঞ্চন, বয়েসটা তোর ভালো নয়, মেয়েদের কাছ থেকে তফাত থাকবি, ওরা যাদু জানে, আমি চলি।

পেছনে খিলখিল হাসি। ফিরে তাকিয়ে দেখি বুড়ো ম্যাক্সিম। হাতে একটা ব্যাঞ্জো, সেটা বাজাতে-বাজাতে আমার পাশে-পাশে চলল। বললাম—আহা কি করুণ সুর, কান্না পায় শুনলে। ও বলল, এটা একটা স্প্যানিশ সুর, কাঞ্চন। কাউণ্টের ছেলে চাষীর মেয়েকে ভালোবেসেছে, কাউণ্ট কড়া পাহারায় রেখেছেন ছেলেকে নজরবন্দী করে, চাষীর কুটির পুড়িয়ে দিয়েছেন রাগে, চাষীর মেয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার আগে কাউণ্টের ছেলেকে লক্ষ্য করে গান গাইছে, বিদায় সঙ্গীত।

হঠাৎ সুলতান মিঞা ছুটে এসে বলল—বাবুসাহেব, আপনি যে-বাড়িতে থাকেন উখানকার একঠো মেমসাহেব মোটরচাপা পড়িয়েছে, দেখুন। ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে দেখি ডোরিন গ্রে, রক্তে ভেসে গেছে। চিৎকার করে উঠলাম, ঘুম ভেঙে গেল।



১৬

সকাল থেকেই হারীণদার মেজাজটা একটু খরখরে মনে হচ্ছে। ওঁর মানসিক আবহাওয়ায় কোনো দুর্যোগের পূর্বাভাস পেলেই অতি সাবধানে মেপেজুখে কথা কই, কিছু জিগগেস না করলে বোবা হয়ে যাই। উপরওলা তো ?

আধঘন্টার ভিতর মিস্ টেভারেস দুবার বকুনি খেল, ফাইল নিয়ে আসতে খুব দেরি না হওয়াতেও বেয়ারাকে মুখখিস্তী শুনতে হল, একটা চিঠির খামের উপর পত্রদাতার নাম দেখে 'সোয়াইন' 'সোয়াইন' গর্জন শোনা গেল, এ-সব দুর্যোগের লক্ষণ বইকি ?

'ইন্টারকম' ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে হারীণদা ডাকলেন, "জন, আজকে রাতেই আমার মির্জাপুর রওয়ানা হতে হচ্ছে। ট্রাভেল এজেণ্টকে বল ভীষণ জরুরী। এয়ারকণ্ডিসণ্ড না পেলে সাধারণ ফার্স্টক্লাস যোগাড় করতেই হবে। কাঞ্চন, এদিকে এস। জয়হিন্দ কার্পেট কোম্পানি আমস্টার্ডামে গতমাসে যে চালানটা পাঠিয়েছিল সেটা নমুনা মাফিক নয়, অনেক নেরেশা। দিল্লির লছমীনারায়ণ সাগরমল যে জরিব স্যাণ্ডেলগুলো পাঠাচ্ছে তার পর-পর দুটো চালানে কাঁচাচামড়ার ভেজাল বেরিয়েছে। দিল্লির কর্তারা তাগিদ দিচ্ছেন বিদেশে রপ্তানি বাড়াও কিন্তু কোয়ালিটি-কণ্ট্রোলের কোনো ব্যবস্থাই করেননি। আমাদের দেশের লোকের চরিত্র কেমন তা কি ওঁরা জানেন না ? গভর্নমেণ্টের হুড়ো-হুমকি না থাকলে কি এসব খচ্চড়রা শায়েস্তা থাকে ? বিদেশী খদ্দেররা কিনবে কেন খারাপ মাল ?"

"যেমন কুকুর তেমন মুগুরের দরকার। কিন্তু যে-সরষে দিয়ে ভূত ভাগাবেন সে-সরষের ভিতরেই ভূত, হারীণদা।"

"আমাদের হাতে যে-দাওয়াই আছে তাই দিতে হবে। প্রথমে যাব মির্জাপুর, জয়হিন্দকে ওদের বাপের নাম ভুলিয়ে দেব ভয় দেখিয়ে, ফের চালাকি করলে বাকি অর্ডার সব বাতিল হয়ে যাবে। দুলাখ টাকার কণ্ট্রাক্ট এখনো আমাদের হাতে। দ্বিতীয় নম্বর দিল্লির সাগরমল লছমীনারায়ণ।"

"কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের আর কোনো কণ্ট্রাক্ট নেই তো?"

"নতুন কণ্ট্রাক্ট হতে কতক্ষণ? মারসেলস্-এর গ্রান্দো অরিঅন্তেল আরো অনেক চালান লেডিস স্যাণ্ডেল চেয়ে পাঠিয়েছে। লালচ ও ভয় দুটোই হবে আমার মোক্ষম অস্ত্র ওদের কাহিল করতে। তৃতীয় নম্বর বেনারসের নবারুণ ইণ্ডাষ্ট্রীজ।"

"ওদের কোনো গলতি বেরিয়েছে?"

"না, ব্রোকেড শাড়ি ব্লাউজপিস ও স্টোলগুলো ওরা ভালোই পাঠাচ্ছে। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে দারুণ চলছে। তবে একটু দরদস্তুর করে দামটা কমাতে হবে। সেই সঙ্গে একটু পিঠ-চাপড়েও দিয়ে আসা দরকার, যাতে ওদের উৎসাহ বাড়ে। ওদের মাল ভালো কিন্তু বলব ওরা চটপটে নয়।"

"রাজনৈতিক চাল?"

"ব্যবসা আর রাজনীতি প্রায় এক-ক্লাসেরই দুটো জিনিস। সে কথা থাক, কাজ চালিয়ে যেতে পারবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যে-কটা দিন আমি বাইরে থাকব?"

"সবই তো শিখিয়েছেন?"

"কাজ শেখা এক কথা, আর নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়া অন্যকথা। ইউরোপ আর আমেরিকার স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার মূল লক্ষ্য এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা, আর আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা বাপ, কাকা, দাদা, দিদি, মাস্টার, প্রফেসারদের চাপে স্বাধীনভাবে কিছু ভাবতে বা করতে শেখে না, আত্মবিশ্বাস বা আত্মনির্ভরতা যে কি তারা জানে না, জানবার সুযোগও পায় না, এই নাবালকত্ব ঘুচতে তাদের অর্ধেক বয়েস কেটে যায়। কাজ তুমিই ভালোই শিখেছ, কিন্তু নিজের ওপর তোমার আস্থা আছে?"

নফরদার একটা কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল—নিজের কতটুকু আছে কতটুকু নেই, কোনটা আছে কোনটা নেই, এ বিচার তুই নিজেই করতে পারবি কেন, কাঞ্চন? নিজের নাকটাই তো তুই দেখতে পাস না আরসি না হলে? তুই ভাববি 'পারব,' অন্যে দেখে নেবে পেরেছিস কিনা।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে হারীণদা বললেন, "তোমাকে যে প্রশ্নটি করলাম তার জবাব তোমাকে দিতে হবে না। কারণ জবাব দেওয়া শক্ত। দেশ-লাইয়ের কাঠিতে বারুদ থাকে, কিন্তু না ঘষলে সে বারুদে আগুন জ্বলে না।"

আমি উপমাটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। উনি কি আমাকে দেশলাইয়ের কাঠির অংশে ফেললেন, না বারুদের অংশে? জিগগেস করতেও সাহস হল না।

"আর একটা কথা কাঞ্চন। এ-কদিন কাজ চালাবে তুমিই, কিন্তু কর্তা হিসেবে ফেদার্স্টোনের হাতেই এ ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব থাকবে আমার বদলে। এতে তোমার কাজ করার ক্ষমতা বা বুদ্ধির ওপর সন্দেহ করা হচ্ছে না, কিন্তু তুমি এখনো নূতন, সবটা দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে এখনি চাপানো আমাদের পক্ষেও ঠিক হবে না, তোমার ওপরও অবিচার করা হবে। কোনো বেকায়দায় পড়লে ফেদার্স্টোনকে জিগগেস করবে। ঝুঁকিটা ওর ঘাড়েই থাকবে, তোমার জবাবদিহী করতে হবে না।"

"ও আপনার মতো লোক নয়, তাই একটু ভয় পাচ্ছি।"

"ভয় পাবার কিছু নেই। ফার্গুসনের পরে ও-ই হবে বড়সাহেব। আগে থেকেই কিছুদিন ওর সঙ্গে কাজ করলে ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা ভালোই হবে তোমার।"

"কিন্তু আজই আপনার রওনা না হলে কি চলত না? সেদিন বলেছিলেন দু-চারদিনের মধ্যেই মিসেস ঘোষালকে নার্সিংহোমে যেতে হবে? এ সময় আপনি চলে গেলে...."

"চল্লিশ বছর বয়েসে আবার মা হতে যাওয়া ঝকমারি বইকি? কিন্তু চাকরির শ্রীচরণে যখন দাসখত লিখে গোলামি করছি তখন সে কাজ আগে, স্ত্রীপুত্রপরিবার, নিজের সংসার, নিজের সুবিধে-অসুবিধে তার পরে। দরকার হলে হিল্ডা তোমাকে খবর দেবে, তবে দরকার নাও হতে পারে। ডক্টর মুখার্জী আমার বাল্যবন্ধুও বটে, সে রোজ একবার এসে হিল্ডাকে দেখে যাচ্ছে।"

শেষের কথাগুলো বলতে হারীণদার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে অভ্যাস মতো কাগজের প্যাডটি টেনে নিয়ে হিজিবিজি দাগ কাটতে শুরু করলেন। কোনো কারণে উত্তেজিত হলেই দেখেছি উনি তার ঝাল ঝাড়েন কাগজের ওপরে পেনসিল দিয়ে খুব জোরে আঁচড় কেটে। দুরন্ত সমুদ্র তরঙ্গ যেমন আছড়ে পড়ে বেলাভূটে। তারপর বললেন, "মানুষকে আমি খুব ভালো করে চিনতে পারি ভেবেছিলাম যখন বয়েস ছিল কম। বয়েস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে বিশ্বাস আমার ভেঙে পড়েছে। সত্যিই কাউকে সত্যিকারের চেনা যায় না। একবার সংসার

পাতলে সে-সংসার নাগপাশের মতো প্যাঁচ কষে জড়িয়ে ধরে, ছাড়া পাওয়া যায় না। মান, ইজ্জৎ, সমাজে প্রতিষ্ঠা বড্ড দারুণ গেরো, বুক ফেটে গেলেও মুখ খোলা যায় না।"

আমি শুধু শুনে যাচ্ছিলাম। বুঝলাম না হারীণদা এ-সব কি বলছেন, কেন বলছেন।

"অবাক হচ্ছ কাঞ্চন? ভাবছ এ-সব কি বকছি? এ-সব ঘরোয়া কথা কাউকে বলবার নয়, বলতে গেলে আমারই মুখে কালি পড়বে, কিন্তু গলায় আমার যেন ফাঁস লেগে আছে। তোমাকে কি জানি কেন খুব স্নেহ করি, তোমার কাছে বললে হয়তো বুকের ভারটা কিছু কমবে। ও বাচ্চা আমার নয়, ডক্টর মুখার্জীর।"

হারীণদা দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। রাশভারি লোক, আজ এত ভেঙে পড়লেন দেখে আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। টেবিলের ডানপাশে একটা শাদা সুইচ আছে, সেটা টিপে দিলাম। এ সুইচ টিপলে দরজার সামনে একটা লাল বাতি জ্বলে ওঠে, লাল বাতি জ্বলছে দেখলে কেউ তখন ঢোকে না।

আমার কপালের দুপাশের রগ দুটো দপদপ করছিল হারীণদার কথা শুনে ও তাঁর এ-অবস্থা দেখে। দু-আঙুলে টিপে ধরলাম। বাপ মায়ের মনে আঘাত দেবার জন্যে এ-শাস্তিটাও ওঁর অদৃষ্টে ছিল—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো? লোকে ওঁর বাইরের অর্থভাগ্য পদগৌরব ও প্রতিষ্ঠাই দেখে। ভিতরে-ভিতরে উনি যে কত বড় কাঙাল, কতখানি নিঃস্ব, কত বড় দুঃখী তা জানে না।

আমিও তো জানতাম না। অফিসের কেউ-ই তো জানে না যে এই ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত সৌম্যদর্শন ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিটির মনের মধ্যে জ্বলছে ধিকিধিকি আগুন।

নফরদা ঠিকই বলেছেন স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করতে নেই।

ডোরিন গ্রে? তাকেও হয়তো বিশ্বাস করা উচিত হবে না আমার। সেদিন রাতে ওর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অমন কাণ্ডটা করে বসল কেন? অভিনয়? কৃতজ্ঞতা প্রকাশ? না নেশার ঝোঁকে অবচেতন মনের অভিব্যক্তি?

হারীণদা ঠকেছেন, ওয়ালেশ ঠকেছে, আমিও কি ঠকতে যাচ্ছি? তা তো আমার মনে হয় না? ডোরিন তো আমাকে এড়িয়েই চলতে চায়?

বোধহয় জন এণ্টনীই এ-বিষয়ে ভাগ্যবান। সে মুখ বুজে মার খাচ্ছে কিন্তু ঠকেনি।

বাইরের লাল বাতিটা সুইচ টিপে নিভিয়ে নিজের টেবিলে এসে বসলাম।

লাঞ্চের পরে আর্মস্ট্রং টিকিট ও রিজার্ভেশন ভাউচার নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, "এই নাও হারীণ, এয়ারকণ্ডিসণ্ডই যোগাড় হয়েছে। অবিশ্যি কিছু বেশি লেগেছে, কিন্তু কাজ হাসিল করতে কিছু উপরি দিতে হয় আজকালকার দিনে। হাজার টাকার ক্যাশ ভাউচারও সই করে দিয়েছি, টাকাটা গোবিন্দবাবু তোমাকে দিয়ে যাবে।"

"স্মার্ট ওয়ার্ক জন। হিল্ডা আমাকে হাওড়া স্টেশনে পৌছে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসতে পারবে না তো জানো, তার কি বন্দোবস্ত করেছ?"

"রমজান ড্রাইভার সাতটায় তোমার ওখানে হাজির থাকবে।"

"খুব ভালো কথা, জন, ধন্যবাদ।"

জন আর্মস্ট্রং সত্যিই খুব কাজের লোক। কাজটা যতই শক্ত হোক, সময় যতই কম থাক না কেন ও যেন হাসিল করবার মন্ত্র জানে। ক্যাশ, ট্রান্সপোর্ট আর শিপিং বিভাগ ওর হাতে। সুপুরুষ সুরসিক হাসিখুশি এই ব্যক্তিকে কেরানীবাবুরা খুব পছন্দ করে। পছন্দ করার কারণও আছে। টানাটানিতে পড়লে ওরা ছুটে যায় আর্মস্ট্রং-এর কাছে। পরের মাসের মাইনের কিছু আগাম চাইলে আর্মস্ট্রং কখনো না বলে না। আগাম দেওয়ার পথ না থাকলে ও নিজের পকেট থেকেই বার করে দেয়। কেউ সামনে পড়লেই দু-একটা ঘরের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কাউকে কড়া কথা বলে না। গরীব বেচারীদের ওপর ওর যথেষ্ট দয়া। ওর বিভাগে কখনো গোলমাল হচ্ছে শোনা যায় না, কেরানীবাবুরা ওর মুখের কথায় ওঠে বসে, প্রাণপণে খেটে কাজ উতরিয়ে দেয়।

ওকে পছন্দ করে না শুধু দুজন। প্রথম নম্বর বড়বাবু। বড়বাবু কেরানীবাবুদের যম। কারু ওপর অবিচার হচ্ছে শুনলে জন ক্ষেপে যায়। জনই স্টাফের চার্জে, সুতরাং বড়বাবুর কেরামতি সেখানে ভোঁতা হয়ে যায়। দ্বিতীয় নম্বর বেয়ারাদের সর্দার সুজন সিং। সুজন সিং হুমকি দেখিয়ে প্রত্যেক বেয়ারার কাছে মাসে দু-টাকা সেলামী আদায় করত। জন টের পেয়ে সেটা বন্ধ করেছে। সাহেবলোগদের জন্যে যে পানওয়ালার কাছ থেকে সিগারেট, দেশলাই, সোডা, কোকোকোলা আসতো মাসে প্রায় তিনশো টাকার মতো, সুজন সিং তার কাছেও টাকায় দুপয়সা দস্তুরী আদায় করত। জন সেটাও খতম করেছে।

তবে আর্মস্ট্রং-এর একটা মস্ত দুর্বলতা আছে নারীর প্রতি ; বিশেষত সে নারী যদি একটু সুন্দরী হয়। এ-অফিসে টাইপিস্ট মেয়েরা বেশির ভাগই দেখতে মন্দ নয়, ওখানেই মুশকিল। বড়সাহেব ফার্গুসনের নজর এখানে খুব কড়া, কিন্তু সে-নজর অফিসের বাইরে অচল।

মিস্ টেভারেস কতগুলি চিঠিপত্র নিয়ে আসতেই হারীণদা বললেন, "মিস্টার সানিয়ালের টেবিলে রাখ। আমি দিন দশবারোর জন্যে টুরে যাচ্ছি উনিই আমার কাজ দেখবেন। এই নাও আমার টুর-প্রোগ্রাম, ছ-কপি টাইপ করে আমাকে দু-কপি দিও, বাকি চার-কপি দেবে মিস্টার ফার্গুসন, মিস্টার কেদার্স্টোন, মিস্টার সানিয়াল ও ডেসপ্যাচ ক্লার্ককে। মনে থাকবে ?"

মিস্ টেভারস মাথা একটু কাত করে বুঝিয়ে দিল কথাটা বুঝেছে এবং মনে থাকবে, তারপর চলে গেল নিজের জায়গায়।

আদীম মানব যখন কথা কইতে শেখেনি তখন তো ইশারাতেই কাজ চালিয়ে নিত। তারপর তার গলা দিয়ে বেরোলো কতগুলো ধ্বনি, বন্যপশুদের অনুকরণে। ক্রমে ধ্বনিগুলো বাড়তে লাগল বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের তাগিদে। তাই থেকে সৃষ্ট হল ভাষা। মিস্ টেভারেসের ঐ মাথা কাত করাটাকে তাহলে বলতে হয় ভাষাসৃষ্টির সর্বপ্রথম সোপান! কিন্তু ইশারা-ইঙ্গিতে বক্তব্যটা এখনো অনেকটা চালিয়ে নেওয়া যায়। আজকালকার দিনের লোকেরা কথা বলে বেশি। এই বাক্য-বাহুল্যতা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মিস্ টেভারেসের এই নির্বাক সম্মতিসূচক অভিব্যক্তি তাই ভালোই লাগল।

মিস্ টেভারেস কথা কমই বলে। বচনপ্রিয়তাটা নারীসুলভ অভ্যাস। কিন্তু ওর মধ্যে এটির অভাব বলেই ওর স্বভাবটি মিষ্টি। খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায় দেশের কর্তাব্যক্তিরা একগাদা কথা বলেছেন এখানে ওখানে গতকাল। তখনই ধরে নেওয়া যায় ওঁরা আরো গাদাগাদা কথা বলবেন আজ এবং সেগুলোও পড়তে হবে আগামী-কালের কাগজে। প্রায় প্রতি জিনিসের ওপরই ট্যাক্স আছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, কিন্তু কথার ওপরই কোনো ট্যাক্স নেই, তাই রসনা এত চালু হয়ে উঠেছে সর্বত্র।

হারীণদা একটু সকাল-সকাল বাড়ি চলে গেলেন। আজ যাবেন আগে ঠিক ছিল না, গোছগাছ করে নিতে হবে। সমস্ত দিন তাঁর মুখখানি শ্রাবণের আকাশের মতো থমথমে ছিল। কাজেই আমিও অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

মাঠ ফাঁকা জেনে জন আর্মস্ট্রং এসে ঢুকে বলল, "জানো কাঞ্চন, মিসেস সেন-গুপ্তর অবস্থা বড় ভালো নয়।"

"কেন জন? এই সেদিনই তো বিজু বলছিল মদনপল্লি থেকে ওর স্ত্রীর চিঠি এসেছে, ভালো হচ্ছে?"

"বিজু একটা বদমায়েস। স্বামী আবার গোপনে বিয়ে করেছে খবর পেলে কোন স্ত্রীর অসুখ ভালো হতে পারে?"

"ও বিয়ে করেছে আবার?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে জানলে?"

"নাম বলব না. কিন্তু এ-অফিসেই একটি লোক আছে, সে বিজুর কি-রকম আত্মীয় হয়, সে সব খবর রাখে। বিজু ওকে চেনে না।"

"বল কি?"

"অথচ মদনপল্লি টি. বি. হাসপাতালের খরচার জন্যেই আমার কাছ থেকে গত তিনমাসে প্রায় দু'হাজার টাকা কর্জ নিয়েছে। ওর অর্ধেকটা দিয়েছি অফিসের ক্যাশ থেকে, বাকি অর্ধেকটা আমার নিজের পকেট থেকে।"

"পুণ্য সঞ্চয় করেছ! সৎকর্মের পুরস্কার স্বর্গবাস।"

"কিন্তু আপাতত হাজত-বাসও হতে পারে ডিকি ফেদাস্টোনের কৃপায়।"

"কি রকম?"

"সামনের মাসে অডিট করতে আসছে লাভলক অ্যাণ্ড লুইস। ওরা খুব জাঁহাবাজ অডিটর ফার্ম। যা মাইনে পাই তাতে কুলোয় না ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে। কোম্পানীর টাকা ভাঙার দায়ে লাভলক লুইস আমাকে ছাড়বে না, ফেদারস্টোন পাজিটাও আমাকে ছাড়বে না।"

"জন, যদি কোনো ফ্যাসাদে পড় তবে আমাকে বল।"

"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু জানো তো সেই বুলিটা :

আমার ছিল টাকা আর ছিল বন্ধু
টাকা ধার নিল সেই বন্ধু,
বন্ধুর কাছে ফেরত চাইলাম টাকা
তাই হারালাম বন্ধু, হারালাম টাকা।"

"জন, যদি টাকা শোধ নাও দিতে পারো আমি কিছু ভাবব না। ঐ শেষের লাইনটি ভুলে যাও। কিন্তু বিজু সেনগুপ্ত সত্যিই কি আবার বিয়ে করেছে ?"

"সে শ্রীমতীটিকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কোথায় কেমন করে দেখেছি বলব না, জিগগেসও কর না। তোমাদের হিন্দু আইনেও তো এটা মানা করেছে ?"

"হিন্দু আইনে, হিন্দু শাস্ত্রে, কি বলে আমি জানি না, কিন্তু কিছুদিন আগে কাগজে পড়েছিলাম যে এক স্ত্রী থাকতে অন্য স্ত্রী নেওয়া বন্ধ করতে নতুন আইন পাশ হয়েছে।"

"তোমাদের তো কত আইনই পাশ হচ্ছে, কিন্তু তার কটাই বা ঠিকঠাক চলছে?"

"ঠিক কথাই বলেছ জন। জবাব দেবার কিছু নেই।"

"কাঞ্চন, তোমাকে তো কখনো রেসকোর্সে দেখি না ?"

"রেস খেলা কি ভালো জিনিস ? বেশির ভাগ লোকই তো টাকা গচ্চা দিয়ে আসে শুনেছি ?"

"বেশ কিছু লোক বাজী জিতেও পকেট ভর্তি করে আসে। ঘোড়া বাছতে জানলে মোটের ওপর ঠকতে হয় না। যাবে কাল আমার সঙ্গে ?"

"না, ওটা নাকি বিশ্রী নেশা, একবার পেয়ে বসলে সর্বনাশ।"

"পেয়ে না বসতে দেওয়া তো তোমার নিজেরই হাতে ? খুব ইণ্টারেস্টিং, চলই না একবার ?"



১৭

জন আর্মস্ট্রং যা বলে তা করেই ছাড়ে। রেসে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে একদিন। গাড়িতে উঠে দেখি মিস্ ফিশারও বসে আছে। মিস্ ফিশার হালে আমাদের অফিসে চাকরি নিয়েছে। সহসা এই তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে খুব খুশি হতে পারলাম না। জন আমাকে আগে বললে কক্ষনো আসতুম না।

"গুড আফটারনুন, মিস্টার সানিয়াল।"

"গুড আফটারনুন, মিস্।"

টাইট জীন্‌স্, টাইট জাম্পারে সজ্জিত মিস্ ফিশারের দেহের প্রতিটি ভাঁজ ফুটে উঠেছে উদ্ধতভাবে।

"শুনলাম তুমি এই প্রথম যাচ্ছ রেসে?"

"তুমি বুঝি আগেও গিয়েছ?"

"আমি প্রায়ই যাই মিস্টার সানিয়াল, খুব এক্সাইটিং।"

"তোমার কাছে যা এক্সাইটিং আমার কাছে তা ডিপ্রেসিংও হতে পারে। সকলের পছন্দ একরকম নয়।"

আর্মস্ট্রং সামনের সীটে বসে গাড়ি চালাচ্ছে, আমরা দুজনে পেছনের সীটে। মিস্ ফিশার একটু সরে আমার কাছ ঘেঁষে বসল। আমি আরো একটু সরে বসলাম কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতে।

"মিস্টার সানিয়াল তুমি এখনো বিয়ে করনি, না?"

"না, করিনি।"

"বিয়ে স্থির হয়েছে?"

"না।"

"শীঘ্রই স্থির হবে?"

"তাও না।"

"মন্দ নয়।"

"কি মন্দ নয়?"

"এক জায়গায় বাঁধা না পড়ে খুশিমতো চলতে পারাটা।"

"তুমি বাকদত্তা?"

"না।"

"শীঘ্রই হবে?"

"তাও না।"

"মন্দ নয়।"

"কি মন্দ নয়?"

"খুশিমতো রেস খেলে টাকা ওড়ানোটা।"

হাসতে-হাসতে ও আমার গায়ে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিল, আমি ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিলাম।

"মাপ করবেন, মিস্টার সানিয়াল!"

"কিসের জন্যে মাপ করব?"

"খুব হাসি পাচ্ছিল বলে।"

"হাসতে তোমাকে কেউ মানা করেনি মিস্, কিন্তু হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়।"

"গাড়ি ঝাঁকানি দিয়েছিল, টাল সামলাতে পারিনি।"

"ও, তাই নাকি?"

ওর হাতে একখানা রেসিং গাইড ছিল, আমার সঙ্গে সুবিধে না করতে পেরে সেটা খুলে পড়তে লাগল।

আমিও একটি সিগারেট ধরালুম।

"আমাকে একটা দেবে মিস্টার সানিয়াল?"

"দেখে মনে হয় তোমার বয়েস এখনো আঠারো হয়নি, এ-বয়েসে সিগারেট খাওয়া ভালো নয়।"

"কেন ঠিক নয়?"

"স্বাস্থ্যের দিক থেকে।"

"স্বাস্থ্য আমার খুবই তো ভালো?"

"তবে মুখটি এত ফ্যাকাশে কেন? বেশি পাউডার ঘষেছ?"

"ভারি রূঢ় তুমি মিস্টার সানিয়াল, দেবে না তো?"

"এই নাও।"

"এখন ধরিয়ে দাও দয়া করে। আমার সঙ্গে লাইটার নেই।"

"আমার কাছেও লাইটার নেই, তবে দেশলাই আছে।"

"তোমার মুখের সিগারেট থেকেই ধরিয়ে নিচ্ছি তাহলে, এই হাওয়ায় দেশলাই দিয়ে ধরাতে পারব না। দয়া করে মাথাটা একটু এগিয়ে দাও।"

"মাথাটা আমার জায়গামতোই থাক, এই নাও আমার সিগারেট, তোমারটি ধরিয়ে নাও।"

জন আর্মস্ট্রং একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে প্রচণ্ড ভিড়, পিলপিল করছে গাড়ির সারি, ঘন-ঘন হর্নের আওয়াজ সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে গাড়িগুলোর পাশ কাটিয়ে পথ করে নেওয়ার দুরন্ত প্রচেষ্টা।

"তোমার কোনো বান্ধবী আছে মিস্টার সানিয়াল? সে কি সিগারেট খায় না?"

"বান্ধবী আছে বই কি, কিন্তু সে সিগারেট খায় না।"

"দেখতে কেমন? আমার চাইতেও ভালো?"

"বলতে পারি না।"

"আমার চাইতেও স্মার্ট?"

"বেশি স্মার্ট মেয়ে হয়তো পছন্দ করি না।"

"ঠাট্টা করছ?"

"হতেও পারে যে ঠাট্টা ঠিক করছি না।"

মিস্ ফিশারের বোধহয় রাগ হচ্ছিল আমার ওপর, আমার দেওয়া সিগারেটটা শেষ না হতেই জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

খেলার মাঠে, রেসের মাঠে গেলে মনে হয় যেন একটা ক্ষ্যাপা ভূত সকলের কাঁধে ভর করেছে। দামালপানা, হৈহৈকার ও চ্যাঙড়ামির সেই হাটে বর্ণবৈষম্য শ্রেণীবৈষম্য বয়সবৈষম্য ধুলোয় গড়াগড়ি।

অনেক কায়দাকসরতের পরে আর্মস্ট্রং গাড়ি রাখবার জায়গা যোগাড় করে নিল।

আমার বাজী রাখবার ইচ্ছে ছিল না। দেখতে এসেছি, দেখে ফিরে যাব

নির্লিপ্তভাবে। কিন্তু আর্মস্ট্রং ও ফিশার নাছোড়বান্দা, 'সানিবয়' ও 'রোডস্টার' নামের দুটো ঘোড়ার উপর টিকিট কিনিয়ে ছাড়ল।

ওরা ভরসা দিল 'উইন' না হলেও এর একটা ঘোড়া 'প্লেস' নির্ঘাত পাবে। এ দুটো কথার মানে জানি না। ওরা দুজনে এ দুটো ছাড়াও আর একটা ঘোড়ার উপর টিকিট কিনল। ওদের কথাবার্তার অনেকটাই আমার বোধগম্য হল না, এ শাস্ত্রে আমি অর্বাচীন।

মিস্ ফিশার ও আর্মস্ট্রং পাশাপাশি বসেছে। ঘোড়াগুলো ছুটছে, ওদের চোখও ছুটছে ঘোড়াগুলোর পেছন পেছন। উত্তেজনায় ওরা ভুলে যাচ্ছে আমিও ওদের সঙ্গে আছি। সেই আত্মবিস্মৃতির দুর্বল মুহূর্তে ওদের ঘনিষ্ঠ ঘনীভূত ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল না যে পদবৈষম্যটা ওরা বজায় রেখেছে। সম্পর্কটি যে কর্মস্থলের বাইরে অনেক দূর এগিয়েছে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

বিকেল পাঁচটায় ঘোড়দৌড় ভাঙল। সারি-সারি গাড়ির দঙ্গল, পিলপিল করছে লোকের ভিড়। আর্মস্ট্রং বহুকষ্টে গাড়ি নিয়ে চৌরাস্তা পর্যন্ত এগোল। আধঘণ্টায় সিকি মাইল অতিক্রম। সামনে ট্রাফিক লাইট, লাল বাতি জ্বলে উঠেছে, সুতরাং পুনরায় ছেদ পড়ল আমাদের অগ্রগতিতে।

মিস্ ফিশার বলে উঠল, "মিস্টার সানিয়াল, তুমি জোর বরাত দেখিয়েছ আজ। আমরা দুজনে ষাট টাকা করে পেয়েছি, তুমি ভয়ে-ভয়ে কম টাকার বাজী রেখে পেয়েছ মাত্র ছাব্বিশ। তবুও তো পেয়েছ এই প্রথম দিনেই? কি খাওয়াবে বল?"

"লাভের কড়ি পকেটেই থাক, খরচা করব কেন?"

"প্রথম দিন যে পায় সে খাওয়ায়, বি এ স্পোর্ট সানিয়াল!"

"কি খেতে চাও? কোকোকোলা, না চা?"

"ধ্যেৎ, ও-সব খেতে যাব কেন? বড্ড ক্লান্ত লাগছে, একটু স্টিমুলেণ্ট দরকার।"

"তাহলে চায়ের বদলে কফি? কফি বেশ ভালো টনিক।"

"চা-কফির সময় চলে গেছে, এখন প্রায় ছটা বাজে।"

কখন যে আর্মস্ট্রং গাড়ি চালিয়ে আমাদের কার্পোর সামনে নিয়ে এসেছে খেয়াল করিনি।

"কাঞ্চন, নেমে এস, চল ওপরে লিডো বারে। মেয়েটা হুইস্কি না খেয়ে ছাড়বে না। আমিও তৃষ্ণার্ত। সুতরাং হে বন্ধু, বন্ধুর কর্তব্য পালন কর।"

মিস্ ফিশার অর্ডার দিল তিন গ্লাস হুইস্কির। সঙ্গে-সঙ্গে চলে এল আলুভাজা আর ককটেল সসেজের প্লেট।

"আঃ, এক চুমুকেই শরীরটা চাঙ্গা হল মিস্টার সানিয়াল।"

"এক চুমুকেই গ্লাসটি প্রায় খালি করেছ মিস্ ফিশার, শরীর তোমার কতখানি চাঙ্গা লাগছে জানি না, কিন্তু মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে।"

"প্লিজ, একটা সিগারেট।"

"এই নাও।"

"ধরিয়ে দাও, ডিয়ার।"

ধরিয়ে দিতে হল। এবং রাগও হল আর্মস্ট্রং-এর ওপর। এসব মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করলে ওরা লাই পেয়ে মাথায় চড়তে চায়। আমাকে ও 'ডিয়ার' সম্বোধন করে কোন সাহসে? টেবিলের তলায় আর্মস্ট্রং-এর জুতোয় আমার জুতো দিয়ে ঠোক্কর মারলাম। আর্মস্ট্রং বুঝতে পেরে একটু বোকা হাসি হাসল মাত্র।

মিস্ ফিশার কখন যে ইশারা করেছে দেখিনি, বয় আর তিন গ্লাস এনে হাজির করল। বললাম, "মিস, কে খাওয়াচ্ছে আর কে খাচ্ছে বুঝতে পারছি না, অর্ডার যখন দিচ্ছ তখন বিল শোধ তুমিই করবে মনে হচ্ছে।"

"তুমি খাওয়াচ্ছ মিস্টার সানিয়াল, আমরা তিনজনেই খাচ্ছি, তিনজনেই আনন্দ পাচ্ছি। তুমি আমাদের খাওয়াচ্ছ বলে বিল শোধ তুমিই করবে, ডার্লিং।"

আর্মস্ট্রং নিজে চুপ, মজা দেখছে। জুতো দিয়ে আবার এক ঠোক্কর মারলাম ওর জুতোয়। ও আমার সিনিয়ার, ওর সামনেই মেয়েটা আমাকে ডার্লিং সম্বোধন করতে সাহস পেল?

"তোমার বাড়িতে তোমার কে-কে আছে, মিস্?"

ওর চোখ ঢুলু ঢুলু, ঠোঁট বেঁকিয়ে জবাব দিল, "কেউ নেই, মিস্টার সানিয়াল, তোমরা এ-দুজন ছাড়া আমার আপনজন কেউ নেই।"

"এখান থেকে বাড়ি যাবে তো?"

আর্মস্ট্রংই জবাব দিল, "ওকে আমিই বাড়ি পৌঁছে দেব, তোমার ভাবতে হবে না।"

"সেটা আরো ভাবনার কথা, জন।"

"জীবনটা উপভোগ কর, কাঞ্চন। হেসে নাও দুদিন বই তো নয়!"

মিস্‌ ফিশার হি-হি করে হেসে উঠল। ডাকল, "বয়!"

ধমক দিলাম, "আবার অর্ডার দিচ্ছ?"

"অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে, এখন বাতিল করার পক্ষে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।"

"মিস্‌ ফিশার!"

"উপভোগ করে নাও জীবনটাকে। কাল রবিবার, তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠবার তাড়া নেই। এই এসে গেছে তিন গ্লাস।"

"আমি আর একগ্লাসও ছোঁব না।"

"তবে আমিই খাইয়ে দেব। ছোঁয়া হবে না কিন্তু খাওয়া হবে তোমার। এস ডার্লিং, ফুর্তিটা মাটি করো না।"

যে-ছাব্বিশ টাকা রেস খেলে পেয়েছিলাম তার ওপর গোটা কুড়ি টাকা খরচা হয়ে গেল। আমাকে বাড়ি নামিয়ে দিয়ে, জন চলে গেল বান্ধবীসহ।

সুরা ও নারী এমনি করেই পুরুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। সুরার সঙ্গে নারীর মোহ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে।

ঘোষাল সাহেবের অনুপস্থিতিতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের কাজ খুব মন্দ চলছে না। ফেদার্স্টোন অ-খুশি নয়, তবে মাঝে-মাঝে আমার চিঠির খসড়া ছেঁটে-কেটে দেয়। বলে, "তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, একটা বড় কোম্পানীর তরফ থেকে লিখছ মনে রেখ। যা বলতে চাও সোজা ভাষায় লিখবে, যেখানে কড়া কথা বলার দরকার সেখানে কড়া কথাই লিখবে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলার দরকার নেই।"

শিক্ষানবীসের পক্ষে এ-সব উপদেশ মূল্যবানই বটে।

আমাকে একা-ঘরে পেয়ে ভেঙ্কট, আর্মস্ট্রং, দিগলানী, দুবে আর কোঠারী প্রায়ই আসে। ওরা বলে আমার একটা আলাদা ক্যাবিন থাকলে ভালো হয়, মাঝে মাঝে এসে আড্ডা দেওয়া যায় তাহলে।

বড়সাহেব ফার্গুসনও একদিন এসে হাজির হল।

"কাজকর্ম কেমন চলছে, ইয়ংম্যান?"

"মন্দ নয়।"

"খেলাধুলো কিছু করছ ? আগে শরীরটা দোরস্ত রাখা দরকার। কোনো ক্লাবের মেম্বার হয়েছ ?"

"না।"

"তোমার প্রবেশনারি পিরিয়ড তো শেষ হয়ে এল। কনফার্মড হলে ক্লাবখরচা কোম্পানীই দেবে। আজ সন্ধ্যেয় কি করছ ?"

"তেমন কোনো এনগেজমেন্ট নেই।"

"তবে চলে এস আমার ফ্ল্যাটে। ডিনার খেয়ে ফিরবে। বারো নম্বর ক্যামাক স্ট্রীট, দোতলা। সাড়ে-সাতটায় তোমার সুবিধে হবে ?"

"হবে, ধন্যবাদ।"

বুড়ো বেরিয়ে যেতেই ছুটলাম আর্মস্ট্রং-এর ঘরে। বললাম, "আজ রাতে আমার গাড়ির দরকার।"

"বসো, বসো, কাঞ্চন, কি ব্যাপার ? কোথাও অভিসারে যাচ্ছ ?"

"হ্যারি ফার্গুসন ডিনারের নেমন্তন্ন করেছে।"

"হ্যারি তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে ? বল কি ?"

"এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?"

"ও তো বাড়িতে কাউকে সন্ধ্যের পরে যেতে বলে না ? গত তিন বছরে অন্তত কাউকে বলেনি। সখা, তুমি ভাগ্যবান।"

"একটা গাড়ি দিতে পারবে ?"

"দিতেই হবে বন্ধু। কর্তার ওখানে যখন নেমন্তন্ন তখন তো আর না বলা চলে না।"

"ঠাট্টা রাখ জন। তুমি না বলবার লোকই নও জানি। কোন গাড়ি যাবে ?"

"কখন চাও ?"

"সাতটা পনেরো।"

"তোমার গ্যারেজ আছে ?"

"জানোই তো যে নেই।"

"তবে ড্রাইভারকে রেখে দিও, তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে এখানে ফেরত আসবে। গুরুদ্দীন ড্রাইভার নতুন অ্যাম্বাসাডারখানা নিয়ে যাবে। আরে, এখুনি উঠছ যে ?

একটু বসই না। সন্ধ্যেটা তোমার আজ মাটি হবে মনে হচ্ছে বুড়োবুড়ির পাল্লায় পড়ে।"

কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে-সাতটার সময় হাজির হলাম ফার্গুসনের ফ্ল্যাটে। বিরাট ড্রইংরুম, অল্প কিন্তু দামী আসবাব, একদিকের সমস্ত দেয়াল ভর্তি কাঁচের আলমারিতে থৈ-থৈ করছে বই। গালচের দামই হবে বোধ হয় তিন-চার হাজার টাকা, খাঁটি বুখারার কার্পেট।

হ্যারি ফার্গুসনের মাদ্রাজী মেমসাহেবের পরনে শাদা সিল্কের শাড়ি। মুখে, নখে কোনো রঙচঙ নেই, কিন্তু আছে বুদ্ধির দীপ্তি ও স্মিতহাস্যের ছটা। নিজেই নিয়ে এলেন একগ্লাস আনারসের রস। বললেন, "বাড়িতে আমাদের হুইস্কি, বিয়ার, জিন থাকে না, তোমার কি অসুবিধে হবে মিস্টার সানিয়াল?"

"আমাকে দয়া করে মিস্টার বলবেন না মিসেস ফার্গুসন, আমার নাম কাঞ্চন।"

"ভারি মিষ্টি নাম তো? মানে কি?"

"কাঞ্চন মানে সোনা, গোল্ড।"

"বাঙলা ভাষায় একটা কথা আছে না সোনার চাঁদ?"

"আছে বটে, কিন্তু চাঁদ কখনো সোনার হয় না, সোনার চাঁদ কথাটা নিছক ভাবালুতা।"

কিছুক্ষণ পরে খাবার এল। তিনটে বয় হুজুরে হাজির এবং ছোটাছুটি করছে। ডালের স্যুপ, চিকেন রোস্ট এবং এক রকম স্প্যানিস পুডিং। চমৎকার রান্না।

মিসেস ফার্গুসন শুধু খেলেন তরকারির স্যালাড!

"বড় মুটিয়ে যাচ্ছি, তাই রাতের বেলা বিশেষ কিছু খাই না, কাঞ্চন।"

"শরীর টিকবে কেন এত অল্প খেলে?"

"কম খেলেই শরীর ভালো থাকে। বেশি খেয়েই লোকে অসুখ বাধায়। দিনে একবার খাওয়াই যথেষ্ট। সাধুসন্ন্যাসীরা একবার মাত্র খায়।"

"সাধুসন্ন্যাসীদের কথা আলাদা, তারা ঠায় বসে ধ্যানধারণা করে, আমাদের ছুটোছুটি করে কাজকর্ম করতে হয়।"

"তোমাদের বয়সে দুবেলা কেন চারবেলা খাওয়া উচিত কিন্তু আমাদের কথা আলাদা।"

বিলিতি ধাঁচে বলতে যাচ্ছিলাম হ্যারি কোথায়। মুখে তা আটকে গেল এই বর্ষীয়সী ভারতীয় মহিলার কাছে। বললাম, "আপনার স্বামী কোথায়? তাঁকে তো দেখছি না?"

"এই এসে পড়লেন বলে, তুমি কফি খাও।"

"বাইরে গেছেন?"

"না, গুরুজীর কাছে শিখছেন।"

"শিখছেন? কি শিখছেন জিগগেস করতে পারি কি?"

"যোগ।"

কফির কাপ মুখে তুলতে যাচ্ছিলাম, অবিশ্বাস্য উত্তরটির ধাক্কায় অবাক হয়ে রেখে দিলাম যেখানে ছিল। হ্যারি খাঁটি ইউরোপীয়ান, সারাজীবন কাটিয়েছে ব্যবসার পেছনে, এখন শিখছে যোগ ওর গুরুজীর কাছে?

মিসেস ফার্গুসন লক্ষ্য করছিলেন আমাকে। শুধু লক্ষ্যই করছিলেন না হয়তো মনের কথাও বুঝে ফেললেন। ওঁর ছেলের বয়সী আমি, লুকোতে পারবই বা কেন? বললেন, "অ্যানি বেসাণ্ট, পল ব্রাণ্টন, জাস্টিস উড্রফ, কৃষ্ণমূর্তি অথবা শ্রীঅরবিন্দের কোনো বই পড়েছ?"

"না, পড়িনি।"

"পড়বার বয়েসও তোমার হয়নি। শরীর ও মনের পক্ষে যোগের মতো আর কিছুই নেই। হ্যারি এই তিন বছর যোগ শিখছেন, আশ্চর্য উপকারও পেয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আমার দেখা পাঁচ বছর আগে, তখনকার হ্যারি এবং এখনকার হ্যারি যেন দুটি আলাদা মানুষ।"

"প্যাণ্ট সার্ট পরে কি যোগ শেখা যায়? শুনেছি আসনগুলো খুব শক্ত।"

মহিলাটি হেসে ফেললেন, বললেন, "ওগুলোর দরকার হবে কেন? লেংটি পরে খালিগায়ে কি ঘণ্টা দুই থাকা যায় না? বেদিং ট্রাঙ্ক পরে কি তোমরা সাঁতার কাটো না?"

লেংটি আঁটা খালিগায়ে হ্যারির চেহারা কল্পনা করে আমারও হাসি পেল, কিন্তু পাশের দরজা দিয়ে ডাইনিং রুমে যে হ্যারি ঢুকল তার গায়ে শাদা সার্টের ওপর একটা চকচকে লাল টাই ঝুলছে এবং নিম্নাঙ্গে শাদা সার্কস্কিনের জেল্লাদার ট্রাউজার। আমার কল্পনাটা বাস্তবের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল।

"ভেরি সরি মাই ডিয়ার বয়, দেরি হয়ে গেল।"

"মিসেস ফার্গুসন খুব যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন, বেশ গল্পগুজব চলছে।"

মিস্টার ফার্গুসনের গলার আওয়াজ পেয়ে তুটো খানসামা ছুটে এল। একজনের হাতে এক কাপ তুধ, আর একজনের হাতে একপ্লেট ফলের পুডিং।

"আজ তোমার সঙ্গে বসছি বলে এই পুডিং খাচ্ছি, নইলে এক কাপ তুধই আমার সান্ধ্যভোজ।"

"অফিসে তো মাছ-মাংস খাও?"

"দিনের বেলায় চলে, রাতে অল্প খেলে শরীর হাল্কা থাকে।"

"শুনলাম যোগশিক্ষা করছ?"

"মন্দ কি? যা শেখা যায় তাতেই কিছু-না-কিছু জমা পড়ে লাভের খাতায়।"

মিসেস ফার্গুসন হেসে বললেন, "হ্যারি ব্যবসাদার কিনা, তাই লাভের অং ভালো বোঝে!"

জিগগেস করলাম, "কোনো উপকার বোধ করছ হ্যারি?"

"মেজাজ ঢের ভালো হয়েছে, শরীর খুব হাল্কা লাগে, অসুখবিসুখ কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। মনে ও দেহে যদি ফুর্তি থাকে তবে আর কি চাই বল, কাঞ্চন?"

ফার্গুসনদের ডাইনিং সেটটি তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলাম। প্রকাণ্ড লম্বা টেবিল যেন আয়নার মতো চকচক করছে। বারোটা চেয়ার, প্রত্যেকটির পেছনটা খুব উঁচু, সিংহাসনের মতো, কিন্তু এত হাল্কা যে একটি আঙুলে সরানো যায়। আমার উৎসুক দৃষ্টির গতিবিধি লক্ষ্য করে ফার্গুসনই সেই ঔৎসুক্যের নিরশন করে বলল, "ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন একবার বর্মা সফরে গেলে ওখানকার এক মস্ত বড় জমিদার তাঁকে ডিনার দেবার জন্যে এই ডাইনিং সেট তৈরি করায়। কি কাঠ মনে নেই তবে এ-রকম হাল্কা অথচ মজবুত কাঠ নাকি আর কোথাও নেই। শুনে আমারও রোখ চেপে গেল কিনে নিতে। আমরা তখন বর্মা থেকে সেগুন কাঠ আমদানী করতাম, এজেন্টকে লিখে দিলাম যত টাকাই হোক এটা আমার চাই-ই চাই। এখন ভাবি কি দরকার ছিল? কি বল সরোজা?"

সরোজা, ওরফে মিসেস ফার্গুসন কথা বললেন না, শুধু হাসলেন। মহিলাটির বয়েস বোধহয় পঞ্চাশের কাছাকাছি পৌঁচেছে, কিন্তু হাসিটি কিশোরী মেয়ের মতো সরল ও উজ্জ্বল। কে বলে আসন্ন বার্ধক্য স্ত্রীলোকের শ্রী শুষ্ক করে? বার্ধক্যের একটি

নিজস্ব শ্রী আছে, সে শ্রী মহিমামণ্ডিত, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মিসেস ফার্গুসন কৃষ্ণকায়া, প্রৌঢ়ত্বের মেদাধিক্য সুস্পষ্ট, শুধু হাসিটিই ওঁর সুন্দর।

মিসেস ফার্গুসনের হাসি আমার স্বর্গত মাতৃদেবীকে স্মরণ করিয়ে দিল। মা ছিলেন খুব সুন্দরী, এই মাদ্রাজী মহিলার সঙ্গে তাঁর কোনোই তুলনা হয় না, কিন্তু তাঁর হাসিও ছিল অনেকটা এরকমের। কবির ভাষায় নয়ন অন্তরের গবাক্ষ। হাসি দেখে মনের পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় বইকি ?

"চুপ করে আছ যে ইয়ংম্যান ?"

"বেশি খাওয়া হয়ে গেছে।"

"তবে আর তোমাকে ধরে রাখব না। সঙ্গে গাড়ি আছে ?"

"আছে।"

"সরোজা, কাঞ্চনকে তোমার বইগুলোর এক-এক কপি দিতে পার ?"

মিসেস ফার্গুসন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন লেখক হিসাবে আমার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায়। কিন্তু হ্যারিও ছাড়বে না, সে নিজেই উঠে গিয়ে চারখানা বই নিয়ে এল এবং ফাউণ্টেন পেন এগিয়ে দিয়ে বললে—"দাও, নাম লিখে দাও।"

বাড়ি ফিরলাম দশটার আগে। বাইরে খেলে এমনটি সচরাচর হয় না।

হারীণদা চোদ্দ দিন পরে ফিরে এলেন। বললেন, "আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছ না কেন ?"

"ব্যাটাদের টিট করে এসেছেন বুঝি ?"

"আমার ছেলে হয়েছে যে ? আর একটি বংশধরের আবির্ভাব !"

"কই আমাকে তো কেউ কিছু জানায়নি ? মিসেস ঘোষালের কোনো কাজে লাগতে পারলে খুশি হতাম, বিশেষ করে আপনি যখন এখানে ছিলেন না।"

"বোধহয় উনি দরকার মনে করেননি। ডক্টর মুখার্জীই সব বন্দোবস্ত করেছেন। ছেলে হবার খবরটাও উনি দিয়েছেন আমাকে।"

"ভালোই করেছেন, নইলে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হত।"

"দশ বছর আগে এই দ্বিতীয় বংশধরের আগমন সংবাদে কি করতাম জানো ?"

"আমাদের পেট ভরে খাওয়াতেন।"

"হাওড়া থেকে সোজা চলে যেতাম ডক্টর অমৃত মুখার্জীর বাড়ি। লর্ড সিনহা রোডে, নেমপ্লেটে যেখানে লেখা আছে ডক্টর এ. মুখার্জী এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. ও. জি.। তারপর এ দুই হস্তে কীচকনিধনপর্ব শেষ করে রাতারাতি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতাম হিমালয়ের গভীর অরণ্যে। হায়রে, কাকেই বা কি বলছি? তুমি তো মহাভারত পড়নি? কীচক কে, কে তাকে মারলে, কেন মারলে কিছুই তো জানো না?"

"পড়েছি।"

"তারপরে হাসপাতালের সেই উচ্চ পদ হত শূন্য। এ অফিসের এই চেয়ারটাও হত শূন্য। কিন্তু রক্তের জোর এখন কমে গেছে, হাতের জোরেও ভাঁটা পড়েছে, রেস্পেক্টেবিলিটির লেবেলটাও এঁটে ধরেছে। আর দশজন গণমান্য ভদ্রলোকের মতোই ভদ্রতার খোলস রেখেই চলতে হবে। আজ অফিসের পরে, নার্সিং হোমে যাব শান্তপদক্ষেপে, নবজাত সন্তানের মুখ দর্শন করে ধন্য হতে। নইলে লোকে কি বলবে?"

হারীণদা কোটটি হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে না রেখে তাঁর চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে বললেন, "তুমিও আমার সঙ্গে যাবে কাঞ্চন?"

"আমি?"

"হ্যাঁ তুমিও। প্রবঞ্চিত স্বামী যদি তার স্ত্রীর কোলে পরপুরুষের সন্তান দেখে নিজের প্রতি বিশ্বাস না রাখতে পারে? যদি ধৈর্য হারিয়ে স-বৎসা সেই স্ত্রীর টুঁটি টিপে হত্যা করে বসে? তাই একজন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। এখন চললাম হ্যারি ফার্গুসনের ঘরে, অনেক কথা আছে তার সঙ্গে।"

ঘণ্টা দুই হারীণদার দেখা নেই। একটির পর একটি সিগারেট ধ্বংস করছিলাম। এয়ারকণ্ডিসণ্ড ঘরে সিগারেটের গন্ধ থিতিয়ে থাকে, জানলা খুলে দিলাম। বেয়ারা চিন্তামণি বারাককে ডেকে জোর ধমক দিলাম, "এ জানলাটা রোজ ঝাড়পোঁছ করা দরকার তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে?" চিন্তামণি উড়িষ্যার লোক, অতি চালাক, সেলাম করতে ওস্তাদ, কিন্তু তেমনি ফাঁকিবাজ।

একফাঁকে মিস্ টেভারেস এসে আমতা-আমতা করে নিবেদন করলে, "মিস্টার সানিয়াল, ছ-মাস পরে চাকরি পাকা হবে মিস্টার ঘোষাল বলেছিলেন। আজ ছ-

মাস পনেরো দিন, অথচ কনফার্মেশনের চিঠি পেলাম না। আমার কাজে কি তোমরা খুশি নও?"

"তুমি আর আমি একই দিনে কাজে যোগ দিয়েছি। আমিও পাইনি। এ-সবের ভার তো মিস্টার আর্মস্ট্রং-এর ওপর, ও বোধহয় ভুলে গেছে।"

"না ভোলেনি। আমি এইমাত্র তাকে জিগগেস করেছিলাম, বললে মিস্টার ঘোষালের হুকুম এখনো পায়নি।"

"তোমার বিয়ে হচ্ছে কবে? নেমন্তন্ন কবে খাচ্ছি?"

"মা'র শরীর খারাপ যাচ্ছে, একটু ভালো হলেই......"

"সে না করপোরেশনে কাজ করে বলেছিলে?"

"ক্যালকাটা করপোরেশনে নয়, ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে।"

"কোথায় থাক তুমি?"

"রিপন স্ট্রীটে, সার্কুলার রোডের মোড়টায়। বাড়িটা ভালো নয়, তবে ট্রাম-রাস্তার কাছে, বাজারের কাছে, অনেকদিন আছি বলে ভাড়াও কম।"

আমি যে ওর কাছেই থাকি সে কথাটা চেপে গেলাম। আমার সহকর্মীরা সকলেই ভালো-ভালো পাড়ায় থাকে, শুধু আমিই আছি চুনো-পুঁটিদের পাড়ায়। না, বেশিদিন ওখানে থাকা আর পোষাবে না। স্বর্গত স্যার কে. বি. সানিয়াল, এডভোকেট-জেনারেলের পুত্র কাঞ্চন যদিও গা-ঢাকা দিয়ে থেকে যেতে পারত একটা বাজে পাড়ায়, মিস্টার কে. বি. সানিয়াল একটি বড় বিলিতি কোম্পানীর অফিসার হয়ে সেখানে আর থাকতে পারবে না বেশিদিন।

ডোরিন গ্রে? সে আমার কে? ওর স্টেটাসই বা কি? রুডলফ ম্যাক্সিম? একটা সাঁইবুড়ো পাগলাটে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বই তো নয়? আমি বংশগৌরবে ধন্য, এখন পদগৌরবও হয়েছে, ওদের সঙ্গে আমার একবাড়িতে থাকা ভালোও দেখায় না।

অফিসফেরতা যেতে হল নার্সিং হোমে, হারীণদার সঙ্গে। মিসেস ঘোষাল শুয়ে আছেন, মাতৃত্বের ঋণ শোধ করতে শাদা মুখ আরো একটু ফ্যাকাশে হয়েছে, চোখের কোণে কালি পড়েছে। পাশে ছোট্ট খাটে নবজাত শিশু। মনে যতই তোলপাড় হচ্ছিল না কেন, হারীণদা দিব্যি শান্তভাবেই জিগগেস করলেন, "কেমন আছ ডার্লিং?" স্ত্রীর গালে চুমোও খেলেন, যেমন ওদের সমাজে চলতি আছে। জিগগেস করলেন, "কী নাম রেখেছ বেবীর?"

আমাদের নামকরণ হয় অন্নপ্রাশনের সময়, পুরো ছ-সাত মাস সে অমুকের ছেলে, বা অমুকের মেয়ে, অথবা নতুন খোকা বা নতুন খুকি হয়ে বেনামে নবিসী খাটে। শাদাবাচ্চাদের ব্যক্তিত্ব জন্মের পরের দিন থেকেই নিজস্ব নামেই পাকাপাকি হয়।

দশমিনিটের মধ্যেই আমরা নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে এলাম। হারীণদা গাড়িতে আসতে-আসতে শুধু একবার মুখ খুললেন, "কোকিলের ছানা কাকের বাসায় বড় হয় জানো কাঞ্চন?"



১৮

ডোরিন গ্রে প্যাসেজে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে আসতে দেখে ওর ঘরের দিকে পা বাড়াল। ডাকলাম, "ডোরিন, একটু দাঁড়াও!"

মুখ নিচু করে ও দাঁড়িয়ে রইল, যেন ধরা পড়ে গেছে এই লজ্জায়।

"আমি কি বাঘ না ভালুক যে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছ?"

"ভয়ে না লজ্জায়, মিস্টার সানিয়াল।"

"তোমার ঘরে চল, দাঁড়িয়ে-দাড়িয়ে কথা বলতে ভালো লাগে না।"

ও বসতে বলল না দেখে আমিই একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। বললাম, "কিসের এত লজ্জা, ডোরিন?"

"সেদিন বড্ড ছেলেমানষি করে ফেলেছিলাম, তুমি হয়তো ভাবলে আমি বেহায়া।"

"তোমার মাথায় একটু রঙ চড়ে গিয়েছিল, আমি কিছু মনে করিনি।"

"রাগ করনি? অথবা আমার ওপর ঘেন্না হয়নি তোমার?"

"মোটেই নয়।"

"ঠিক বলছ মিস্টার সানিয়াল?"

"আবার মিস্টার? বল কাঞ্চন।"

"কিন্তু আমার ক্ষমা চাইতেই হবে। যা করে ফেলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাওয়া দরকার।"

"এখানে তিনটে চেয়ার ছিল, এখন দুটো কেন?"

"তিনখানার দরকার নেই, কে-ই বা আসে?"

"ভিতরের ঘরে নিয়েছ?"

"না।"

"তবে কি একেবারেই ভেঙে গেছে?"

"না, বিক্রি করেছি।"

"কেন?"

"টাকার দরকার ছিল।"

"আমার কাছে ধার চাইলেই তো পারতে?"

"শোধ দিতে পারতাম না।"

গলাটা আমার যেন কেমন ধরে এল। ভাগ্যের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে মেয়েটিকে আসবাবপত্র বিক্রি করে চালাতে হচ্ছে। ও যদি সর্টহ্যাণ্ড শিখত তবে একটা বাঁধামাইনের চাকরি পেত। ওর যা জীবিকা তাতে রোজগারের জোয়ার-ভাঁটা তো অনিশ্চিততায় কণ্টকিত! ছেলের স্কুলের খরচা দিয়ে নিজের খরচা কুলোনো কি এ-রেস্টরাণ্ট ও-রেস্টরাণ্টে ছুটকো-উটকো কণ্ট্রাক্ট দিয়ে বারোমাস সম্ভব হয়? একটা পুরনো চেয়ার বিক্রি করে আর কতই বা পেয়েছে?

"ডোরিন, আমি তোমার পাশের ফ্ল্যাটে থাকি, সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী, চাইলে খুশিই হতাম। মুশকিলের সময় প্রতিবেশী যদি প্রতিবেশীকে সাহায্য না করে তবে আর কে করবে? বিশেষত তোমার তো কোনো আত্মীয়স্বজন নেই? সুদিন দুর্দিন সবারই আছে। আমারও কেউ নেই কলকাতায় আপন বলতে, যদি আমার দুর্দিন আসে তবে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতেই হবে আমাকে। এর মধ্যে লজ্জা বা সঙ্কোচের কি আছে?"

জবাব এল, "তোমার কাছে চাইতে যাব কেন? তোমাকে আমি বেশিদিন চিনি না, আর আমাকেও তো তুমি বেশি দিন ধরে চেনো না?"

জবাবটির রূঢ়তায় আশ্চর্য হলাম, আঘাতও পেলাম। বললাম না কিছু, চেয়ারের হাতলে ওর হাতটা ছিল ধরতে গেলাম, হাত সরিয়ে নিল। বোধহয় সেদিনকার ঘটনাটা ও ভুলতে পারছে না। নিজের রূঢ়তা শুধরে নিতে সহজ গলায় বললে, "তুমি অফিস থেকে আসছ, চা নিয়ে আসব?"

"তোমার কাছ থেকে অনেক কাপ চা খেয়েছি। আর দরকার নেই বলব না, তবে তোমাকে আজ কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে, থাক।"

"চলে যেও না বলছি, বসো, চা নিয়ে আসছি।"

উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, আবার বসে পড়লাম। আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই ডোরিন ভিতরে চলে গেছে। ঠিকই বলেছে ও, আমাদের পরিচয় বেশি দিনের নয়।

কারু বাইরেটা দেখে চেনা যায় না, সত্যি। আমি কেমন লোক ও কি করে জানবে। ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, ওদের জাতটাও খুব পছন্দ করি না বটে। তবু মনে হয় ওর সঙ্গে আমার পরিচয় যেন বহুদিনের, আমার অভিপ্রায়কে ওর সন্দেহ করা অন্যায়।

কয়েকদিন আগেই ভাবছিলাম এ-বাড়ি ছেড়ে ভালো পাড়ায় বড় ফ্ল্যাটে উঠে যাব। তাড়াতাড়ি যাওয়াই বোধহয় ভালো। কিন্তু ডোরিন যে বড় দুঃখী, বড় অসহায়? ওর অবস্থা তো এখানে আর কেউ জানে না? কাছে থেকেও আমিই বা কি করতে পারছি? করতে গেলেও তো ও ভুল বুঝতে পারে? ওর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে। মেয়েটির অভাব আছে যথেষ্ট, কিন্তু এই আত্মসম্মানবোধও আছে বেশ প্রখর, তার পরিচয় আরো একদিন পেয়েছি।

চা এল। প্লেটে টোস্ট। টোস্টে খুব সামান্য একটু জ্যাম মাখানো, বোধহয় মাখন কিনবার পয়সা নেই। চায়ে চিনি কম, বোধহয় এ-জিনিসটারও অভাব আছে। দেখে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গতিপন্ন সংসারে মানুষ হয়েছি, অনটনের মুখ চোখে দেখিনি, দেখছি এখন কলকাতায় এসে, ওদিকে মুন্নাদি এদিকে ডোরিন। এদের থেকে দূরে চলে যেতে চাই, কিন্তু পারি না।

কি বলব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ডোরিনই কথা কইল আগে, "চা-টা বুঝি ভালো হয়নি?"

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল। বললাম, "চমৎকার হয়েছে, মেয়েলি হাতের ছোঁয়া না লাগলে সে-জিনিস পুরুষের মুখে ভালো লাগে না। যোশেফ এরকম চা করতে জানে না।"

"চা ছাড়া তোমাকে তো আর কিছুই খাওয়াতে পারি না, কাঞ্চন? এবার বিয়ে করে সংসারী হও, টুকটুকে বাঙালী বৌ, মেয়েলি হাতের ছোঁয়া রোজ পাবে।"

"তা-ই মনে-মনে ভাবছি। বিয়ের বয়েস তো হয়েছে, এখন তারিখটা ঠিক করে ফেললেই হয়।"

ডোরিন-এর মুখের লালচে ভাবটা যেন এক পলকে অন্তর্হিত হল। জোর করে হাসি এনে জিগগেস করল, "দেখাবে আমাকে মেয়েটিকে একটিবার?"

ও শিল্পী, অভিনেতা নয়। আমার চোখে ধরা পড়ে গেল এই ছলনা। বললাম,

"পরে দেখা যাবে, এখন একটি অনুরোধ আছে। আজ আমার চাকরির কন্‌ফার্মেশন পেয়েছি, মাইনেও বেড়েছে, তুমি আর ম্যাক আমার সঙ্গে বড় কোনো রেস্টরাণ্টে ডিনার খাবে চল।"

"আমার অন্য জায়গায় যেতে হবে, কাজে।"

"মিছে কথা। আজ একমাসের ওপর তোমার কোনো কাজ জোটেনি। এক-ঘণ্টা সময় আছে, প্রস্তুত হয়ে নাও। যাই ম্যাককে বলে আসি।"

বুড়োর ঘর খোলাই ছিল। ঢুকে আমি তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ম্যাক ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। সেই স্পেনিশ সুর, যা স্বপ্নে সেদিন শুনেছিলাম। ও-ই বাজাচ্ছিল সেদিন। চাষীর মেয়ে শেষবারের মতো প্রেমাস্পদ কাউণ্টপুত্রকে উদ্দেশ্য করে বিদায় সঙ্গীত নিবেদন করছে দূর থেকে। ম্যাক-এর চোখ দুটি বোজা, তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে।

বাজনা থামল। চোখ মেলে আমাকে দেখে বলল,"বসো কনি, এতক্ষণ তোমাকে দেখতে পাইনি।"

"দেখবে কি করে? তুমি যে ভাব-স্রোতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলে? তোমার মধ্যে তুমি ছিলে না, ছিলে ঐ সুরের মধ্যে।"

"ভাব হয়েছিল কিনা জানি না, তবে অভাবটা বোধ করছি।"

"এঞ্জেলীনার অভাব? তোমার চোখ ছলছল, মুখ লালবর্ণ। বিরহবেদনা?"

"শরীরে সোয়াস্তির অভাব, দারুণ সর্দি, একটু জ্বরও হয়েছে।"

"আমি যে তোমাকে আজ ডিনারে নিয়ে যেতে চাই।"

"কি ব্যাপার?"

"উৎসব! চাকরির পাকা হওয়ার উৎসব!"

"আনন্দে যোগদান করতে পারছি কই? এস ঘরে বসেই একটু উৎসব করা যাক। একা-একা খুব খারাপ লাগছিল।"

বুড়ো উঠে গেল ককটেল ক্যাবিনেটের কাছে, নিয়ে এল দু-গ্লাস। বলল, "কন্‌গ্রাচুলেশনস।"

"ধন্যবাদ, এটা কি দিয়েছ?"

"বুলডগ।"

"সেটা আবার কি?"

"রাম, ব্র্যাণ্ডি, লেবুর রস। লেবুতে আছে প্রচুর ভিটামিন 'সী,' ফুসফুস গলা নাকের পক্ষে ভালো। আর কে-কে যাচ্ছে?"

"কথা ছিল তুমি আর আমার পাশের ফ্ল্যাটের মিস্ গ্রে।"

"তোমাদের দুজনে জমবে ভালো। আমি তোমাদের কাছে হতাম বেসুরো বেখাপ্পা।"

ডোরিন প্রস্তুত ছিল। সেই সবেধন কালো পোশাকটি গায়ে। এটি ছিঁড়ে গেলে ও কি করবে জানি না।

"শেহরাজাদীতে গেছ ডোরিন?"

"গেছি। সেখানেই চল, খোলা জায়গায় গাছলতা আলোর মালার মধ্যে বসতে ভালোই লাগবে। তবে ওদের অর্কেস্ট্রাটি খুব উঁচুদরের নয়।"

"তোমার মতো ও-বিষয়ে ওস্তাদ আমি নই, আমার তো ভালোই লাগে।"

"কাঞ্চন, তুমি নাচতে জানো? বল্ ডান্সিং?"

"একটু, কিন্তু ভালো জানি না বলে সেটুকু নিয়ে সাহস পাই না।"

"শিখবে আমার কাছে?"

"কত চার্জ তোমার?"

"খুব বেশি চার্জ। লাখ টাকার একখানা চেক লিখে দাও।"

"তবে আর শেখা হল না।"

"না হওয়াই ভালো। ভালো ছেলে তুমি, নাচ শিখলে নষ্ট হয়ে যেতে পার।"

শেহরাজাদীতে ভিড় জমে ওঠেনি। ডোরিন একটা টেবিল বেছে নিল। বয়কে ডেকে বললাম, "আমার জন্যে জনকলিন্স আর মেমসাহেবের জন্যে সুইট সাইডার।"

ডোরিন বলল, "না ও ছাইপাঁশ আর খাব না, মাথায় চড়ে যায়।"

"সাইডার আপেলের রস দিয়ে তৈরি, তাও যদি না পছন্দ হয় তবে বার্লি-লাইম খেতে পার, মাথা আর পেট দুই-ই ঠাণ্ডা থাকবে। বার্লিতে নেশা হয় না।"

"ধেৎ! বার্লির জল খেতে যাব কেন?"

বয় ট্রে নিয়ে এসে গ্লাস দুটো রেখে দিয়ে গেল। ডোরিন সাইডারে চুমুক দিয়ে অভিযোগ করল, "এর মধ্যেও কিছু অ্যালকোহল আছে, তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ।"

"সবাই সবাইকে ঠকাচ্ছে। কেউ জেনেশুনে ঠকে, কেউ না জেনে ঠকে।"

"আমিও তোমাকে ঠকাচ্ছি, কাঞ্চন ?"

"ঠকাচ্ছ কি ঠকাচ্ছ না, কি করে জানব ?" বলে ফেলেই বুঝতে পারলাম রসিকতটা খুব ভালো শোনাল না। ও গম্ভীর হয়ে গেল।

কথার বাঁক ঘুরিয়ে বললাম, "ঐ ভারতীয় মহিলা দুটিকে দেখছ ? মুখের ছাঁদ দেখে মনে হয় পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবী মেয়েপুরুষ মাছের মতো মদে সাঁতার কাটে। পাঞ্জাবী রক্তে গ্রীক ও রোমান্ রক্তের খাদ খুব বেশি, দুহাজার বছর পরেও ফুটে বেরোচ্ছে এবং সেইসঙ্গে সুরাশক্তি।"

"তোমার নকরদার কাছে শুনেছ তো ? বলে যাও, বলে যাও থামলে কেন ? ওরা কে ঠকল, কে জিতেছিল, তাও বলে যাও।"

"রাগ করলে ?"

"রাগ বিরাগ নিয়ে আমি গবেষণা করি না, শুনতে চাচ্ছি তোমার নকরদার গবেষণাটি।"

"গবেষণা নয়, ঐতিহাসিক সত্য।"

"সে সত্যটি কি ? আমার মতো মুখ্যু মেয়েকে খানিকটা শুনিয়ে দাও।" ডোরিন-এর রাগ পড়ে গিয়েছে, মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে।

"নিজের জন্যেই তোমার শোনার দরকার। আলেকজাণ্ডার ভারতে এসেছিল গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্য থেকে। অনেক ম্যাসিডোনিয়ান গ্রীক এখানেই থেকে গেল।"

"তা জানি না।"

"তার আগে এসেছিল ঝাঁকে-ঝাঁকে আইয়োনিয়ান গ্রীক এবং ব্যাক্ট্রিয়ান গ্রীক। ওরাও এদেশে থেকে গেল।"

"ওদেরও নাম শুনিনি।"

"পরে রোমানরাও এসেছিল।"

"তারা কে জানতে চাই না।"

"এখনকার পাঞ্জাব, ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স, সিন্ধে ওরা গেড়ে বসল রাজত্ব পত্তন করে।"

"যেমন তুমি গেড়ে বসেছ এই শেহরাজাদীর ওপেন-এয়ার মজলিসে।"

"ও-তল্লাটে তারা বসবাস শুরু করে, ভারতীয় আর্যদের সঙ্গে ক্রমে মিশে যায়।

ওরা কেউ-কেউ হয়ে গেল শৈব, কেউ-কেউ বৌদ্ধ, কেউ-কেউ বৈষ্ণব। ধর এই তুমি, তোমার দেহে আইরিশ রক্ত ও কাশ্মীরি রক্ত আছে আধা-আধি কিন্তু একশো বছর পরে তোমার বংশধররা বিয়ে-সাদীর ফলে একেবারে পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের রক্তেও খানিকটা আইরিশ রক্তের ছাঁট থাকবে, সেই সঙ্গে কিছুটা চেহারাও। ওকি ডোরিন, তুমি আমার কথা কিছুই শুনছ না যে?"

"বাজনা শুনছি, ভালো বাজাচ্ছে।"

চুপ করে গেলাম শ্রোতাটির উৎসাহের অভাব দেখে।

বড়-বড় হোটেলের লাউঞ্জ বার ও ওপেন-এয়ার কাফেতে অনেক কিছু চোখে পড়ে আধুনিক সভ্য জীবনের। বিংশশতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার একদিকে যেমন দেখা যায় বিস্ময়কর অগ্রগতি, অন্যদিকে তেমনি ধনতান্ত্রিকতার বিলাসস্রোতে নৈতিক আদর্শের সঙ্কট। আদীম যুগের জৈবিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বিষাক্ত কীটের মতো প্রবেশ করেছে সমাজজীবনে। শুনেছি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সমারসেট ম'ম তাঁর কাহিনীগুলোর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন হলিউড, নিউইয়র্ক, রাইয়োডিজে-নেরিও, লণ্ডন, প্যারী, কাইরো, হংকং, ম্যানিলা, সুরাবায়ার হোটেল-লাউঞ্জ ও বার-এ। বাস্তব জীবনের বহু বিচিত্র দিক এবং অসংযমের নগ্নরূপ প্রত্যক্ষীভূত করে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করতেন। আফ্রিকা, ব্রেজিল, পেরু ও হাওয়াইয়ের জঙ্গলে শিকারসফরীর অভিজ্ঞতায় বন্যপশুদের প্রতি বোধহয় তাঁর শ্রদ্ধাই জন্মেছিল, তাই তাদের খাটো করতে কোনো গল্প ফাঁদেননি।

পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণে শুঁড়িখানার সভ্যসংস্করণ 'বার' এখন ভারতীয় সৌখিন সমাজের অঙ্গ। দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব, দারিদ্র্যের রাজত্ব, কিন্তু অজস্র টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে এই ছিদ্রপথে। প্রাচীন গ্রাসের লাইসীয়াম, ব্যাবিলনের ট্যাভার্ন, বাইজেন্টিয়ামের লিডো, রোমের কলিসিয়াম-এ যে সর্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়।

আমাদের পাশের টেবিলে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকটি যে পশ্চিম গোলার্ধের অধিবাসী তার পরিচয় ওর চটকদার হাওয়াই সার্টে এবং বয়দের কাছে ঘন-ঘন ফরমাশ দেওয়ার সময় 'র' অক্ষরটির উপর জোরাধিক্যে। এ-দুটির মধ্যেই আমেরিকার গন্ধ ভুরভুর করছে, বোধহয় হালে এসেছে কলকাতায়

সুসজ্জিতা একটি সঙ্গীহীনা তরুণী এদিকে আসছে দেখে শ্রীমান শিকার

বেড়ালের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। শ্রীমতীর দৃষ্টিও পড়ল এই সঙ্গীহীন যুবকের ক্ষুধার্ত চোখের দিকে। রতনে রতন চেনে। মেয়েটি সোজা চ'লে এসে মধু-ঢালা কণ্ঠে জিগগেস করল, "এ চেয়ারটি কি খালি আছে?" অভ্যর্থনার প্রথম অধ্যায় চেয়ার টেনে সাদরে স্বাগতজ্ঞাপন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুরার ফরমাশ নতুন অতিথির জন্যে। শিকারীর শিকার খেলা।

সূক্ষ্ম সীফনের শাড়ি, স্বচ্ছ ও হ্রস্ব ব্লাউজ, ব্লাকমার্কেটে চড়াদামে কেনা সুগন্ধির সৌরভে উচ্ছ্বসিতযৌবনা অতিথির সান্নিধ্যে সাহেবটি যতই উল্লসিত হয়ে উঠছে, আমি ও ডোরিন ততই বিব্রত বোধ করছি। আমরা এত কাছে যে দুজনের প্রত্যেকটি হাবভাব চোখে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন প্রত্যেকটি বিশ্বযুদ্ধের পরে মানুষের নীতিবোধ ধাপে-ধাপে নেমে যায়। নফরদা বলেছেন সভ্যতার গিল্টির তলায় ঢাকা পড়ে আছে মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি, সুবিধে পেলেই তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সুযোগ পেলে কেউ হয় লম্পট, কেউ হয় কালোবাজারী, কেউ খায় ঘুষ; এর সবগুলি সেই পাশবিক লোভপ্রবৃত্তির ভিন্ন-ভিন্ন রূপ।

"ডোরিন, বাজনা কেমন লাগছে?"

"ভালো না, চল আর একটা টেবিলে গিয়ে বসি।"

"আর তো টেবিল খালি নেই? ডিনার এখনি এসে যাবে। অর্ডার দিয়েছি।"

আর একজোড়া কপোত-কপোতী বসেছিল আমাদের সামনের টেবিলে। দেখে মনে হল ওরাও আজকের রাতের মতো পিছল পথের পথিক, দীঘল পথের যাত্রী নয়। শেহরাজাদীর কৃত্রিম বনবীথিকায় আধো-আলো আধো-ছায়ায় ক্ষণিকের অতিথি।

এসব জায়গায় যারা আসতে অভ্যস্ত তাদের কাছে এরকম অভিসারদৃশ্য গা-সহা হয়ে গেছে। আমরা দুজন অনভ্যস্ত, তাই অসোয়াস্তি বোধ করছি। বয়কে ডেকে বিল চুকিয়ে বেরোবার মুখে দেখলাম, স-বান্ধবী আমেরিকানটি লিফটের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ও বোধহয় এখানেই আছে উপরতলার কোনো কামরায়, যেখানে বিরলে বিজনে আলাপনের মধুচক্র আরো ভালো জমে উঠতে পারবে।

খেতে-খেতে ডোরিন একবার বলেছিল, "সত্যি কথা বল তো কাঞ্চন, এ-সব জায়গায় খেতে তোমার নিজেরই ভালো লাগে, না আমাকে মাঝে-মাঝে একটু

আনন্দ দিতেই নিয়ে আস? একি তোমার নিজের আমোদ না আমার প্রতি ক্রিশ্চিয়ান করুণা?"

উত্তর দিয়েছিলাম, "করুণা শুধু খৃষ্টানী গুণ নয়, আমাদের শাস্ত্রেও দয়াধর্ম শিক্ষা দিয়ে এসেছে ক্রাইস্টের বহু আগে থেকে। নফরদা বলেন পেতে হলে দিতে হয়, আনন্দ পেতে হলে অন্যকে আনন্দ দিতে হয়।"

"তোমার নফরদাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।"

"সে-ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারব না, কারণ জিগগেস কর না, কিন্তু মানুষটি খাঁটি, দরদী তাঁর মন।"

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে যে ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড আছে, সেখানে একখানাও নেই, উজান বেয়ে চললাম এসপ্ল্যানেড ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডের দিকে। ডোরিন যে কখন একটু পিছিয়ে পড়েছে খেয়াল করিনি, হঠাৎ একটা ছোকরা এগিয়ে এসে জিগগেস করল আমাকে, "প্রাইভেট লেডী স্যর? প্রাইভেট লেডী? বিশ রুপেয়ামে খাপসুরত জেননা?"

চৌরঙ্গীতে এ-দলের ছোকরারা দালালি পকেটকাটা ছিনতাই চালায় রাতের অন্ধকারে। পুলিস এদের সঙ্গে এটে উঠতে পারে না। নারীপণ্যের বাজারে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই এদের বেশির ভাগ মক্কেল। ডোরিন ততক্ষণ পাশাপাশি এসে পড়েছে, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হল কারণ কথাটা ও শুনে ফেলেছে, ধমক দিয়ে ছোকরাটাকে হটিয়ে দিলাম।

ট্যাক্সি একটা পেলাম লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে। বাঙালী ড্রাইভার। হাঁকল ছ-কা।

কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের জুলুম ও ফিকিরের বিষয়ে একটা মহাভারত লিখে ফেলা যায়। সে মহাভারতে যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনাদি নেই, আছে দুর্যোধন দুঃশাসন দুর্মামার দল। আড়াই মাইল পথ চোখ বুজে পাড়ি দিতে পারি, কিন্তু এত রাতে সুন্দরী সঙ্গিনীকে নিয়ে সে দুঃসাহস ভালো নয়, মনুষ্যরূপী জানোয়াররা ঘুরঘুর করছে। ছ-টাকা মাশুল দিতে রাজী হলাম। সাবধানের মার নেই। শরীরটাও বেজুত গেছে।

আমাদের চৌত্রিশ নম্বরের বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সবাই হয়তো সারাদিনের খাটুনির পরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। যদিও বা বুড়ো ম্যাক্ জর ও মাথাধরার গাঁট্টা খেয়ে জেগে আছে, সেও আলো নিভিয়ে এপাশ-ওপাশ করছে।

প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বললাম, "হ্যাপি ড্রিমস্, গুডনাইট, ডোরিন।"

একটু ইতঃস্তত করে ও বলল, "একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, কাঞ্চন।"

"বলে ফেল, কানে কুলুপ দিয়ে রাখিনি।"

"এখানে দাঁড়িয়ে নয়, তোমার ঘরে চল।"

"চল, অনধিকার প্রবেশের মামলা করব।"

আলো জেলে পাখাটা খুলে দিলাম।

"তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন কাঞ্চন? এতক্ষণ তো খেয়াল করিনি?"

"আমার মুখের দিকে কি তুমি একবারও তাকিয়েছ এই তিনঘণ্টার মধ্যে যে দেখবে? মাথা আমার ফেটে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।"

"একটু টিপে দেব?"

"দরকার নেই। আমার কাছে তোমার চাইতে যেমন সংকোচ হয় বলেছ আজ বিকেলে, আমারও সে রকম সংকোচ হতে পারে না?"

"ছিঃ কাঞ্চন, এত অল্পেই তুমি চটে যাও। টাকা কর্জ দেওয়া আর একটু মাথা টিপে দেওয়া এক হল?"

"কি বলতে চাইছ তাড়াতাড়ি বল, আর বসে থাকতে পারছি না।"

"ভাবছিলাম এই যে লোকে আমাদেরও ভুল বুঝতে পারে, ওসব জায়গায় আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া ভালো নয়।"

"কোন লোকেরা?"

"তোমাকে যারা চেনে, অথবা যারা তোমাকে না-ও চেনে। আজকালকার লোকের মনেই পাপ, খারাপ দিকটাই ওরা দেখে। তোমার কানে কিছু এলে মনে কষ্ট পাবে, আমিও কষ্ট পাব।"

"আমি কষ্ট পেলে তুমি কষ্ট পাবে কেন?"

ডোরিন এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গুড নাইট জানিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। যাবার সময় ওর ঠোঁট দুটি কেঁপে-কেঁপে উঠল দেখলাম, কিন্তু কেন তা বুঝলাম না।

হয়তো শেহরাজাদীর ঐ দুই মানিকজোড়ের কথাও ভুলতে পারছে না, দালাল ছোকরার কুৎসিত প্রস্তাবটার মধ্যেও দেখতে পেয়েছে পরকীয়াচর্চার নির্লজ্জ প্রসারতার ইঙ্গিত বর্তমান জীবনে। এটা বোধহয় আগে এত স্পষ্ট করে ওর চোখে পড়েনি, তাই কুণ্ঠা, লজ্জা ও ভয় একসঙ্গে ওকে ঘিরে ধরেছে।

ওর সঙ্গে কথা বাড়ানোর অবস্থা আমার নেই, তাই চলে যেতে দিলাম। সুট ছেড়ে পায়জামা পরলাম, বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়তে যাব, দেখি খানকয়েক চিঠি। যোশেফের হাতের লেখা দেখে একটা তুলে নিলাম, লিখেছে :

দাদাবাবুসাহেব,

সুলতান নামে একটা গুণ্ডাগোছের লোক আপনার খোঁজে এসেছিল। ভয় পেয়ে আমি বললাম আপনি এখানে থাকেন না। ও মুখখিস্তি করল। বলেছে কাল সকালে আসবে। আমি কায়েতের ছেলে, আর ও আমাকে শালা বলে গাল দিল। ব্যাটা ডাকাত, সকালে আপনি সামনের দরজা খুলবেন না।

—যোশেফ দত্ত

এত মাথার যন্ত্রণার মধ্যেও হাসি পেল। যোশেফরা দু'পুরুষ হল খৃষ্টান হয়েছে, কিন্তু এই কায়স্থবংশজ তার মৌলিক জাত্যাভিমান ভুলতে পারেনি। ওদের বাড়ির মেয়েরা নাকি এখনো সিঁদুর পরে, লক্ষ্মীপুজো করে!



১৯

বালিসে মাথা দিলেই আমার ঘুম ডবলমার্চ করে এসে যায় এবং একটানা পাহারা দেয় সকাল সাতটা পর্যন্ত। আজ তার চুলের টিকিটিরও দেখা নাই। বুড়ো ম্যাকের ছোঁয়াচ লাগল নাকি? এত মাথাব্যথায় তো কখনো কষ্ট পাইনি? মাথা যেন ফেটে যাচ্ছে।

ডোরিন জবাব দিয়ে গেছে আমার সঙ্গে আর বেরোবে না। এটা তার ঘোর অন্যায়, আমার প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার, দারুণ অকৃতজ্ঞতা। ওকে যে কিছু আনন্দ দিতে আমি এখানে-সেখানে নিয়ে যাই সেটা ওরই জন্যে। ও দুঃখী, একটু সহানুভূতি দেখাবার কেউ নেই, একটু দরদ দেখাবার কেউ নেই। আমি যদি সে অভাব কতকটা পূর্ণ করতে পারি তবে দোষ কি?

আমি পুরুষ বলে কি আমাকে ও বিশ্বাস করতে পারছে না? ভয় পাচ্ছে? ওর কি সন্দেহ জেগেছে যে আমার কোনো অভিসন্ধি আছে? ও কি নিজেকে দিয়েও ভয় পাচ্ছে? আমার মধ্যে ও যেমন কোনো দুর্বলতা এ-পর্যন্ত দেখেনি, ওর মধ্যেও কোনো দুর্বলতা এ-পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি। তবে কেন ও আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়?

হিজিবিজি স্বপ্ন ভিড় করে এল তন্দ্রার ঘোরে। টুকরো-টুকরো স্বপ্ন, পাগলের প্রলাপের মতো অসংলগ্ন, মাথামুণ্ডুহীন:

হারীণদার হাতে রিভলবার, ডক্টর মুখার্জীর মৃতদেহের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন, ফার্গুসন ওকে মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' থেকে পড়ে শোনাচ্ছে। বিজু সেনগুপ্ত মদনপল্লী হাসপাতালের একটি ছোট্ট কটেজে তার স্ত্রীর গলা টিপে ধরেছে। জন আর্মস্ট্রং টুইস্টনাচ নাচছে মিস্ ফিশারের সঙ্গে। এঞ্জেলীনার বুকে মাথা রেখে ম্যাক হু-হু করে কাঁদছে। মুন্নাদি গেলাস ছুঁড়ে মেরেছে, জন এন্টনীর মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। অন্ধকার গলি দিয়ে আমি চলেছি, একটা লোক ছুরি

উচিয়ে ধরতেই চেঁচিয়ে উঠলাম খবরদার, সুলতান মিঞার আমি ধরমভাই। ডোরিনকে মুখ খিঁচোচ্ছি—বেরিয়ে যা এখান থেকে কিস্তালীর বাচ্চা, আমার ঘরে ঢুকেছিস?

চোখ মেলে, মনে হল ডোরিন আমার মাথায় আইসব্যাগ দিচ্ছে। বললাম, "আইসব্যাগ দিচ্ছ কেন? তুমি এখানে কেন? কটা বাজে? অফিসের সময় হয়েছে?"

"রাত চারটে, ঘুমোও এখন।"

ডোরিন-এর দিকে পাশ ফিরলাম। বললাম, "ডোরিন, তোমার হাতটা আমার কপালে রাখ, বড্ড যন্ত্রণা। তুমি কে? ডোরিন? না আর কেউ?"

"আমি ডোরিন।"

চেঁচিয়ে উঠলাম কেন জানি না: "তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না ডোরিন, সব ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে, খাটটা যেন লাফাচ্ছে, আমাকে চেপে ধর।"

অনেক দিন পরে ডোরিন-এর কাছেই এ-সব শুনেছিলাম, আমার পুরোপুরি জ্ঞান নাকি ছিল না তখন।

মাঝে-মাঝে কানে আসত যেন অনেক দূর থেকে:

মুন্নাদির গলা—হ্যাঁরে কঞ্চন, কি কষ্ট হচ্ছে?

ম্যাকের গলা—কনি মাই বয়, কেমন বোধ করছ এখন?

সুলতানের গলা—ভাইসাব, শির দুখাইছে আভি?

আর্মস্ট্রং-এর গলা—কিছু ভাবনা নেই কাঞ্চন, অফিসের কথা ভেবে অস্থির হয়ো না।

ডোরিনের গলা—একটুখানি খাও কাঞ্চন, না খেলে তো চলবে না?

একদিন যেন মনে হল দু'ফোঁটা জল টপ-টপ করে আমার কপালে এসে পড়ল। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—কে? কে?

কানে এল—আমি ডোরিন।

আবার জ্ঞান হারালাম।

দিন পনেরো অফিস কামাই হল। একদিন চা দেবার সময় যোশেফের কাছে বিস্তারিত বিবরণ পেলাম। সারারাত মেমসাহেব এবং সারাদিন এন্টুনী মেমসাহেব থাকতেন আমার পাশে যে কদিন আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।

"কদিন বেহুঁশ ছিলাম ?"

"ছ-দিন ছ-রাত। বেশির ভাগ সময়েই আপনার হুঁস ছিল না। একটুক্ষণ হুঁস এলেও আবার ফের বেহুঁস হয়ে যেতেন, আর আবোল তাবোল বকতেন জ্বরের ঘোরে।"

"এদের দুজনের খুব কষ্ট হয়েছে আমার জন্যে, না ?"

"গ্রে-মেমসাহেবের একদিন আঙুল কামড়ে দিয়েছিলেন।"

"কি লজ্জার ব্যাপার !"

"ম্যাক সাহেবকে 'সোয়াইন' বলে গাল দিয়েছিলেন একদিন।"

"ছি-ছি ! ডাক্তার কে দেখছিল ?"

"মোড়ের মাথার কর্নেল রায়, ম্যাক সাহেবের ডাক্তার। ম্যাক সাহেবই ওকে খবর দিয়ে আনিয়েছিল।"

"ফি দিয়েছে কে ?"

"ম্যাক সাহেব।"

"ছি-ছি সকলকেই হয়রানী ও খরচান্ত করেছি। ওষুধপত্তর কে আনত ?"

"সেই গুণ্ডা সুলতান মিঞা। বড্ড ভালো লোক। ও এখানেই সারাদিন পড়ে থাকত। ও এণ্টনী-মেমসাহেবকে নিয়ে আসত সকাল সাতটায়, আর ফিরিয়ে নিয়ে যেত সন্ধ্যে সাতটায়। একবার শুধু নিজে খেয়ে এণ্টনী-মেমসাহেবের খাবার টিকিন-ক্যারিয়ারে নিয়ে আসত। আপনি যখন চেঁচাতেন মাথা টিপে দিত ঐ সুলতান মিঞাই, বরফ আনত, ওষুধ আনত, ফল আনত যখনই দরকার হত।"

"ওসব খরচা দিয়েছে কে ?"

"এণ্টনী-মেমসাহেব।"

"রাতের বেলায় সব করত কে ?"

"কে আবার ? ঐ গ্রে-মেমসাহেব আর আমি।"

মুন্নাদির নিজেরই চলে না, ডোরিনের অবস্থা আরো খারাপ। তাড়াতাড়ি ঋণ শোধ করা দরকার। ম্যাকও ডাক্তারের সব ফি দিয়েছে, সে টাকাও শোধ দিতে হবে।

"সুলতানের সঙ্গে লাঠালাঠি করনি তো ?"

"ভীষণ ভাব জমে গেছে, আমি ওকে চাচা বলে ডাকি।"

"এন্টনী-মেমসাহেবকে বিকেলে চা দিতে তো?"

"ম্যাকসাহেবই পাঠিয়ে দিত এন্টনী-মেমসাহেব ও গ্রে-মেমসাহেবের চা। যাই, স্টোভটা নিভিয়ে দিয়ে আসি।"

আমার অজ্ঞাতে বেশ একটি সংসার গড়ে উঠেছিল তবে? এদের কারুর সঙ্গে কারুর কোনো মিল নেই কোনো দিক দিয়েই, কিন্তু আমার বিপদের দিনে সবাই এসে দাঁড়াল আমার পাশে এবং হাত হাতে মেলাল! ডোরিন-এর আঙুলটা কেমন আছে কে জানে?

অফিসে গিয়ে শুনলাম হংকং ফিভারের এপিডেমিক লেগেছে। হংকং থেকে শুরু করে এই অদ্ভুত জ্বর কলকাতা এবং বম্বে অতিক্রম করে ফ্রান্স পর্যন্ত পৌঁচেছে, ইংলণ্ডের লোক ভয়ে তটস্থ। হারীণদা, ভেঙ্কট আর ফার্গুসনও একচোট ভুগে উঠেছে, কিন্তু আমার মতো ঘোরালো অবস্থায় পড়েনি। দিগলানী এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। জন আর্মস্ট্রং রোগীদের খবরাখবর করতে আজ পনেরো দিন ছুটো-ছুটি করছে।

সবাই এসেছে, আসেননি নফরদা। বোধহয় খবর পাননি। খবর দেবেই বা কে? তা একপক্ষে ভালোই হয়েছে, আমার ঘরে ডোরিন গ্রে-কে দেখলে তিনি চমকে উঠতেন।

ফেদারস্টোনকেও এই ভাইরাস আক্রমণ প্যাচে ফেলতে পারেনি। একটা স্লিপ লিখে পাঠাল যে আমার চাকরির কণ্ট্রাক্ট যখন হয়ে গিয়েছে তখন কোম্পানীর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারি। ডাক্তারের ফি, ওষুধের খরচা, নার্সিংহোমের চার্জ সব কোম্পানীই দেবে।

যোশেফকে একদিন জিগ্গেস করলাম, "কি হে? হঠাৎ যে এত ভালো রান্না করছ, ব্যাপার কি? না, আমার খিদেই বেড়েছে?"

কুণ্ঠিত উত্তর পেলাম, "না স্যার, এ আমার রান্না নয়।"

"তবে কার?"

"গ্রে-মেমসাহেবের।"

"রোজই রেঁধে পাঠান?"

"রোজই।"

"আর তুমি দিব্যি গ্যাঁটসে বসে হাওয়া খাও?"

"আমি বাজার করি, যোগাড়যন্ত্র করে রান্নার সব এগিয়ে দিই। ওঁর কাছে রান্নাও শিখছি। ওঁনাকে কোনো খরচা দিতে দিচ্ছি না।"

সুলতান প্রায়ই আসে। মুন্নাদি আমার খবর জানতে চান।

"সুলতান, তুমি আমার জন্যে খুব করেছ অসুখের সময়।"

"তোবা-তোবা, কি যে বোলেন ভাইসাহেব? সুলতান তো হুজুরের গোলাম আছে? করিয়েছে বিলকুল ঐ গ্রে-মেমসাব আর মুন্নাবেগম। হামি তো বিলকুল না-লায়েক আছি।"

সুলতানের দেওয়া মুন্নাদির নতুন ঠিকানা নিয়ে হাজির হলাম এক রবিবার মুন্নাদির ওখানে, প্রায় দেড়মাস পরে।

কেমন খটকা লাগছে যে? রাস্তাটির নামও একজিবিশন এভিনিউ। নম্বরও বারো, কিন্তু এণ্টনীরা এরকম বাড়িতে কি করে থাকতে পারে? ঝকঝক করছে শাদা বাংলো ধরনের একতলা বাড়ি, সারি-সারি সাবেকী নমুনার থাম, চওড়া সিঁড়ি, বড়-বড় দরজা-জানলা, বড়-বড় স্কাইলাইট, সামনে বাগান, বাগানের ভেতর শ্বেতপাথরের ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের বেঞ্চ।

গেটের কাছে আমাকে দেখে যে ছুটে এল সে সুলতান মিঞাই বটে! তবে লুঙ্গী পরিহিত নয়—শাদা পায়জামা, ধবধবে শাদা চাপকান, মাথায় ফেজটুপি।

একগাল হেসে সুলতান গেট খুলে দিয়ে বলল, "আসুন ভাইসাহেব, খোদার মেহেরবানী। এদিকে আসুন।" প্রকাণ্ড হলঘর, শ্বেতপাথরের মেঝে, দামী সোফা-সেটি, বুককেশ, বইয়ের আলমারি, সেণ্টার-টেবিলে সজ্জিত। বোধহয় মুন্নাদিরা পেছনে চাকরদের আস্তানায় থাকে।

"এখানেই বসব সুলতান?"

"বসুন হুজুর।"

সুলতান বোধহয় এবাড়ির মালিকের খানসামা। যদি সে ব্যক্তি এসে জিগগেস করে তুমি কে, কাকে চাও, তবে কি বলব?

চটাস-পটাস চটিজুতোর আওয়াজে হুঁস হল মুন্নাদি ঘরে ঢুকেছেন। গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত হাউসকোটে ঢাকা, পায়ে জরির জুতো। মুখের রঙ ফুটফুট করছে, গালদুটি গোল হয়ে নাকটি আরো টিকোলো হয়েছে, চোখ দুটো বড়-বড় ভাসা-ভাসা

দেখাচ্ছে। আমার পিঠে হাত রেখে জিগগেস করলেন, "একেবারে ভালো হয়ে গেছিস তো? যা ভয় হয়েছিল আমাদের!"

"তোমাদের খুব ভুগিয়েছি, না?"

"যেদিন তোর ১০৫° ডিগ্রী জর উঠল, সেদিন এণ্টনী বুড়ো তো কেঁদেই ফেলল!"

"ওঁর মনটা খুব নরম, মুন্নাদি।"

"সুলতান হতভাগার কথা আর কি বলব? নাওয়া-খাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। আর আশ্চর্য সেবা করেছে ঐ ডোরিন মেয়েটা। ও কে রে?"

"এক বাড়িতে থাকি, শুধু এইমাত্র।"

"ম্যাকসাহেব কে হয় রে তোর?"

"এক বাড়িতে থাকি এই, সম্পর্ক কিছু নেই।"

"কিন্তু ও যে বলে তুই ওর নাতি? ডাক্তারের ফি এক পয়সাও আমাকে দিতে দিল না। বলল আমি দিতে গেলে ঝগড়া বাধবে।"

মুন্নাদির কথাবার্তার উপর যবনিকাপাত করে সুলতানের আবির্ভাব হল। হাতে ট্রে। কফি, স্যাণ্ডুইচ, ক্রীমরোল, খাসবিলিতি চীনেমাটির কাপ, চায়ের পট ও ডিস।

যাদের বস্তীতে দেখেছি নোংরা পরিবেশে দারিদ্র্যের পেষণে তারা এখানে এল কি করে? গাঁটকাটা গলাকাটা সুলতান মিঞাই বা এমন ভোল বদলেছে কেন? তবে এটা কি একটা জুয়াখেলার আড্ডা? কাগজে পড়েছি রাজাবাহাদুর জমিদার-বাহাদুর, ম্যানেজারবাবু, রানীমা ইত্যাদি সেজে এ-সব জোচ্চোরের দল সেয়ানা লোককেও ফতুর করে ছেড়ে দেয়।

মুন্নাদি মিটিমিটি হাসছেন। বললেন, "অবাক হাচ্ছস কাঞ্চন?"

"অবাক হচ্ছি না বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। যার এ বাড়ি তিনি তোমার কে?"

"তাঁকে তুই চিনিস।"

"চিনি? কি নাম?"

"জে. এইচ. এণ্টনী।"

"এণ্টনীদারও তো ঐ নাম? তাঁর ভাইয়ের বাড়ি?"

"ভাই ছিল না কোনোদিনই।"

"তবে ওঁরই বাড়ি ? উনি কোথায় দেখছি না তো ?"

"সকালে তিনমাইল, বিকেলে তিনমাইল হাঁটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান।"

"সে ডাক্তার কি মিসেস এম. এণ্টনী ?"

"না। এম. আর. এণ্টনী—মুন্না রোশেনারা এণ্টনী। সাড়ে দশটায় রোগীটি ফিরবেন।"

ডানদিকের দেয়ালে পাঁচহাত লম্বা গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকে নজর পড়ল দশটা প্রায় বাজে।

"আরো একটা খবর আছে কাঞ্চন।"

"বলেই ফেল না তাড়াতাড়ি ?"

"তোর এণ্টুনীদার নাম এখন জন হরিচরণ এণ্টুনী নেই, হয়েছে জাফর হাসাস্থূদ্দীন এণ্টুনী। জে. এইচ. এ-দুটো অক্ষর ঠিকই আছে।"

আগাগোড়াই আরব্য উপন্যাসের মতো লাগছিল, চোখ ও কান আমার এত খানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এখনো কি আমি বিকারের ঝোঁকে আজেবাজে স্বপ্ন দেখছি ?

"তোমার পায়ে পড়ি মুন্নাদি, সব কথা খুলে বল।"

ঢং-ঢং করে ঘড়িটাতে দশটা বাজল।

মুন্নাদি চটি খুলে কার্পেটের ওপর বসলেন। কাঁচের সেণ্টার-টেবিলের ওপর কনুই রেখে শুরু করলেন, "তোকে খবর দিতে পারিনি, কিন্তু তোর এণ্টুনীদার আবার খুব শক্ত অসুখ হয়েছিল। ডাক্তারও জবাব দিল। যখন শ্বাস উঠেছে তখন রাত আড়াইটে। রক্ত বমি থামছে না দেখে আমি আগেই মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম। শ্বাস উঠেছে দেখে সুলতান ছুটে গেল মৌলালীর দরগায়। ও শুনেছিল কে এক পাগলা ফকির ওখানে এসেছে। ফকির সাহেবের পা ও ছাড়ে না দেখে তিনি জিগগেস করলেন—যার বেমারী সে তোর কে ? সুলতান বললে জানের সম্পর্ক নেই, কিন্তু প্রাণের সম্পর্ক আছে। ওর জান বরবাদ করে তার জান বাঁচাতেও কবুল।

"ফকির সাহেবের বোধহয় দয়া হল। কি করলেন জানিস ? চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে মুঠো-মুঠো ধুলো ছড়াতে-ছড়াতে কোরানের বয়েৎ আওড়াতে লাগলেন, আর নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন। সুলতান পাগলের সেই দামাল ক্ষ্যাপামি দেখে ভয়

পেয়ে গেল, কিন্তু পালাতেও পারে না। তারপর ফকির সাহেবের এক প্রচণ্ড ধমক—ভাগো হিঁয়াসে শালা শুয়ারকা পয়জার। খোদার কুদরতি যাকে দেখো।

"তাজ্জব হয়ে যাবি শুনলে কাঞ্চন, সুলতান ফিরে এসে দেখে তোর এণ্টুনীদা উঠে বসেছেন, বললেন—বেশ ভালো লাগছে আমার সুলতান, তুই মুন্নার মাথায় জল দিয়ে হাওয়া কর। আমি তখন নাকি বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলাম।

"জ্ঞান যখন আমার ফিরে এল তখন দেখি উনি আওড়িয়ে যাচ্ছেন 'লা এলাহ এল্লেল্লাহ মহম্মদ রসুলাল্লাহ।' এটা নমাজের আজান, খৃষ্টানের মুখে শুনে তাজ্জব বনে গেলাম, তোরা যাকে বলিস ভূতের মুখে রাম নাম।

"সেই থেকে ওঁর যে কি হল জানি না। স্বপ্নের মাঝে কার সঙ্গে যেন কথা কইতেন, তারপরে হঠাৎ একদিন বললেন—মুন্না, আমরা মুসলমান হব, আল্লার মর্জি।

"সুলতানও সেই থেকে যেন অন্য লোক। কেউ জুতো মারলেও কিছু বলবে না, শুধু আল্লা-আল্লা করবে। হিংস্র পশু হয়েছে মাটির মানুষ।"

"কিন্তু এই বাড়ি?"

"যিনি দিন দুনিয়ার মালিক তিনি ইচ্ছে করলে সবই দিতে পারেন তাঁর বান্দাদের। তোর এণ্টুনীদার এক কাকা ছিলেন, মাইকেল তারাচরণ এণ্টুনা। মাদ্রাজে তাঁর ব্যবসা ছিল, বিয়ে করেননি, না খেয়ে নাকি টাকা জমাতেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এল তিনি মারা গেছেন, টাকাকড়ি সব দিয়ে গেছেন এই একমাত্র ভাইপোকে। বাড়ি গাড়ি দিয়ে গেছেন গির্জাকে।"

মুন্নাদি কেঁদে ফেললেন। বললেন, "তুই আমাদের ঘোর দুঃখের দিনে এসেছিলি আজ আমাদের এই সুখের দিনে…"

মুখ দিয়ে ওঁর আর বাকি কথাগুলো বেরোল না। হেঁট হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, "স্বামী সেবার পুরস্কার। তোমাকে আমি কোনোদিনই ভুল বুঝিনি। ভাগ্যের তাড়নায় নিজেকেই তুমি শাস্তি দিয়ে চলেছিলে তা আমি জানি। কার থেকে জানলাম জানো? এণ্টনীদার কাছ থেকে।"

দামী মালাক্কা বেতের ছড়ি হাতে এণ্টনীদা ফিরলেন। ড্যাক্রন ট্রাউজার, নাই লন সার্ট, পায়ে সুয়েডের মোকাসিন। শরীরের চাইতে মনটাই বেশি তাজা হয়েছে মনে হল। শরীর একবার ভাঙলে সারতে দেরি হয়।

"বেশ, বেশ, কতক্ষণ এসেছ ব্রাদার ?"

"প্রায় চল্লিশ মিনিট।"

"তোমার দিদির কাছেই সব শুনেছ বোধহয় ?"

মুন্নাদিই জবাব দিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ মোশাই, কোশ্চেন আউট হয়ে গিয়েছে। যাই এখন রান্নাঘরে, কাঞ্চন তুই খেয়ে যাবি।"

জন এণ্টনী হাসি-হাসি মুখে যে-ভাবে তার স্ত্রীর চলমান দেহের প্রতি তাকাল সে-দৃষ্টিতে ছিল গভীর স্নেহের কোমল স্পর্শ। সমুদ্রতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ এদের দাম্পত্যতরণী যেন নদীর শান্ত মোহনায় এসে ঢুকেছে। দুর্যোগের অবসানে 'পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।'

সুন্দর বাড়ি, সুন্দর পরিবেশ, এক নতুন জীবনের প্রভাত। এণ্টনীদার দেওয়া দামী সিগারেটটি ধরাতে-ধরাতে রবীন্দ্রনাথের সুরছন্দেই বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, 'কোন সাগরের বুক হতে এলে কোন সাগরের ধন, ভুলে যেতে চায় মন।'

হায়, ডোরিনকে যদি এ-ভাবে সুখী দেখতাম কোনোদিন! দুঃখের দিন তো কেটে যায় একদিন না একদিন ? এদেরও তো দেখছি ?

জন এণ্টনীর স্বর কানে এল,"তোমার মুন্নাদি এতদিন পরে সুখী হয়েছে, তাতেই আমি সুখী। তবে ওর খাটুনি কমেনি। বরাবরই ও আমাকে আরামে রাখতে চেয়েছিল, এখন পয়সার অভাব নেই, তাই নতুন-নতুন আরামের আয়োজনে ব্যস্ত। তাতে আমি বিব্রতই বোধ করি।"

"উনি এখনো আপনার জন্যে রোজ রান্না করেন ?"

"সুলতান বেশ ভালোই রাঁধে, কিন্তু উনি নিজে বাবুর্চিখানায় গিয়ে এটা-সেটা আমার জন্যে না রেঁধে পারেন না।"

"ডাল-পর্কের কথা আপনার মনে আছে ?"

উচ্চস্বরে হেসে উঠল ভদ্রলোক। বলল, "ওটা নিষিদ্ধ। আমাদের মুসলমানের কাছে শুয়োরের মাংস 'হারাম।' সুলতান এখন গোঁড়া মুসলমান। ও জিনিসটা ঢুকতেই দেবে না বাবুর্চিখানায়!"

"ওকি আপনার বাবুর্চি ?"

"বাবুর্চি, বয়, খানসামা, হেডঅ্যাসিস্টাণ্ট, দরোয়ান, অ্যাডভাইসর—একসঙ্গে সব।"

"এখানেই থাকে ও ?"

"সপরিবারে পেছনের চাকরদের ঘরে।"

এবাড়িতে যখন ঢুকলাম তখন ভেবেছিলাম এণ্টনীরাই হয়তো আছে পেছনের সেই বাইরের ঘরগুলোয়।

এণ্টনীদা বললেন, "বরাত যখন খোলে কাঞ্চন তখন সবই আপ-সে-আপ এসে যায়। একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব এ-দেশ ছেড়ে অস্ট্রেলিয়া চলে যাচ্ছে, তার কাছ থেকে এ-বাড়িটা খুব সস্তায় পাওয়া গেল। সাত দিনের মধ্যে কথাবার্তা শেষ, দলিল তৈরি। সুলতানই খোঁজটা এনেছিল, সুলতানই দাঁড়িয়ে থেকে রঙ করিয়েছে, আমার কোনো ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। একটা গাড়িও কিনতে চাই কিন্তু তোমার দিদির 'ভিটো,' বলেন খুব না হাঁটলে পৈটিক বেয়রামটা আমার ঘাড় মটকাতে চাইবে। কাকা আমাকে ছেলেবেলায় খুব আদর দিতেন, কিন্তু প্রায় বিশ বছর দেখা ছিল না, যেদিন ওঁর এটর্নীর টেলিগ্রাম এল সেদিন ছেলেমানুষের মতো বেজায় কেঁদেছিলাম। ওঁকে আর দেখব না কিন্তু উনি আমার বাঁচবার পথ করে দিয়ে গেলেন। আমি পেয়েছি ছ' লাখ টাকা, মাদ্রাজের সম্পত্তি দিয়ে গেছেন গীর্জাকে। টাকার সঙ্গে আবার পেয়েছি আগেকার সেই মুন্নাকে। সেই সতেরো বছরের মুন্নাকে। ও তখনো বাঙলা জানত না।।"

"কিন্তু আপনি মুসলমান হয়েছেন জানলে আপনার কাকা..."

"মুসলমান হলাম এ-টাকা পাবার পরে। ফকির সাহেবকে আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু স্বপ্নে কয়েকবার দেখেছি।"

"কি করে সময় কাটান ?"

"নিষ্কর্মা বড়লোকদের মতো অলস-বিলাসে নয়। ফিলজফি পড়তে আমার ভালো লাগত, কিন্তু বই কেনবার পয়সা ছিল না। এখন সময় কাটাই হিন্দুদর্শন, ক্রিশ্চিয়ান ফিলজফি, সুফী জিয়ৎ, বৌদ্ধ অভিধর্ম পড়ে। সকাল-বিকেল ম্যারাথন ওয়াকিং, পুরো ছ-মাইল পদব্রজে ভ্রমণ।"

"আর মুন্নাদি ?"

"ঘণ্টা দুই রান্না না করলে ওর পেটের অন্ন হজম হয় না মনে হয়। তাছাড়া বাগান দেখা এবং এ-বাড় সে-বাড়িতে আড্ডা-দান।"

মুন্নাদি এসে ঘোষণা করল বারোটা প্রায় বাজে। তোয়ালে জড়ানো কোমরে,

পায়ে খড়ম, হাতে তেল হলুদের ছোপ। বাবুর্চিখানার প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে সদ্য বেরিয়েছে, তাই কিচেন-ইউনিফর্ম। ফৌজী পোশাক খাকি, সাহেবরা রাতের ভোজে ইভিনিং স্যুট পরে, পার্শীরা অগ্নী-মন্দিরে যাবার সময় লম্বা কোট আর টুপি পরে, এটাও সেরকম।

এ্যন্টনীদাকে চান করতে হুকুমজারী করে মুন্নাদি বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখাল। দুটো বড় শোয়ার ঘর ছাড়াও অতিথি থাকবার মতো বাড়তি একটি শোয়ার ঘর, প্রত্যেকটির সঙ্গে লাগোয়া স্নানাগার, তার শ্বেতপাথরের মেঝে, শাদা মিণ্টন টাইলের দেয়াল, কাঁচের সেল্‌ফ, কমোড, স্নানের টব। খানাঘর; বাবুর্চিখানা—সেখানে গ্যাসের চুল্লী, বাসনধোবার সিঙ্ক্‌, হাতধোবার বেসিন। মুন্নাদির আগের বাড়ি আর এবাড়ি আকাশ-পাতাল তফাত!

আমাকে অতিথির ঘরে পৌঁছে দিয়ে মুন্নাদি বলল, "ওঁর চান করতে বেশি সময় লাগে না, তুই চান করে নে। লোকটির মুখের চেহারা কেমন বদলে গেছে লক্ষ্য করেছিস?"

"তোমার চেহারাও তো বদলে গেছে? টাকার মতো আর টনিক নেই। কথায় বলে সিলভার টনিক।"

"সিলভার টনিক নয় রে ভাই, ওঁকে সুখী দেখেই আমার সুখ। দেবতার মতো মানুষ বস্তিতে পচে মরছিল, তা সহ্য করতে পারতাম না।"

বাথরুমে ঢুকে দেখি আলনায় দুটো ধোপদুরস্ত তোয়ালে, কাঁচের সেল্‌ফে সুগন্ধি তেল, হেয়ার লোসন, অডিকোলন, পাউডার, ক্রীম। বাথটাবের পাশে সাবান-দানীতে দামী সাবান, পাশের চেয়ারে ইস্ত্রীকরা পাজামা, গেঞ্জি।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলাম, সুলতান মিঞা এসে আমার গেঞ্জি ইত্যাদি সব নিয়ে যাচ্ছিল, বললাম, "ধুতে হবে না, অমনিই রেখে যাও।"

সুলতান একগাল হেসে বলল, "মুন্নাবেগমের সাফসাফাইয়ের বেজায় বাতিক আছে বাবুসাব, রোজদিন সবকুছু সাবুনকাচা হোয়।"

খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। আসল মোগলাই রান্না, লক্ষ্ণৌ মার্কা পেশোয়ারি চালের পোলাও, জাফ্রান পেস্তা এলাচের সুবাস, মাংসের কোপ্তাকারী, মাছের টিকিয়া, খরমুজের চাটনী, বাদামের মালাই।

মুন্নাদির অনুরোধ বিকেলে চা খেয়ে যেতে হবে। অগত্যা ঘরে ফিরে গেলাম।

ধবধবে বিছানা, খাটের পাশের টেবিলে সিগারেট-দেশলাই, খাবার জল, তবকে মোড়া-পানের খিলি এবং কয়েকটা বইও কখন যেন সুলতান রেখে গেছে। চারটে পর্যন্ত টানা ঘুম দিলাম।

বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সারাপথ এণ্টনীদম্পতির কথাই ভাবছিলাম। দারিদ্র্যের ভস্মে এতদিন ওদের বংশগত আভিজাত্যের সব কিছুই চাপা পড়ে ছিল, এখন সে ছাই উড়ে গিয়ে আগুনের আভা বেরিয়ে পড়েছে। ওদের শিক্ষা রুচিবোধ এবং শালীনতার এই পরিচয় পেয়ে লজ্জা হল যে ওদের ইতর অশিক্ষিত কদর্য চরিত্র বস্তিবাসীদের সঙ্গে একদিন আমি এক শ্রেণীতে ফেলেছিলাম। নফরদা ঠিকই বলেন, মানুষ মানুষকে বিচার করবার কে ?

নফরদার সঙ্গে তো প্রায়ই দেখা হয়। এর পরের বার এই এণ্টনীদের গল্প বলব। কেউ দুঃখে পড়েছে শুনলে উনি গম্ভীর হয়ে যান। কেউ সুখে আছে শুনলে খুশি। ডোরিনের দুর্দশার কাহিনী এখনো ওঁকে বলিনি। বলবার সাহসও নেই, তিনি ভুল বুঝতে পারেন।



বুড়ো ম্যাক্সিমের সঙ্গে আরো কয়েকবার গ্রামে-গ্রামে প্রজাপতি তাড়া করে বেড়িয়েছি। কিন্তু ও যেমন আনন্দ পায়, আমি তেমন পাই না। বাচ্চাদের দলে ও বাচ্চা হয়ে যায়। সাতাশ বছরের যুবক আমি, বয়েসের দেমাকে ভারভারিক্কি আমি, নিজেকে যেন তফাতে সরিয়ে রাখি, প্রাণ খুলে মিশতে পারি না। নফরদাকেও দলে টানতে চেয়েছিলাম কিন্তু রবিবার সকালের দিকটা ওঁর চেম্বারে নাকি রোগীদের মরশুম। থুড়থুড়ে অনেক বুড়োর বাল্যকাল পুনশ্চ ফিরে আসে, নতুন দাঁত গজায় নফরদার সে-পর্বে পৌঁছতে এখনো ঢের দেরি। ছোটাছুটি আমি তেতো ওষুধের মতো গিলি, তবে শেষ অঙ্কের সাঁতার, বিয়ার পর্ব এবং খাওয়া-দাওয়া বেশ জুতসই তা বলতেই হবে।

একদিন ম্যাক বলল, "কাঞ্চন, আমার জীবনে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটেছে যার কূলকিনারা আমি কোনোদিনই ভেবে ঠিক করতে পারিনি। তা স্বপ্নও নয়, আবার সত্যি বললেও কেউ বিশ্বাস করে না। তোমাদের দেশ একটা তাজ্জব দেশ, এখানে সেখানে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে, যা আজগুবি বলে শোনাবে, কারণ বিজ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা সে-সব রহস্য ভেদ করা যায় না। ইণ্ডিয়া ইজ এ স্টোরহাউস অব মিস্ট্রি।"

"কই তেমন কিছু তো এখনো আমার চোখে পড়েনি ?"

"তোমার বয়েসটাই বা কি, কোথায়ই বা গেছ ? শহুরে পালিসের মধ্যে সেগুলো দেখা যায় না, বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতের ঘোমটার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে।"

"বলই না দু-একটা ঘটনা।"

সে গল্প শুরু করল :

এককালে আমার শিকারের যে খুব শখ ছিল তা আমার ড্রয়িংরুমে টাঙানো জিনিসগুলো দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ? আসাম, তেরাই, মধ্যপ্রদেশ, কুমায়ুন,

কুলু, ঢেঙ্কানল, হাজারীবাগের এমন কোনো জঙ্গল নেই যেখানে শিকারের নেশা মেটাইনি। একবার গেলাম রামগড়, রাঁচী থেকে হাজারীবাগ যাবার ঠিক মাঝখানে ঘাট-সেক্সনের ওপর একটা ফরেস্ট বাংলো আছে। খবর পেয়ে বাঘরাঝোরা গ্রামের টিঙ্কু সর্দার লোক পাঠাল, একটা প্রকাণ্ড বাঘের উৎপাতে ওরা অস্থির, তক্ষুনি গেলে ভালো হয়। শিকারের গন্ধ পেলে শিকারী ঠিক থাকতে পারে না, তৈরি খাবার ফেলে রেখে তখনই বন্দুক-টোটা নিয়ে গাড়িতে চাপলাম।

বাঘরাঝোরা রামগড় থেকে মাইল দশেক দূরে। আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ। একদিকে জঙ্গল, আর একদিকে ছ-সাত হাজার ফুট খাড়াই, খুব হুঁসিয়ার হয়ে গাড়ি না চালালে নির্ঘাত যমের বাড়ি। পাশে বসে সাঁওতাল বুচন মাঝি বল্লমে চর্বি মাখাচ্ছিল, হঠাৎ বললে—সাহেব সামনে একটা ঝোপের পেছনে গাড়ি লাগা, ওখান থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

টিঙ্কু সর্দার তার বাড়ির দাওয়ায় বসে তীরে বিষ মাখাচ্ছিল, আমাকে দেখে সেলাম করে বলল—তুই এসেছিস হুজুর? আমরা এ-গাঁয়ের লোক আর টিকতে পারছি না, এ-গাঁয়ের ওপরই শয়তানটার নজর পড়েছে। খেয়ে একটু আরাম কর সাহেব, আমি লোকজন ঠিক করে আসি। সঙ্গে-সঙ্গে সে হাঁক দিল—উদ্নী, উদ্নো, সাহেবের খাবার যোগাড় কর।

গাছের গুঁড়ি আর উঁচু মাটির পাঁচিলে ঘেরা টিঙ্কু সর্দারের বাড়ি। বাড়ি মানে দুখানা ছোট কুঁড়ে, বড় উঠোনের একপাশে গরু ও মুরগীর খোঁয়াড়, তার পাশে ছোট্ট রান্নার জায়গা। আশ্চর্য জাত এই সাঁওতালরা, অনন্ত অভাবের সঙ্গে এদের সারা জীবন যুদ্ধ করতে হয়, জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচবার সম্বল শুধু তীর-ধনুক, বল্লম আর টাঙ্গী, কিন্তু ওদের মুখে হাসি লেগেই থাকে, মাদল ও বাঁশির সুরে নেচে গেয়ে এই অরণ্যসন্তানরা সকল দুঃখ কষ্ট ভয় দূরে ঠেলে রাখে।

টিঙ্কু সর্দার যে কুঁড়েঘরটি দেখিয়ে গেছে, সেখানে ঢুকে বাঁশের শিকেয় বন্দুক আর কার্তুজ ঝুলিয়ে রাখলাম। ছোট একটা তক্তপোশে মাদুর পাতা, খড়ের বালিস। মাটির সোরাইয়ে ঝরনার জল আছে দেখে সোরাই উঁচু করে ঢক-ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে ফেললাম। তারপরে উঠোনে পায়চারি করতে লাগলাম।

প্রায় বছর দশেক আগে টিঙ্কুর এখানে একবার এসেছিলাম, তখন ওর জেনানা বেঁচে ছিল, সাত-আট বছরের একটা মেয়েও দেখেছিলাম মনে হচ্ছে, ঐ উদ্নীই

বোধ হয় সেই মেয়ে, বুড়ো বাপকে এখন দেখাশোনা করে। টিহু এ-অঞ্চলে কয়েক বার আমার শিকারের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। আমার একটা বন্দুক নিয়ে আমার সামনে-সামনে গেছে। দেখতে রোগাপটকা হলেও বুকে ওর দুর্জয় সাহস, আমিই ওকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছিলাম।

রান্নার ঘেরা জায়গায় উঁকি দিয়ে ডাকলাম—উদ্নী! দেখি কত বড় হয়েছিস? ও বসে-বসেই ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যা যা সাহেব, এখানে আসিস না, আমি রান্না করছি।'

এক পলকে দেখলাম যে ওর ওপরের অঙ্গে কোনো আবরণ নেই, তাই লজ্জা পেয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিল। কিন্তু কি সুন্দর মুখ! সাঁওতালী মেয়েদের গড়ন খুব চমৎকার। তার ওপর এ-মুখ যে-কোনো শ্বেতাঙ্গিনী রূপসীকেও হারিয়ে দেয়!

উদ্নী যখন আমার খাবার নিয়ে এল তখন ওর পরনে লালশাড়ি; বুকে কাঁচুলী, মাথার খোঁপায় ফুল। একটা জলচৌকির ওপর পরিপাটি করে সাজিয়ে দিল কাঁসার থালায় মাড়ুয়ার জাউ, খরগোসের মাংস, একবাটি দুধ, একগোছা বৈচিফল। ওরা এত গরীব যে সবসময়ে ভাত জোটে না, ঘাসের বিচি সেদ্ধ করে খায়, ওকেই বলে মাড়ুয়া। বসবার জন্যে পেতে দিল একটা চিতেবাঘের চামড়া। সামনে মাটির ওপর বসে ও আমার খাওয়া দেখতে লাগল আর মুখ টিপে হাসতে লাগল।

'সাহেব তুই বাঘ মারতে আইছিস?'

'হ্যাঁ।'

'এ বাঘটা তুই মারবিক্‌নি।'

'ভারি শয়তান বাঘ যে? তোদের গাঁ সাবাড় করে দেবে।'

'ও বেশি দিন থাকবেক্‌নি এগাঁয়ে।'

মেয়েদের দরদী মন। জিগগেস করলাম, 'মারলে তুই দুঃখ পাবি?'

'হাঁগো হ্যাঁ বটে।'

'কেন রে?'

'উটা আমার সোয়ামী হইছে না?'

'তোর সোয়ামী?'

'হ্যাঁ, বিয়া হইছে না আমার সঙ্গে?'

টিহু সর্দারের জন্যে কষ্ট বোধ করলাম। হায় এমন সুন্দর মেয়েটা তা হলে

পাগল? কিন্তু উদ্নীর চোখ তো পাগলের চোখ নয়? একটা অজানা আশঙ্কা সেখানে ফুটে উঠেছে!

'সাহেব, বাবার সোঙ্গে আজ রাতে শিকারে যাবিক্‌নি, আমার সোঙ্গে জঙ্গলে চল।'

'তুই সোমত্ত মেয়ে, তোর সঙ্গে একা আমি জঙ্গলে যাব কেন রাতের বেলা?'

'ডর লাগে?'

'তোর বাপ যে লোকজন নিয়ে আসছে? তারাও সঙ্গে যাবে?'

'মন্তর পড়্যা ধুলো ছিটাইয়া দিলাম না? কেউ আসবেনি।'

'তুই মন্তর জানিস?'

'যাদুমন্তর জানি।'

মাংসের হাড় চিবোতে-চিবোতে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও বলে কি? একেবারেই পাগল?

'সাহেব, তুকে আগে দেখলে তুকেই বিয়া করতাম, কিন্তু বাঘটাও খুব সোন্দর।'

'আমাকে দেখলে বাঘটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে না?'

'না সাহেব, এই খরগোসটার রক্ত রাখি দিলাম না? সেই রক্ত দিয়ে মন্তর পইড়া তোর কপালে দিলেক বাঘের বাবাও তোকে দেখবেক্‌নি। তোর গায়ের গন্ধও পাবেক্‌নি। বল্ তুই যাবি আমার সোঙ্গে?'

'আচ্ছা, যাব, কিন্তু বন্দুক সঙ্গে নেব।'

'খবরদার সাহেব, বন্দুক লিবিনি। জামাকাপড়ও পরতে পারবিনি।'

এরা বন-জঙ্গলের লোক, মেয়েটা ডাইনী নাকি? কিন্তু কি আশ্চর্য, টিডু সর্দার ফিরে এসে জানাল কেউ আজ আসতে চায় না। সত্যি কি এটা উদ্নীর মন্ত্রের ফল?

রাত্রে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার গায়ে হাত বুলোচ্ছে। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি উদ্নী। ফিসফিস করে বলল: 'সাহেব, শব্দ করবিক্‌নি, ও-ঘরে বুড়ো ঘুমোচ্ছে। ঠিক দুপ্পর রাত, বেরিয়ে আয় আমার সোঙ্গে, ডর করিসনি।'

আমি জুতো পায়ে দিতে যাচ্ছিলাম। ও জুতো ঠেলে দিয়ে আমার গায়ের

জামা-কাপড় খুলে ফেলল। উদগ্র যৌবনাক্রান্ত মেয়েটার এই নির্লজ্জ ব্যবহারে বড় অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। একটা ঠাণ্ডা আঙুলের স্পর্শ কপালে লাগতে বুঝলাম সেই খরগোসের রক্তের ফোঁটা, সঙ্গে-সঙ্গে বিড়বিড় করে বকবক করতে লাগল, বোধহয় কোনো মন্তর-তন্তর। বাইরে চাঁদের আলোয় এসে দেখলাম ও নিজেও একেবারে বিবসনা। এই যুগল-দৃশ্য সভ্য-মানুষের দেখার মতো নয়। আদিম বন্য মানুষেরও আগে অ্যাডাম এবং ইভ বোধহয় এরকমই উলঙ্গরূপে হাত ধরাধরি করে বনবিহার করতেন। নিজের হৃৎপিণ্ডের টকটক শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম কানে।

'লজ্জা কি সাহেব? ভয়ও পাবিক্‌নি।'

আকাশে একফালি চাঁদ থাকলেও বনের ভিতরটা অন্ধকার। বিরাট-বিরাট গাছের তলায় জমাট কালো অন্ধকার। জংলীরা অন্ধকারে দেখতে পায় কিন্তু আমার শহুরে চোখ অভ্যস্ত নয়, ও আমাকে জড়িয়ে ধরে সামলাতে-সামলাতে নিয়ে চলল যাতে হোঁচোট খেয়ে পড়ে না যাই। একটা ফাঁকা জায়গায় মস্ত এক পাথরের চাঙের ওপর আমাকে বসিয়ে ও বাঘের মতো ডাক ছাড়ল। জবাবে আর একটা বাঘের ডাক শোনা গেল একটু দূরে, আর সেই ডাক এগিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে গাছপালা ভাঙার মটমট শব্দ। আমার গায়ের রক্ত যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, মাথা ঝিমঝিম করছিল, হায়, উদ্‌নীর কথা শুনে কেন বন্দুক ফেলে এলাম?

উদ্‌নী আমাকে রেখে এগিয়ে গিয়েছিল একটা ঝোপের কাছে। চাঁদের মিটি-মিটি আলোতে বেশ ঠাহর হচ্ছিল। কনি, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা বাঘ বেরিয়ে এসে ঠিক মানুষের মতোই হাসতে-হাসতে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে উদ্‌নীর গলা জড়িয়ে ধরল। শুনলাম উদ্‌নী বলছে, 'থাক থাক ঢের হয়েছে সোহাগ, এখন বসে পড় মরদ, গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

গরর্‌-গরর্‌ শব্দ করতে-করতে বাঘটা শুয়ে পড়তে উদ্‌নী জিগগেস করল— 'খেয়েছিসনি বুঝি? শিকার জুঠেক্‌নি?'

বাঘটা মাথা নাড়ল। ঠিক যেন বলল, 'না।'

'গরু মানুষ মারতে জানিস, ছোট জানোয়ার ধরতে জানিসনি তুই কেমন লায়েক বটেক? দাঁড়া, আমি আসি।'

উদ্‌নী ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল। আমি একা। পনেরো ফুট মাত্র দূরে ঐ বিরাট মানুষখেকো। ভয়ে আমার বোধহয় জোরে-জোরে নিঃশ্বাস পড়ছিল, ও কান

খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠল। নিজেকে বাঁচাবার কোনো অস্ত্র নেই আমার হাতে, কি অবস্থা আমার বুঝে দেখ।

উদ্‌নী চট করে ফিরে এল। দুই হাতে দুই খরগোস। খরগোস দুটো বাঘটার সামনে রেখে দিয়ে সে বাঘটার পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

'ভালো করে খেয়ে-দেয়ে গায়ে জোর কর তো শ্বশুরের পো? বড়সাহেব আইছে তোকে সাবাড় করতে না!'

ডাইনীটা বোধহয় এবার আমাকেই ঠেলে দেবে ওর মুখে। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসে কেউ মরতে চায় কনি? বাইশ বছর বয়েসে শিকার শুরু করেছি কত বাঘ মেরেছি, কিন্তু এ যেন ফাঁদে পড়েছি!

কিছুক্ষণ পরে ওদের কাউকেই আর চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না, তবে বুঝতে পারছিলাম ওরা ওখানেই আছে। এও ডাইনী মেয়েটার মন্তরের জোর! প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আবার দেখলাম ওরা জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমিও বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অবসন্ন হয়ে। হঠাৎ উদ্‌নী আমার হাত ধরে পাথরটার ওপর থেকে নামিয়ে বলল, 'ঘরকে যাই সাহেব এবার, আমার বাঘ-সোয়ামী চলি গেল না? অনেক দূর চলি গেল তো?'

বাকি রাতটা টিক্কু সর্দারের বাড়িতে সেই কুঁড়ে ঘরটাতেই কেটেছিল, কিন্তু আমি বেঁহুস। ভোর-ভোর সময় চোখ মেলে দেখি উদ্‌নী আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে, গায়ে ওর বাঘের বোটকা গন্ধ, ওর জিভের লালায় আমার সমস্ত মুখ গলা বুক ভিজে গিয়েছে। সারা গায়ে ব্যথা ও জ্বলুনি। ও অঘোরে ঘুমচ্ছে দেখে কোনো-মতে নিজেকে ছাড়িয়ে জামাকাপড় বন্দুক কার্তুজ হাতে নিয়ে দিলাম চোঁ-চোঁ দৌড়, তারপরে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সোজা রাঁচী, কর্নেল ডনাল্ডসনের কুঠীতে। ডনাল্ডসন তখন ওখানকার সিভিল সার্জেন, আমার বন্ধু।

হো-হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, "ম্যাক্‌, তুমি স্বপ্ন দেখছিলে, এর মধ্যে রহস্য কিছুই নেই; ডাকিনীবিদ্যাও নেই। হ্যালুসিনেশন হতে পারে। বোধহয় রামগড়ের ফরেস্ট বাংলোতে সেদিন একটু বেশি হুইস্কি খেয়েছিলে। সেই নেশার ঝোঁকে জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখেছ।"

"কিন্তু ডনাল্ডসন আজ বেঁচে থাকলে বলতে পারত। সাতদিন বেদম জ্বরের ঘোরে কেবল প্রলাপ বকেছিলাম, সমস্ত গায়ে ডোরা-ডোরা দাগ দেখা গিয়েছিল। ডনাল্ডসন বলল সাবকিউটেনাস হেমারেজ, চামড়ার নিচেই চাকা-চাকা জমাট রক্ত, এরকম অদ্ভুত ব্যামো সে নাকি আর দেখেনি, বইয়েও পড়েনি।"

"হতেও পারে, তুমি সত্যিই বাঘরাঝোরায় গিয়েছিলে এবং উদ্নীর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। কিন্তু হিপনটাইজম, মেসমেরিজম আমি অবিশ্বাস করি না, মেয়েটা তোমাকে হিপনটাইজ করেছিল, যা দেখাতে চেয়েছিল তাই দেখেছ। জংলীরা কিছু-কিছু তুকতাক জানে বৈকি। কিন্তু ডাইনী বা ডাইনীবিদ্যা স্রেফ বাজে কথা, গাঁজা-খুরি। সম্মোহনবিদ্যা শিখেছিল মেয়েটা, সেই ভেল্কী তুমি সত্যি বলে ধরে নিয়েছ।"



২১

নফরদা আমার চাকরি পাকা হওয়ায় খুশি হয়েছেন বললেন। এণ্টনীদের খবর শুনেও আনন্দ প্রকাশ করলেন। হারীণদার ব্যাপারে দুঃখিত হলেন।

কিছুদিন থেকে দেখছি ওঁর গালে ভাঁজ পড়েছে, চওড়া বুক একটু ঝটকে গেছে, অট্টহাসি খাদে নেমেছে।

প্রশ্নের জবাবে বললেন, "বয়েস তো প্রায় অর্ধশতাব্দীর কাছাকাছি, এখনো কি দেহটা ক্রিজপ্রুফ শৃঙ্কপ্রুফ ধোবীপ্রুফ থাকবে? ভাঁজ পড়বে না, কুঁচকে যাবে না, ছিঁড়বে না? পুরনো হলে সব জিনিসই ক্ষয়ে যায় রে!"

"বয়েসটাই সব নয়, নেপথ্যে আরো কোনো হেতু থাকতে পারে।"

"আমার ঘরোয়া ব্যাপারে মাথা গলাতে আসিস না।"

"যদি অভয় দেন তবে সাহস করে বলতে পারি। আমাকে আপনি স্নেহ করেন, সেই স্নেহের দাবিতে আপনার স্বাস্থ্যের বিষয় জানবার আমার অধিকার আছে।"

"ওঃ, ক্লেইম আছে বলছ? তা ক্লেইম সাবমিট করতে পার, কনসিডার করা যাবে ইন ডিউ কোর্স।"

"দোহাই দাদা মশকরা রাখুন। চলুন আজ চাইনিজ খানা খেতে যাই ওয়ার্লডর্ফ রেস্টরাণ্টে।"

নফরদা উদরবিলাসী। ব্যস্ততাহীন রবিবারের এই দুপুরে চাইনিজ খানার নিমন্ত্রণ তুচ্ছ করবার মনোবল ওঁর হবে না জানতাম। রাজী হলেন। বললাম, "তার আগে গ্র্যাণ্ড হোটেলের এম্বেসী বারে?"

"উত্তম বৎস। এম্বেসী বার ছোট হলেও আভিজাত্যের দাবি রাখে। হয়তো 'স্টেসম্যান' ও 'ক্যাপিটালে'র সম্পাদকদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ লাভ ঘটতে পারে ওখানে। আমাদের লাইনে ওরা মহাজন, অর্থাৎ মহাসম্মানীত। মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।"

"নফরদা, আগের মতো আপনার ওষ্ঠাগ্রে প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ফটোগ্রাফী, নেতাজীর আলোচনার খৈ ফোটে না কেন? ডাইবেটিস, ডিস্পেপ-সিয়া, স্নায়ুবিকার আর সাংসারিক গোলযোগ ছাড়া এ-পরিবর্তন তো স্বাভাবিক নয়।"

দু পেগ হুইস্কির পরেই ওঁর মনের কপাট কিছুটা ফাঁক হল। বললেন, "শরীরটা বেইমানি করছে কাঞ্চন, তাই জিভের কব্জায়েও মরচে ধরেছে। পায়ে বাতে ধরলে হাঁটুর জোর কমে যায় না? এ-ও সেরকম।"

"কিন্তু আপনার কাছে আরো অনেক কিছু শুনতে চাই, জানতে চাই।"

"শরীর যদি বেইমানি করে তবে তার দাওয়াই আছে ব্রাদার, কিন্তু মানুষ যদি বেইমানি করে তবে সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

"যদি জিগগেস করি কে এই বেইমানি করল?"

"আমার ঘরোয়া ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশ করতে চাস?"

"আমি তো আপনার আপনজন? আপনজনের কাছে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ উঠতে পারে না।"

"কেউ কারু আপনজন নয় রে! চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক নিয়ে এ সংসার।"

"আমি তো কিছু চাই না আপনার কাছে?"

"এই তো জানতে চাইছিস। তোকে খুব স্নেহ করি কিন্তু দুটি মিত্ররাজ্যের মাঝখানেও একটা নির্দিষ্ট সীমান্ত চিহ্নিত থাকে, চেকপোস্ট থাকে। যাক, চল এখন ওয়ার্লডর্ফে। ট্যাক্সির দরকার নেই, এটুকু পথ হেঁটেই মেরে দেওয়া যাবে।"

ওয়ার্লডর্ফের ম্যানেজার চীনে হলেও পরিষ্কার বাংলা বলে। নমস্কার করে কাছে এসে দাঁড়াল। নফরদা বললেন, "আজ কি খাওয়াবে সাহেব? আরশোলার চচ্চড়ি, ব্যাঙের ছেঁচকি, ইঁদুরের ল্যাজভাজা তো? ওসব চলবে না এ পোড়ারমুখে।"

"কি যা তা বলছেন রিপোর্টার মোশাই, হুকুম করুন কি খেতে চান।"

"সরল বাংলায় ক্যাণ্টনী পোলাও, শুয়োরের ডালনা, চিংড়ীর চাটনী। তোমাদের এখানে তো মধুরেণ সমাপয়েতের ব্যবস্থা নেই, দিও না হয় ঐ মামুলি নির্দুধ নির্চিনি সবুজ চা।"

চুং লিং বলল, "ভালো আইসক্রীম আছে। চকোলেট লেমন র‍্যাপসবেরী পাইনাপেল ম্যাঙ্গো, যে ফ্লেভার চাইবেন তাই পাবেন বোসসাহেব।"

"যদি পেস্তা বাদাম মিশিয়ে দিতে পারো তবে আর কোনো সুবাসের দরকার নেই।"

নফরদা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "দাঁতের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেছে। আইসক্রীমের কনকনানিতে খাবার সুখ মাথায় উঠে যাবে, কিন্তু শরীরটাকে তুলোর বাক্সে ভরে রাখা বুদ্ধিমানের কার্য নয়, যেখানটায় ঘুণ ধরেছে সেখানে মাঝে-মাঝে ঝাঁকানি দিতে হয়, যাকে বলে শক ট্রিটমেণ্ট। খাব আজ আইসক্রীম।"

খাওয়া শুরু হলে বললাম, "আসুন নফরদা এবার বলে ফেলুন কি বলবেন বলছিলেন, আর এভাবে ঝুলিয়ে রাখবেন না দয়া করে।"

নফরদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরম্ভ করলেন, "বলেছিলাম না তোকে আমার স্টুডিও বড় করেছি, আমেরিকা থেকে দামী দুটো ক্যামেরা এনেছি, একজন অংশীদারও নিয়েছি।"

"হ্যাঁ।"

"সে অংশীদার আমার ভাইপো। টাকা সবই আমার, আমার সময়ের অভাব বলে দেখাশোনার ভার দিয়েছিলাম তাকে। সে আমার মাথায় ডাণ্ডা মেরেছে।"

"কি রকম ?"

"একে দিতে হবে ওকে দিতে হবে বলে আমার কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে কিন্তু সে-টাকা পাওনাদারদের দেয়নি, আমাকে জাল রসিদ দেখিয়েছে। প্রায় পনেরো হাজার টাকার গরমিল। অথচ ওকে পার্টনার করেছিলাম ওরই ভবিষ্যৎ পাকা করে গড়ে তুলতে !"

"কিন্তু আপনার কোনো ভাই আছে বলে তো কখনো শুনিনি ? ভাই নেই তবে ভাইপো কোত্থেকে এল ?"

"পিসতুতো ভাই, দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই, বাবার মুখে এ পিসির নাম কখনো শুনিইনি। পার্টিসন হয়-হয় এমন সময় ঢাকা থেকে পালিয়ে এলাম। বাবা মা আগেই মারা গিয়েছিলেন তাই কোনো বন্ধন ছিল না। জমিজমা বিস্তর ছিল, যে-ব্যাটার কাছে বিক্রি করলাম সে মাত্র পাঁচশো টাকা দিল, ঠিক হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। উল্টে শাসিয়ে গেল দুদিন পরে সব তাদেরই হবে, এক পয়সাও দিতে হবে না, এখন এই যথেষ্ট।"

"ঐ পিসতুতো ভাই ?"

"কিছুদিন পরেই ভদ্রলোক তিন মেয়ে এক ছেলে নিয়ে সস্ত্রীক আমার স্কন্ধে এসে চাপলেন। কষ্ট হচ্ছিল কোন এক রেফিউজি কলোনীতে, আমার মতো আপনজনের কাছে ছাড়া আর কোথায় যাবেন! ওঁর তিনটে মেয়েকেই বিয়ে দিয়েছি আমি, ছেলেটার পেছনেও টাকা জলে ফেলেছি অনেক, কিন্তু লেখাপড়া কিছু হল না, তবুও বৌঠাকরুন তাকে বিয়ে দিলেন, কিছু টাকা দাঁও মেরে। দুটো বাচ্চা হয়েছে, তাই ওর ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে ওকে আমার পার্টনার করে নিলাম, বেশ মোটা একটা অংশ দিয়ে। ও-ই আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙল।"

"পিসতুতো ভাইটি চাকরি-বাকরি করেন কিছু?"

"গীতাপাঠ আর জপতপেই দিন কেটে যায়, চাকরি করবার সময় কোথা?"

"আপনার বৌঠাকরুন কিছু বলেন না?"

"ছেলেকে ভয় করেন, টাকাটার কথা বলতে তিনি বারুদের পিঁপের মতো আগুন দাগলেন, আমাকেই ন্যাজ গুটিয়ে পালাতে হল।"

"বৌমাটি কি রকম?"

"আগে তো ভালোই ছিল, ইদানীং একটু কথাবার্তায় ধার হয়েছে। মেয়েদের দুটো-তিনটে বাচ্চা না হলে ওদের চরিত্র ঠিক বোঝা যায় না। এখন কিছুদিন থেকে বৌমাটি বলছে শ্বশুর শাশুড়ী খুড়শ্বশুর নিয়ে ঘর করা ওর পোষাবে না। স্বামীর কতখানি মুরোদ তা বোঝে না।"

"আপনাকেও ও-কথা বলতে সাহস পায়?"

"সাহস থাকলেই সাহস বাড়ে! আজ প্রায় ছ'মাস বাড়িতে রান্না-খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। সকালে নিজেই চা করে খাই, সারাদিন বাইরে কিছু খেয়ে নিই। রাতে কুকারে খিচুড়ি চড়িয়ে দি, যদি ইচ্ছে না করে তবে পাউরুটি মাখন, রেডিমেড ডিনার।"

"শরীর আপনার খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন এবার বুঝলাম। ওদের তাড়িয়ে দিয়ে ঠাকুর চাকর রেখে নিন না কেন?"

"পাগল? ওরা দাঁড়াবে কোথা, খাবে কি? এটা তো ওদের দোষ নয়, আমার নিজেরই কর্মফল। বৌঠাকরুন দুটো কথা ঠিকই বলেন। একটি, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাওয়া যোগাবেন। দ্বিতীয় নম্বর, স্বামীর পুণ্যেই খেয়ে পরে আছেন।"

"অথচ আপনার টাকাতেই সংসার চলছে?"

"হয়তো বা ওদের জন্তেই টাকা পকেটে আসছে? আমি শুধু নিমিত্ত।"

"আমি হলে সহ্য করতাম না। আপনাকে ভালোমানুষ পেয়ে ওরা ঠকাচ্ছে।"

"কে কি করল, কে কি বলল মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয় ব্রাদার। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকতে। পাঁকাল মাছ কাদার মধ্যে থাকে, কিন্তু গায়ে কাদা মাখে না, পাঁকের বাইরে এলেই গা চকচক করে।"

নকরদা সত্যিই একটি পাঁকাল মাছ। বললাম, "আপনার মতো ছেলে যাঁর, তাঁর কথা একটু শুনতে ইচ্ছে হয়।"

"আমার মায়ের কথা আর কী বলব? তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবতী। তাঁর কাছে চাইতে এসে কেউ খালি হাতে ফিরত না। কোথাও কেউ কষ্টে পড়েছে জানলে গোপনে পাঠিয়ে দিতেন চাল টাকা কাপড়। পুজো-আচ্চা নিয়েই তাঁর সময় কাটত। বাবা ছিলেন নাস্তিক কিন্তু ষোলো আনা খাঁটি লোক। আমাদের ঢাকা শহরে একটা বাড়ি ছিল, কিন্তু সারা জীবন উনি গ্রামেই কাটিয়ে দিলেন। নিজে খাঁটি বলে অসাধুতা বা ভণ্ডামি বরদাস্ত করতে পারতেন না, যেই হোক না কেন মুখের ওপর বলে দিতেন। গ্রাম্য জমিদার কিন্তু মেজাজ ছিল বড় জমিদারের মতো, তাই যতটা শ্রদ্ধা তিনি পেতেন তার চাইতে বেশি পেতেন শত্রুতা। বাঙলা দেশের গ্রাম্যসমাজে অনেক রকম গলদ।"

"শরৎ চাটুয্যের 'পল্লী সমাজে' এটা বেশ ফুটে উঠেছে।"

"গ্রামের সেই ডাক্তারবাবুর গল্প তোকে বলেছি। মা যখন বিনিচিকিৎসায় মারা গেলেন তখনই ঠিক করলাম ডাক্তারি শিখে গরীবের সেবা করব, বাবারও তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পোড়া কপাল সে প্ল্যান ভেস্তে গেল পার্টিসনে। বাবাও হঠাৎ হার্টফেল করলেন। রেস্ত-রোজগার ছিল না তাই মেডিকেল স্কুলে ঢোকা আর হল না। না খেয়েই মারা যেতাম, কিন্তু বরাত গুণে পড়ে গেলাম এক সাহেবের নজরে। 'বোর্ণ অ্যাণ্ড সেপার্ড'-এর নাম শুনেছিস? খুব বড় ফটোগ্রাফির দোকান? সেপার্ড সাহেব ছিল ওরই মালিক। সাহেবটির ছিল দরাজ প্রাণ। আমাকে নিজের হাতে ফটোগ্রাফি শিখিয়ে ছ মাস বিলেত ঘুরিয়ে আনল। কিন্তু ওর ওখানে আর চাকরি করতে দিল না, কারণ আমাকে কর্মচারী হিসেবে রাখতে নারাজ। স্বাধীন ভাবেই কাজ করি সে-ইচ্ছেই ও জানিয়ে দিল।"

"হোমিওপ্যাথি শিখলেন কবে? কার কাছে?"

"কারু কাছে নয়, শুধু বই পড়ে। কিন্তু আমার মা'র নাম করে যে ওষুধ দিই তা আশ্চর্য ফল দেয়।"

নব্বরদার জীবনের অনেক কিছুই এক অজ্ঞাত অন্ধকার গুহাগর্ভ হতে আজকের দুপুরের এই প্রখর আলোকে আমার কাছে প্রকাশিত হল।

বিল মিটিয়ে পার্ক স্ট্রীটে নেমেছি, উনি বললেন, "ব্রাদার, এখান থেকে এণ্টালি তো বেশি দূর নয়, চল হেঁটেই মেরে দি। বেশ ভালো খেলাম রে! এখন খানিকটা হাঁটলে তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যাবে।"

"চলুন, আমি তথাস্তু বলতে রাজী।"

"তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, দেখা হয়ে গেল ভালোই হল। তোকে একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?"

"সেই সন্ধ্যের অন্ধকারে ডেভিল অ্যাণ্ড দি ড্যামসেল? যার মা'র অসুখ হয়েছিল?"

"সে-ই বটে, বড় মুশকিলে পড়েছে।"

"বুড়িটা কি এবার মর-মর?"

"প্রায় তাই, কিন্তু বলছি মেয়েটার কথা। যে ছোকরাকে ও কথা দিয়েছে বিয়ে করবে মুশকিল হয়েছে তাকে নিয়ে। পরিস্থিতি জটিল।"

"কি অসুখ তার?"

"অসুখ দেহের নয়, মনের। ঘোরতর সন্দেহবাতিক। কিছুদিন থেকে ওর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে মেয়েটা আর কারু সঙ্গে ঢলাঢলি করছে। মেয়েটা সে ধাতের নয়। আমার ওপর ওর অগাধ বিশ্বাস, বলছে ওষুধ দাও।"

"দেখুন না চেষ্টা করে। লাগে তো তাক, না লাগে তো তুক।"

"আসছে রবিবার যাব বলেছি, কিন্তু তুই থাকলে ভালো হয়। বিকেল পাঁচটায় সেই পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকিস, ভুলে যাস না।"

"দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। একটা সুখবর আছে। একটা ফিয়াট গাড়ির বায়না দিয়েছিলাম সাত মাস আগে, কাল সকালে পেয়ে যাব।"

"বাপের টাকা উড়োচ্ছিস খোলাম কুচির মতো?"

"সবটা বাপের টাকা নয়, নিজেরও আছে। অফিসের গাড়িতে চারজনে যাতা-

রাত করতাম, ভারি অসুবিধা হত। এর জন্যে ওর দেরি তার জন্যে আমার দেরি এই ব্যাপার দু'বেলা। শ্যামের পথ চেয়ে রাধিকা যখন দাঁড়িয়ে থাকতেন তখন সময়ের কোনো বালাই ছিল না, এখন সময়ের দাম আছে। হয়তো আমরা তিনজন তৈরি, তখন চতুর্থ নম্বরটির দেখা নেই। নিজের গাড়ি থাকলে এ দুর্ভোগ ভুগতে হয় না।"

মিশ্রিলালের পানের দোকানের সামনে গাড়িতে বসেছিলাম সে-রবিবার। পাঁচটার অনেক আগেই গিয়েছিলাম, পড়ছিলাম, 'লাইফ' ম্যাগাজিন। হঠাৎ হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কে কেড়ে নিল, দেখি নফরদা।

"বেশ গাড়ি হয়েছে। সবুজ রঙ্‌টা মিষ্টি। প্রকৃতি দেবীর ফেভারিট রঙ্‌। ধানের মাঠ সবুজ, গাছপালা সবুজ। রবীন্দ্রনাথ এ রঙ্‌টাকে তরুণের প্রতীক বলে মেনে নিয়েছেন। এক জায়গায় বলেছেন, 'ওরে সবুজ ওরে অবুঝ ওরে আমার কাঁচা, আধ-মরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।' তরুণদের লক্ষ্য করে কবির এ আহ্বানে সাড়া দে কাঞ্চন। তুই তরুণ, তোর মনটা এখনো সবুজ, তোর সারা জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সামনে পড়ে আছে। আমি দেহ ও মনে শুকিয়ে যাচ্ছি, আধমরা হয়ে গেছি, দু-এক ঘা মেরে বাঁচাতে পারবিনে ?"

"ভেতরে এসে বসুন।"

"বাঃ, গদিগুলো তো বেশ কমফর্টেবল ? খুব আরামে বসা যায়।"

"এ-সংখ্যায় লাইফ-এ অনেক ছবি দিয়ে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে—'কেভ পেইন্টিংস অফ প্রি-হিস্টরিক ম্যান।' ইউারোপের দক্ষিণ তল্লাটে অনেক গুহা আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে এখন থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরেরও আগে, সর্বশেষ-তুষারযুগের অন্তভাগে ও নব প্রস্তরযুগের প্রথমভাগে আদিম বন্যমানবের শিল্পবোধ দেওয়াল চিত্রে আত্মপরিচয় রেখে গেছে। তারা কল্পনাও করেনি বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে এগুলো গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।"

'চমৎকার ছাপা। অন্ধকার গুহায় এরকম নিখুঁত ফটো তোলা খুব বড় দরের আর্ট। ইংরেজরা মুখমিষ্টি হাড়ে বজ্জাৎ এম্পায়ার বিল্ডার, ফ্রেঞ্চরা লিবার্টি ফ্রাটার্নিটি ইকোয়ালিটির ডঙ্কা বাজিয়ে ওগুলিরই পিণ্ডি চটকায়, আর এই আমেরিকানরা

দাদন কর্জ ডোনেশান দিয়ে ছোট বড় জাতের মাথা কিনে রেখেছে, বই ছাপিয়ে নিজেদের জয়গান প্রচার করছে।

হঠাৎ নফরদা বললেন, "ঐ দেখ।"

দেখলাম এক বলিষ্ঠ শ্যামবর্ণ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরার সঙ্গে একটি মেয়ে। কি আশ্চর্য! মেয়েটি আর কেউ নয়, আমাদের মিস্ টেভারেস বললাম! "নফরদা, ও আমারই টাইপিস্ট, মিস্ টেভারেস!"

"তোর কাজকর্ম করে?"

"ঘোষাল সাহেবের আর আমার।"

"ও-ই সেই মেয়েটা যাকে মাতালের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। ঐ ছোকরার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে, যাকে ওষুধ দিতে হবে।"

"তবে আমাকে কেটে পড়তে হচ্ছে। এর মধ্যে আমি যেতে পারি না। কোথায় যাবেন বলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।"

"থাম না, আগে শুনেইনে। মেয়েটাকে তুই চিনিস, না-চিনিস, কিছু আসে যায় না। থাকব আমরা নেপথ্যে অদৃশ্য। সামনের মোড়ে নিয়ে যা গাড়ি, মিকিমাউস নামে একটা রেস্টরাণ্ট দেখতে পাবি। আমরা সদর দরজা দিয়ে ঢুকব না, ঢুকব পেছনের দরজা দিয়ে। একটা থামের আড়ালে একটা টেবিল আমাদের জন্যে রিজার্ভ আছে, ওরা আমাদের খুব কাছেই বসবে কিন্তু আমাদের দেখতে পাবে না, কেবল আমি একটু সরে বসে ছোকরাটার ওপর নজর রাখতে পারব। তোর ধরা পড়ার ভয় নেই।"

"এ যে রীতিমতো গোয়েন্দা কাহিনী?"

"তুই কান পেতে শুনবি ওদের কথাবার্তা, পরে আমাকে বলবি। আমি রজার্সের হাবভাব খুব ভালো করে পরীক্ষা করব।"

"রজার্স কে?"

"ছেলেটার নাম। কি রকম করে বসে, সোজা হয়ে বসে না ঘাড় কাত করে বসে। যদি ঘাড় কাত করে বসে তবে ডাইনে কাত না বাঁয়ে কাত। ডান হাত দিয়ে চায়ের কাপ মুখে দেয় না বাঁ হাত দিয়ে। আঙুলগুলি নাক খোঁটে, না খোঁটে না। দু পা-ই স্থির থাকে, না এক পা নাড়ায়। আরও অনেক কিছু আমার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সব একা করা যাবে না বলেই তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"জানি নফরদা। কবিরাজদের নাড়ী টিপে বায়ু পিত্ত কফের আধিক্য হিসেব করা, এ্যালোপ্যাথিকের ক্লিনিকাল একজামিনেশন আর আপনারা হোমিওপ্যাথিকদের সিম্পটম্‌সের পিণ্ডি চটকানো। এর চাইতে ঝাঁড়ফুঁক মাদুলী দৈব-ওষুধ ঢের ভালো ছিল আগেকার দিনে।"

"ফাজিলচন্দর, বকবক করিসনে। হোমিওপ্যাথি দাওয়াই যদি তাক মতো লেগে যায় তবে রোগের চোদ্দপুরুষ বাপ-বাপ করে ভেগে যাবে। তাড়াতাড়ি চল এখন।"

যেতেই হল। গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে আর কি করা যায়? একটি প্রণয়ীযুগলের একান্তে আলাপন শোনায় যদি আমার কোনো পাপতাপ হয় তবে সে পাপ হবে নফরদার, কারণ এ ব্যাপারে উনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্রমাত্র।

কান খাড়া করে শুনে যাচ্ছি আমি, আর উনি বকের মতো গলা বাড়িয়ে রজার্সকে লক্ষ্য করছেন। শুনলাম মিস্‌ টেভারেস বলছে, "না রডনী আসতে আমার মোটেই দেরি হয়নি, তোমার ঘড়ি ঠিক নেই।"

"বাজে কথা মলি, আসতে তুমি রোজই দেরি কর। আমার ওপর টান তোমার ক্রমেই কমে আসছে বুঝতে পারি।"

"আমার জীবনে তুমি ছাড়া অন্য পুরুষ নেই, ভগবানের নামে বলছি।"

"এ-অফিসে চাকরি নেবার পরেই তোমার পরিবর্তন এসেছে।"

"যা-তা বল না রডনী। মিস্টার ঘোষাল আমার বাপের বয়সী।"

"আর ঐ ছোকরাবয়সী সানিয়াল?"

"ওটা তো একটা গোমড়ামুখো অভদ্র। শুনেছি বড়লোকের ছেলে, আমাদের মতো চুনোচিংড়িদের বোধহয় ঘেন্নাই করে। ওর সঙ্গে জমাতে যাব আমি?"

"কিসে বুঝলে ঘেন্না করে?"

"একদিন ওর কাছ থেকে ডিক্টেশন নেবার সময় পেনসিলটা ভেঙে গেলে ওরটা চেয়ে নিলাম। জানোই তো আমার অভ্যেস, পেনসিলের শিষটা ঠোঁটে ভিজিয়ে নিতেই ও সেটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে দিয়ে বলল—যাও, এখন ডিক্টেশন নিতে হবে না, আমার জন্যে আর একটা পেনসিল গিয়ে পাঠিয়ে দাও। যেন আমার মুখে সাপের মুখের মতো বিষ! দি ব্রুট!"

নেপথ্যে আছি। চোরের মতো লুকিয়ে। প্রতিবাদ করা চলে না। হজম করে

যেতে হল। ঘটনাটা অবিশ্যি সত্যি। মুখের থুথুতে সবারই নানারোগের জীবাণু থাকে। এসব বদ অভ্যাস একেবারে দেখতে পারি না। আবার শুনলাম রজনী বলছে, "মলি, তবে তুমি বারে-বারে বিয়ের তারিখ পিছোচ্ছ কেন? আমারও ধৈর্যের একটা সীমা আছে? দেখেছ আমার পকেটে এই ছুরি? এটাই আমার বুকে বসিয়ে দেব একদিন, তুমিও নিষ্কৃতি পাবে। তখন যাকে খুশি বিয়ে কর।"

"পেসেন্স ডার্লিং, আর কটা দিন সবুর কর। মা'র মৃত্যুর পর মোটে ছটা মাস অপেক্ষা করতে পারবে না? আমার জীবনে অন্য পুরুষ নেই কতবার বলেছি?"

"তবে ও ছোকরাটা কে, যে তোমার পাশে-পাশে আসছিল?"

"কখন? কোথায়? কেউ তো আসছিল না? তুমি কি আজকাল জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখ রজনী?"

"আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না, মলি।"

ওরা চলে গেলেই আমরা দু-কাপ চায়ের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। নকরদা বললেন, "বাড়ি পৌঁছে দে আমাকে, ব্রাদার। বলে যা ওরা কি বলাবলি করল। সব মনে আছে তো?"

"প্রত্যেকটি কথা।"

উনি শুনে যেতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে শুধু হুঁ দিয়ে গেলেন। শেষে বললেন, "বড় শক্ত কেস, কাঞ্চন। ইলিউসন ডিলিউসন হ্যালুসিনেসন এ তিনটে লক্ষণই আছে। নড়াপাগল সারানো যায় কিন্তু সেয়ানাপাগল সারানো শক্ত। বনের বাঘের চাইতে মনের বাঘ ঘাড় মটকায় বেশি। মাত্র দু-ডোজ ওষুধ দেব। চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে মেয়েটা ওকে খাইয়ে দেবে, ও জানতেও পারবে না।"

"নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের মতো আপনাদের ওষুধ স্বাদহীন বর্ণহীন গন্ধহীন। সুবিধে ঐখানে।"

"ছোকরাটা দেখলাম সিগারেট খায় না, আমার ওষুধে ধরতেও পারে, এখন মেয়েটার বরাত।"



২২

আমার অসুখের সময় এত সেবা করল ডোরিন, কিন্তু তার পর থেকে আমা। কাছাকাছি আসেনি, পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে থাকতে পারে না, সঙ্গী চায়, যার সঙ্গে দুটো খোসগল্প করে মনটা হাল্কা হয়। কলকাতার জীবনে আমার সঙ্গীর অভাব। অফিসের পরে অথবা ছুটির দিনে নিঃসঙ্গতার ফাঁসে হাঁপিয়ে উঠি। মাঝে-মাঝে ডোরিন-এর ঘরে যেতাম, ওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, বেশ লাগত। সেটাও বন্ধ করল।

ম্যাক, নফরদা, এণ্টনীদা, মুন্নাদির সঙ্গে বয়েসের আমার অনেক তফাত। বয়েসের যেখানে ঢের ব্যবধান সেখানে প্রাণ খুলে কথাবার্তা চলে না। প্রায়ই সামলে চলতে হয়। ওয়ালেশ আর্মস্ট্রং ভেঙ্কটরা সহকর্মী হিসেবে ভালো, তার বেশি কিছু নয়।

ডোরিন আমার পাশের ঘরে থাকে, বয়েসেও প্রায় আমার সমবয়সী। সেদিন আমার অন্তরে আঘাত দিয়ে ও বলেছিল—তোমাকে বেশিদিন চিনি না। আমাকে দূরে রাখবার জন্যেই এ আঘাত দিয়েছিল কিনা জানি না, তবে বেশি দিন চেনা-শোনার সুযোগ না দিয়েই আমার সম্বন্ধে কোনো ধারণায় পৌছনো কি আমার ওপর অবিচার করা হয় না?

সেদিন শেহরাজাদীতে ও যা দেখেছে তাতে পুরুষজাতের ওপর একটা অশ্রদ্ধা আসবারই কথা। কিন্তু এটা ও ভেবে দেখছে না কেন যে প্রলোভনের কারণ তো নারী নিজেই সৃষ্টি করেছে? নিজে ধরা না দিলে কেউ ধরতে পারে? আমি সেই পুরুষজাতের একজন বলেই কি ও আমাকে বিনাবিচারে শাস্তি দিতে চায়? ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে, আমিও প্রায়ই নিঃসঙ্গ গৃহবাসে হাঁপিয়ে উঠি, বন্ধুভাবে কি আমরা মিশতে পারি না?

ও নারী। ও জানে ও সুন্দরী। ও জানে সুন্দরী নারীর প্রতি পুরুষের মোহ আছে। কিন্তু নিজেকে যাচাই করে দেখেছি ওর বাইরের খোলসটার ওপর আমার

মোহ নেই। সমবেদনা সহানুভূতিকে কি মোহ বলা চলে? তবে ওর স্বভাবটিও সুন্দর, সেটাই আমাকে হয়তো বেশি আকর্ষণ করেছে। ওর সঙ্গ আমার খুব ভালো লাগে। আমি ঠিক বুঝেছি ও গিল্টি-করা সোনা নয়, খাঁটি সোনা। ওর চরিত্র, রুচিবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়, নকরদা যাকে ইনফ্যাচুয়েসন বলেন, এটা তা নয়।

না, ডোরিনকে আমি দেব না দূরে সরে যেতে। আমাকেও ও দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। ওরও প্রয়োজন আছে আমাকে দিয়ে, আমারও প্রয়োজন আছে ওকে দিয়ে। সে-প্রয়োজনের মধ্যে এতটুকুও খারাপ কিছু নেই।

আজ অফিস ছুটি। দুপুরটা কাটতে চাইছে না। ডোরিন তার ঘরে আছে টের পেয়েছি। দরজায় ধাক্কা দিলাম। ডোরিন দরজা খুলল, আমাকে দেখে মুখ নিচু করে জিগগেস করল, "তুমি? কি চাও?"

"এক কাপ চা। বেজায় তেষ্টা পেয়েছে চায়ের। দিতে আপত্তি আছে?"

"সত্যি চায়ের তেষ্টা পেয়েছে? এখন তো সবে তিনটে বাজে?"

"যদি তোমার অসুবিধে হয়, দরকার নেই।"

"না, কোনো অসুবিধে নেই। বসো, আমি তৈরি করে নিয়ে আসছি?"

"বসো ডোরিন, একটু পরে হলেও চলবে।"

"তবে যে বললে বেজায় তেষ্টা পেয়েছে?"

"তেষ্টা একটু সবুর করতে পারবে।"

ও বসল না। দাঁড়িয়েই রইল।

"ডোরিন!"

"কি?"

"এমন পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?"

"না তো!"

"মিছে কথা বললে পাপ হয় জানো? আমার চোখের দিকে তাকাও।"

"চারদিকে তো পাপই কেবল দেখছি? একলাটি একটু বসো, আমি যাই ভেতরে।"

যা ভেবেছিলাম তাই। সবার ওপর ওর ঘৃণা এসে গেছে হঠাৎ। কিন্তু এও কি একটা অভিনয় নয়? ও যে পরিবেশে পয়সা রোজগার করে সেখানে কি ভোগ-

লিপ্সা ও ইন্দ্রিয়বিলাসের কদর্য রূপটি ওর এতদিন চোখ পড়েনি? কিন্তু বিনাবিচারে ও আমাকে অন্য সব পুরুষের মতো ধরে নিয়েছে। আমি ওকে সে ভাবে বিচার করতে চাই না। হয়তো ও আর্টের পূজারী হয়ে আর্টের সাধনায়ই ভরপুর ছিল এতদিন, অন্যদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমার বিচারে ওকে সন্দেহের অবকাশ রাখব না। বললাম, "কিন্তু ডোরিন চারিদিকে যাদের দেখেছ, তাদের থেকে তুমি তো আলাদা।"

"কিসে আলাদা?"

"জানি না, কিন্তু আমার তাই মনে হয়।"

"যা মনে হয় সেটাই যে ঠিক তা বলা যায় না। চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে? খাচ্ছ না কেন?"

"খেতে ভালো লাগছে না।"

"খারাপ হয়েছে? আবার তৈরি করে আনব?"

"না, না, ভালোই হয়েছে, তোমার হাতের তৈরি! যোশেফের হাতে চা খেয়ে-খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে।"

ডোরিন নীরব, কি যেন ভাবছে। আমি কার সঙ্গে কথা বলব? কি কথা বলব?

ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে একটা কালো দাগ। যোশেফ যা বলেছিল মনে পড়ল। বিকারের ঝোঁকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো দাঁত বসিয়ে দিয়েছিলাম। বললাম, "তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানো হয়নি এখনো।"

"কিসের কৃতজ্ঞতা?"

"অসুখের সময়-কত সেবা করলে। তারপর কত রান্না করে পাঠালে।"

"তুমি যে সেরে উঠবে সে আশা ছিল না। কি যে চিন্তায় ফেলেছিলে?"

"মরে গেলে দুঃখ পেতে?"

"কে জানে, কি করে বলব? হয়তো পেতাম না, সবাই তো একদিন মরবে?"

"হৃদয়হীন পাষাণ তুমি ডোরিন। আগে তো এমন ছিলে না?"

ও হঠাৎ উঠে চলে গেল। চলে আসব কি বসে থাকব ঠিক করতে পারলাম না। ওভাবে ও উঠে চলে গেল কেন? রাগ হয়েছে? তবে আমারও দু-একটি কড়া কথা বলবার আছে।

ছেলেমানুষি বুদ্ধি হয়তো আমার যায়নি। ঐ ভিতরের ঘরে কখনো যাইনি

কিন্তু যাওয়ার দরজাটা দেখেছি। ঢুকে পড়লাম। শুনিয়ে দেব যা বলার আছে। গিয়ে দেখি ডোরিন রুমাল মুখে গুঁজে কাঁদছে! বললাম, "কাঁদছ তুমি? আমি কি বলেছি যে তোমার কান্না পেয়ে গেল?"

"কিছুই বলনি, কাঞ্চন, আমার মাথা ধরেছে।"

"এ-ঘরে তো হাওয়া ঢোকে না। চল আমার সঙ্গে, একটু বেড়িয়ে আসি। না বলো না। না বললে শুনবও না। তৈরি হয়ে নাও।"

লোয়ার সার্কুলার রোড, পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, ধর্মতলা স্ট্রীট ছাড়িয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পথ ধরলাম। আমি গাড়ি চালাচ্ছি পরম তৃপ্তিতে, ডোরিন আজ বহুদিন পরে আমার পাশে বসেছে, আমার নিজের গাড়িতে, ভাড়া করা ট্যাক্সিতে নয়।

"এটা তোমার গাড়ি কাঞ্চন?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে তো বলোনি তুমি গাড়ি কিনেছ?"

"যার সঙ্গে দেখা হয় না তাকে কি করে বলা সম্ভব?"

সামনে একটা সিনেমা। 'ম্যাটিনী শো' সবে ভেঙেছে। সিনেমাঠাকুরানীর জঠর থেকে দর্শকরা পিলপিল করে বেরোচ্ছে। জনস্রোত এবং গাড়ি ও ট্যাক্সির ভিড় দলা পাকিয়ে এমন চাক বেঁধেছে যে ট্রাফিক পুলিস সে জট ছাড়াতে হিমসিম খাচ্ছে। সামনের গাড়ির সারি হর্ন দিচ্ছে, পেছনের গাড়িগুলো হর্ন দিচ্ছে, যেন হর্নের ঠেলায়েই পথ করে নেওয়া যাবে। কিন্তু অচল অবস্থা সচল হচ্ছে না।

মা মাসিমা পিসিমার চেয়ে আজকাল সিনেমার আসন অনেক উঁচে। অনাটন যতই বাড়ছে সিনেমার টানও ততই জোরাল হচ্ছে। অল্প পয়সায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে সংসারের ঝামেলা ভুলে থাকা যায়।

পেট্রোল পুড়িয়ে লাভ নেই, তাই গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে কিছুক্ষণের জন্যে কায়েমী হয়ে বসলাম। দেখা যাক পুলিসপুঙ্গব কতক্ষণে ফয়সলা করতে পারে।

ডোরিন বলল, "ইণ্ডিয়ান মেয়েদের শাড়ি কি সুন্দর গ্রেসফুল, কাঞ্চন! শুধু চোখেই দেখি, হাত বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে সিল্কের শাড়িগুলো।"

"সে বাসনা পূর্ণ করা এমন কিছু শক্ত নয়। কাছেই বড় একটা শাড়ির দোকান আছে, ঢুকে পড়লেই হল।"



"উল্টিয়ে-পাল্টিয়ে ঘেঁটে যদি না কিনি তবে দোকানের লোকেরা ভাববে কি ?"

"শাড়ির দোকানের লোকদের চামড়া শক্ত হয়ে যায়। মেয়ে-খদ্দেররা কিরকম চীজ তা ওরা ভালো করেই জানে। বিশ-ত্রিশখানা ঘেঁটেঘুটে শ্রীমতী যদি মুখ বাঁকিয়ে চলে যান, তবুও ওরা কিছু ভাববে না। শ্রীমতী যদি একখানা দামী শাড়ি পছন্দ করে বসেন তবে ভাবনাটা শ্রীযুক্ত স্বামীর।"

আজকাল দোকানীরা বেশ সাহিত্যরসবোধের পরিচয় দিচ্ছে। যদি শোনেন কোনো দোকানের নাম 'শ্রীচরণেষু' তবে বুঝবেন ওখানে জুতো বিক্রি হয়। যদি শোনেন কোনো দোকানের নাম 'অধরসুধা' তবে বুঝবেন ওটা মিষ্টির দোকান। একটু মুশকিলে পড়বেন যদি শোনেন কোনো দোকানের নাম 'তনুশ্রী,' কারণ ওটা শাড়ির না গয়নার দোকান হঠাৎ বুঝে উঠতে পারবেন না! এইমাত্র ডোরিনকে যে শাড়ির দোকানের কথা বললাম তার নাম 'প্রেয়সী।'

দোকানের বাইরে-ভিতরে আলোয় ঝলমল করছে হরেক নক্সার শাড়ি, ব্লাউজ, স্কার্ফ। কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে ডোরিন বেনারসী, মুর্শিদাবাদী, সিল্কন, কঞ্জিভারাম, বাঙ্গালোর, চান্দেরী,ড্যাক্রন শাড়ি দেখছে নির্বাক বিস্ময়ে। তিন-তিনটে লোক ওকে নিয়ে ব্যস্ত, মেমসাহেব খদ্দের পেয়ে ওদের উৎসাহের অন্ত নেই! একটা আসমানী রঙের বুটিদার জরিপাড় শাড়ির আঁচলায় বারেবারেই হাত বুলিয়ে দেখছিল ডোরিন। পছন্দ হয়েছে বুঝে একজন বলল, "লাভলী থিং কর লাভলী ম্যাডাম, প্রাইস চীপ, রিডাকসন প্রাইস, উই ভেরি অনেস্ট ম্যাডাম, নো টেলিং লাই।"

শাড়িটার টিকিটে লেখা দেখলাম ২৭৫৲ কেটে ২১০৲ রয়েছে। লোকটিকে ইশারায় জানিয়ে দিলাম প্যাক করে ফেলুক।

গাড়ির কাছে ফিরে ডোরিনকে বললাম, "চমৎকার সার্টের সিল্ক দেখলাম একটা জানলায়, কিনলে মন্দ হয় না, তুমি একটু দাঁড়াও এখানে।"

সার্টের আমার মোটেই দরকার নেই, কিন্তু এই ছুতোয় শাড়িটা নিয়ে এলাম। খুবই তো পছন্দ হয়েছে ওর? কিনবার সাধ্য নেই, আহা বেচারী! ওর একটা শখ যদি মেটাতে পারি তবে মন্দ কি? এ-বয়সে মেয়েদের কতই তো শখ থাকে? ওর তো কিছুই জোটে না।

দিনের আলো অনেকটা থাকতেই ফিরে এলাম। ডোরিনকে বললাম, "এস

আমার ঘরে একটু বসবে। একখানা বই কিনেছি, খুব ভালো লেগেছে আমার, তোমাকে পড়তে দেব।"

যোশেফ এসে পাখা খুলে দিয়ে চা দেবে কিনা জিগগেস করলে বললাম, চা খেয়েছি। ডোরিন বলল, "দেখব কিরকম সার্টের কাপড় কিনলে?"

"দুটো হাত আছে তোমার, খুলে দেখ, একটিতে তো আমার দন্তাঘাত এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে।"

কার্ডবোর্ডের বাক্সটার বাঁধন খুলতে-খুলতে ও হেসে বলল, "যোশেফের বল হয়েছে তোমাকে এরই মধ্যে? কিন্তু এ কি কাণ্ড? সার্টের কাপড় তো নয়? এ যে সেই শাড়িটা? ভুল করেছে ওরা, এতখানি পথ আবার তোমায় যেতে হবে বদলে আনতে।"

"ভুল করেনি, ডোরিন। সার্টের আমার দরকার নেই।"

ও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কি বলছি। বলল, "সার্টের দরকার নেই তবে শাড়ি কেন?"

"ডোরিন-নামে একটি মেয়ে আছে, সে স্কার্ট বানাবে এটা দিয়ে।"

"ঠাট্টা রাখ কাঞ্চন, এর অনেক দাম, কি করে দেব? যাও যাও এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে এস। তুমি কি আমার অবস্থা জানো না? বক সাজবে ময়ূরের পেখমে?"

"কেন ডোরিন আমি কি তোমাকে কোনো উপহার দিতে পারি না?"

"এত দামী-দামী উপহার দিতে যাবে কেন? কিসের জন্যে?"

"আমার ভালো লাগবে, শুধু সেইজন্যে! ইচ্ছে হয় পুড়িয়ে ফেল, নিজের ঘরে গিয়ে।"

ডোরিন আমার হাত ধরল। ছল-ছল চোখে বলল, "এত ভালো উপহার কেউ কখনো আমাকে দেয়নি, কাঞ্চন। স্কার্ট বানাব না, শাড়িই পরব।"

"শাড়ি কিভাবে পরতে হয় জানো?"

"জানি। দিল্লিতে একটি বাঙালী মেয়ের কাছে শিখেছিলাম। একটু বস, দেখবে সত্যিই জানি কিনা।"

বসে-বসে দুটো সিগারেট ধ্বংস করলাম। ডোরিন এখনো তার ঘরে। অনভ্যস্ত হাতে শাড়ি পরিধান ক্যাসাদসঙ্কুল বুঝতে পারি। হয়তো ওর কোমরের কাছটায় ভাঁজটা ফসকস করে খুলে পড়ছে, আঁচলটা নয় বড় নয় ছোট হয়ে যাচ্ছে, নয়তো

একদিকটায় পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না। আমিও হয়তো ধুতি পরতে গেলে কাছা-কোঁচা নিয়ে এরকম নাস্তানাবুদ হব!

ডোরিন ফিরে এল। আসমানী রঙের শাড়িতে পল্লবিত দেহবল্লরী। যৌবন-জলধিতরঙ্গে লীলায়িত স্বর্ণপ্রতিমা। এ তো মানবী নয়, কল্পলোকের স্বপ্নচারিণী, যেন সমুদ্রবক্ষ ভেদ করে সদ্যোত্থিতা গ্রীকদেবী ভিনাস! চোখ ফেরানো যায় না।

"কেমন দেখাচ্ছে কাঞ্চন?"

"বলতে পারি না।"

"মানিয়েছে?"

"জানি না।"

"মানায়নি?"

"তাও জানি না।"

"শাড়ি পরে আমার খুব ভালো লাগছে, অনেকদিনের শখ ছিল।"

"হয়তো ছিল।"

"হয়েছে কি তোমার কাঞ্চন? হাবার মতো তাকিয়ে আছ যে?"

হঠাৎ ডোরিন নিচু হয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে আমার হুঁস হল। বললাম, "এ কি করছ ডোরিন?"

"মুখে তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার চাইতে এরকমটিই আমার ভালো লাগল। ঐ বাঙালী মেয়েটিকে দেখেছিলাম এরকম করতে। তুমিও তো বাঙালী!"

ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, "ডোরিন, প্রণাম নিলে আশীর্বাদ করতে হয়। কি আশীর্বাদ করব?"

"যা তোমার খুশি।"

"আশীর্বাদ করছি আর কোনো দুঃখু তুমি যেন না পাও।"

সাহস করে সেদিন ডোরিন-এর ঘরে গিয়ে ভালোই করেছিলাম। যে-কোনো দুজনের মাঝখানে একটা থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে, একজনের এগিয়ে যেতে হয়। অভিমান, সঙ্কোচ বা হামবড়াই থাকলে সে আবহাওয়া পরিষ্কার হয় না, ভুল বেড়েই চলে। সেইদিন থেকে ডোরিন আমার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মিশছে।

প্রায়ই ওকে নিয়ে যাই বাইরে। কলকাতার আশেপাশে যতগুলো দেখবার মতো যায়গা আছে ওকে দেখিয়ে এনেছি। একদিন দুর্গাপুর পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

বেলুড়ের মন্দির ওর খুব ভালো লেগেছে, মাঝে-মাঝে ওখানে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে থাকি। গাড়িতে আমার পাশে বসে ও গুনগুন করে গান গায়। সে গান নয়, সুধাবর্ষণ।

মন ভালো থাকলে কাজকর্মেও উৎসাহ বেড়ে যায়। হারীণদা একদিন বললেন, "কি আশ্চর্য কাঞ্চন, তুমি এত বেশি খাটতে পারছ যে আজকাল? বেশ, বেশ, এটাই তো চাই। একদিন আমার এই চেয়ারেই তো তুমি বসবে ডিপার্টমেণ্টের চার্জে, এখন থেকেই তৈরি হও।"

বাড়িওয়ালা মল্লিকমশাই সেদিন এসে হাজির। বললেন, "শুনেছিলাম তুমি চাকরি পেয়েছ। এখন তুমি গাড়িও কিনেছ জানলাম, নিশ্চয়ই বেশ ভালো চাকরি। হেঁ-হেঁ বাবা, বেঁচে থাক। তোমার বাবা দেখে গেলেন না, কিন্তু আমি তো আছি? তোমার শ্রীবৃদ্ধিতে আমার মতো ভালো লাগবে আর কার?"

"নিশ্চয়ই কাকাবাবু।"

"তোমাকে বাবা আমি তো নিজের ছেলের মতোই দেখি, হেঁ-হেঁ।"

"নিশ্চয়ই, কাকাবাবু, সে কথা আর বলতে?"

"তা এতদিন কলকাতায় আছ, আমার বাড়িতে কখনো যাওনি।"

"এটাও তো আপনারই বাড়ি, আপনার বাড়িতেই তো আছি।"

"না-না এটা ভাড়াটে বাড়ি, চল না একদিন আমার উল্টোডিঙির বাড়িতে। তোমার কাকীমা তোমাকে দেখতে চান। বড্ড স্নেহ করেন তিনি তোমাকে, আমার কাছে সব শুনে সেদিন বললেন—আহা, একা-একা ছেলেটির খুবই কষ্ট হচ্ছে বোধহয়, ইচ্ছে হয় এবাড়িতে এনে রাখি। দেখাশোনা করবার কেই বা আছে?"

আমার প্রতি অজ্ঞাত এক মহিলার সহসা এই স্নেহের উচ্ছ্বাসে আশ্চর্য হলাম। মল্লিকমশাই গভীর জলের মাছ, আজ চার বছর পরে হঠাৎ এত আত্মীয়তা দেখাচ্ছেন কেন ভেবে পাচ্ছি না।

"চল না বাবা, আসছে শনিবার বিকেলে, একেবারে রাতের খাওয়া খেয়ে আসবে?"

"ব্যস্ত হচ্ছেন কেন কাকাবাবু? একদিন এমনিই যাওয়া যাবে।"

"শনিবারে যদি না পারো তবে রবিবার দুপুরে?"



নাছোড়বান্দা ভদ্রলোককে ঠেকানো গেল না। রবিবার দুপুরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেই হল।

"ঠিক দুপুরেই হাজির হয়ো না, একটু সকাল করে যেও। আচ্ছা, তবে আমি এখন চলি।"

ভাবতে বসে গেলাম ওঁর আসল মতলবটা কি? এক নম্বর, চাকরি করছি বলে ভাড়া বাড়াতে চান? দু নম্বর, ব্যবসায়ে ওঁর টাকার দরকার হয়েছে বলে কি আত্মীয়তার প্যাঁচ কষে কিছু কর্জ নিতে চান? তৃতীয় নম্বর, ওঁর কি কোনো ছেলে আছে যার জন্যে চাকরির বাজারে আমাকে কাজে লাগাতে চান? যাই হোক না কেন কিছু একটা গরজ আছে সেটা সুস্পষ্ট।

কলকাতার কোনো মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি আমি ইতিপূর্বে যাইনি। তাদের হালচাল ও ঘরসংসারের সম্বন্ধে আমার পরিচয় একেবারেই হয়নি। তাই একটু ভয়ও হচ্ছে। যে ছেলে ভালো করে পড়াশুনা না করে পরীক্ষার হলে দুরু-দুরু বক্ষে হাজির হয় আমার অবস্থা হবে সেরকম।

উল্টোডিঙি পাড়াটা যে খুব ভব্যসভ্য ভাবে গড়ে ওঠেনি তা ওখানকার অলি-গলি, খাটাল, আড়ৎ আর মিলের গলাগলি ভাবটি দেখলেই অনুমান করা যায়। পাড়ার অধিকাংশ লোকের আর্থিক অবস্থা যে খুব স্বচ্ছল নয় তাও চোখে পড়ে। মল্লিকমশায়ের বাড়ি খুঁজে বার করতে বেশ বেগ পেতে হল।

'মল্লিকাবাস' নামটি সামনের দেয়ালে লেখা দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। যাক, এতক্ষণ পরে অকূলে কূল পাওয়া গেছে। রাস্তার সঙ্গে পাল্লা রেখে বরাবর চলে গেছে একটি খোলা নর্দমা বিবিধ মারাত্মক বীজাণুর উর্বর বিহারভূমি,মাছি-মশকের স্বর্গরাজ্য।

সামনের ঘরে ফরাশের ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ভদ্রলোক বসেছিলেন। একগাল হেসে বসতে বললেন। তারপর হাঁক ছাড়লেন, "পটলী, পটলী!"

নামটির মালিক বোধহয় দরজার পেছনেই অপেক্ষা করছিল, যেমন থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবার আগে অভিনেতা অভিনেত্রীরা উইঙসের পেছনে অপেক্ষমান থাকে। ঘরে যে প্রবেশ করল সে সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে। দীর্ঘতার অভাব চওড়ায় পুষিয়ে দিয়েছে, টকটকে লাল শাড়ি ব্লাউজ, সারা-গায়ে গয়না, মুখের পাউডারের প্রলেপ জায়গায়-জায়গায় ঘামে মুছে গিয়ে আসল রঙ বেরিয়ে পড়েছে।

মল্লিকমশাই বললেন, "কাঞ্চনকে প্রণাম কর। লজ্জা কি, আমাদের আপনজন বই তো নয়।"

বিব্রত হয়ে বাধা দিলাম, "না, না, থাক, থাক।"

মেয়েটি বোধহয় শুনেছিল আমি বড় ব্যারিস্টার সাহেবের ছেলে, সাহেবীধরনে মানুষ হয়েছি, সাহেবী কায়দায় থাকি, সাহেবী অফিসে চাকরি করি। পায়ের ধুলো নিয়ে পিতার আদেশ পালন করে তবে ছাড়ল, সেই সঙ্গে সম্ভাষণ জানাল, "ওয়েলকাম।" স্কুলে বোধহয় লাল শালুর ওপর শাদা অক্ষরে ঐ শব্দটি তৈরিই থাকে, পুরস্কার বিতরণ বা এটা-ওটা অনুষ্ঠানে ফটকে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। ও হয়তো ভেবে রেখেছিল এ সুযোগটা ছাড়বার মতো নয়!

হাসব না কাঁদব? মল্লিকমশায়ের মুখে বিজয়গর্বের ঝিলিক! বললেন, "ঐ একটিই মেয়ে আমার। বেশ ইংরেজী শিখেছে, আসছে বছর স্কুল ফাইনাল দেবে।"

ভদ্রতার খাতিরে বললাম, "বেশ চালাকচতুর মেয়ে।"

বাড়ির পেছনে হাম্বা-হাম্বা ডাক শুনে বুঝলাম এ সংসারটিতে খাঁটি দুধ-ঘিয়ের অভাব নেই, তাই বাপ ও বেটির দেহে চর্বির প্রলেপ এত পুরু।

মল্লিকমশাই আবার হুকুম করলেন, "তোর মাকে বল গিয়ে ওপরে যেতে, কাঞ্চন-বাবাজীকে নিয়ে আমিও আসছি।"

ঘর থেকে বেরিয়েই এক উঠোন। চৌবাচ্চা, বাসনমাজার কল, এককোণে সদ্য-খণ্ডিত মাংসের হাড় ও মাছের আঁস, মাছি ভনভন করছে। কলের কাছে একগাদা বাসি বাসন মাজছে ঝি।

মল্লিকগিন্নীকে দেখে খটকা লাগল। স্বামী-স্ত্রীর বয়েসের মধ্যে কুড়ি-বাইশ বছরের ব্যবধান সুনিশ্চয়। দ্বিতীয় পক্ষ? ব্রাহ্মণসন্তানের প্রণাম গ্রহণ করতে গন্ধ-বণিকজায়া কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে ঠোঁটে হাত ঠেকিয়ে 'চুঃ'-ধ্বনি করলেন। বুঝলাম ওটা স্নেহের জনকে আদর-চুম্বন জানানোর একরকম সেকেলে মেয়েলী প্রথা। বললেন, "সুখে থাক বাবা, সুখে থাক। একশো বছর পরমায়ু হোক।"

একশো বছর বেঁচে থাকবার অভিপ্রায় আমার নেই, কোনোদিন হবেও কিনা জানি না। বহুবিধ সমস্যাকণ্টকিত আজকালকার দিনে ওটা যেন অভিশাপ, আশীর্বাদ নয়।

খুব মজবুত ধরনের আসবাব দেখছি এ-বাড়িতে, সাবেকী ধরনের। আগেকার কর্তারা যা-সব তৈরি করতেন তা তিনপুরুষ কেটে যাবে হিসেব করে। কালের পরিবর্তন, রুচির পরিবর্তন সে হিসেবে ঠাঁই পেত না। এ বাড়ির সর্বত্রই সাবেকী আমলের ছাপ।

এ ঘরটা বোধহয় মল্লিকমশায়ের শোবার ঘর। মোটা-মোটা পায়াওলা বৃহৎ খাট, খাটের মাথার দিকটি বেশ উঁচু, ফুল লতা পাতার মাঝখানে ময়ূর-ময়ূরী খোদাই করা। তিনটে বড় আলমারি, পাল্লা অর্ধেক কাঁচের অর্ধেক কাঠের। দেয়ালময় ছবি, শিবগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সিদ্ধিদাতা গণেশের সঙ্গে শোভা পাচ্ছেন এক দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক এবং জপমাল হস্তে একটি বৃদ্ধা, সম্ভবত শ্যাম মল্লিকের স্বর্গত জনকজননী।

ঘরের মেঝেয় একটি গালচের ওপর একটি হারমোনিয়াম। মল্লিকমশাই ডাকলেন, "ও পটলী কোথায় গেলি ?"

পটলী বোধহয় ডাকটির জন্যে তৈরিই ছিল, আসতে বিন্দুমাত্র দেরি হল না। এসে হারমোনিয়ামের সামনে বসে পড়ল। পটলীর মা মেয়ের পিঠে একটা খোঁচা দিয়ে ফিস-ফিস করে আদেশ করলেন, "বল না তোর ভালো নামটা ? তারপর একটা গান শুনিয়ে দে কাঞ্চনকে।" এটাও বোধহয় মেয়েটি রিহার্সেল দিয়ে রেখেছিল, পট করে বলে ফেলল, "মাই নেম ইজ নয়নতারা মল্লিক।"

সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হল :

"ও মা কালী শ্মশানবাসিনী,
করালবদনী ওগো মুণ্ডমালিনী।"

না আছে গলা, না আছে সুর, তাল বানচাল। নিজে গান গাইতে না জানলেও সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারি ভালো না মন্দ। উপরন্তু, এসব শ্মশান-মশান ছাড়া কি অন্য কোনো গান নেই বাংলা ভাষায় ? গান সাঙ্গ হলে যেন বাঁচলাম। একটা কিছু বলা উচিত, তাই বললাম, "বেশ গান গাও তো তুমি !"

মা ও মেয়ে উঠে গেলে মল্লিকমশাই বলে চললেন ওঁর ব্যবসার কথা, পূর্বপুরুষদের কথা। আমি মাঝে-মাঝে হুঁ-হা করছিলাম। একবার চা এল, একবার লেমনেড এল, একবার লেবুর সরবত এল। পটলীই নিয়ে আসছিল। বারোটা

বাজল, একটা বাজল, দুটো, আড়াইটে। পেটের আগুন জলে-জলে প্রায় নিভু-নিভু, তবুও খাবার ডাক আসে না।

পৌনে-তিনটের সময় আবার পটলীর আবির্ভাব, এবার সুখবর দিয়ে বলল, "ঠাঁইপিঁড়ি দেওয়া হয়েছে।" ঠাঁইপিঁড়ি কথাটা জানা ছিল না, তবে আন্দাজে বুঝলাম এবার সত্যি-সত্যিই খেতে দেওয়া হবে।

এবার মল্লিকমশাই আমাকে নিয়ে গেলেন আরো একটি উঠোন পেরিয়ে একটা হলঘরে। এখানে বোধহয় কোনোকালে বাইজীর নাচ হত, কর্তা ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে বেশ আমেজে থাকতেন। মেঝেটি চৌখুপী নক্সা-করা সাদা-কালো পাথরের। ছাদে এখনো ঝুলছে কাঁচের ঝাঁড়। কিন্তু মোমবাতিকে ঠোক্কর মেরে তাড়িয়ে এখন জেঁকে বসেছে শহরে বিজলীবাতি, কাজেই ওটা কর্মজীবনের শেষে পেনসন ভোগ করছে।

প্রকাণ্ড দুই কাঠের পিঁড়ি। প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় ভাত, সামনে সারি-সারি প্রায় আট-দশটা কাঁসার বাটিতে ভোজ্যবস্তু। আমার চক্ষুস্থির! একে তো মেঝেয় পা ভাঁজ করে বসে খাওয়া আমার অভ্যেস নেই, তার ওপর এ যে হাতির খোরাক?

মল্লিকমশাই স্বচ্ছন্দে বসে পড়লেন, আমার একটু সময় লাগল।

মল্লিকমশায়ের স্ত্রী রুপোর বাটি থেকে রুপোর চামচে দিয়ে ঘি ঢেলে দিলেন। চমৎকার গন্ধ। উড়ে ঠাকুর নিয়ে এল পাথরের প্লেটে চার রকম ভাজা—গলদা চিংড়ির মাথা, বেগুনী, পটলের দোলমা, আলুভাজা।

"এত তো খেতে পারব না, কাকীমা। একটা চামচ পেলে যতটা দরকার তুলে নিতাম, নষ্ট করে লাভ কি?"

"সে কি বলছ বাবা? উনি যদি পারেন এ বয়েসে, তুমি পারবে না? যা পড়ে থাকবে ঝি বাড়ি নিয়ে যাবে, ফেলা যাবে না। নাও সুক্তোটা তুলে নাও।"

সুক্তো জিনিসটা কি জানি না, ইতস্তত করছিলাম, মল্লিকমশাই হেসে উঠে বললেন, "ও সাহেবমানুষ, বোধহয় সুক্তো কখনো দেখেইনি, তুমি দেখিয়ে দাও।" মল্লিকজায়া এবার দেখিয়ে দিলেন, প্রথম বাটিটা। বুঝে নিলাম বাঁ দিক থেকে ডানদিকে পর-পর চলে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সুক্তো ভালো লাগলো না। সুক্তোর পরে যে বাটি থেকেই নিচ্ছি মনে হচ্ছে নুন দিয়ে রান্না নয়, চিনি দিয়ে। তরলাংশ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে মাছ মাংস তুলে নিলাম।

ন-নম্বর বাটিতে সরষে দিয়ে আনারসের চাটনী, জিভের আড়ষ্ট ভাবটা কিছু কেটে গেল।

পটলী কখন যে উঠে গেছে খেয়াল করিনি। এবার নিয়ে এল ছানার পায়েস ও রাবড়ী। হায় হায়, আরো মিষ্টি, দই হলে মন্দ হত না।

আমাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে পটলীর মা বলে উঠলেন, "ও কি বাবা? ছানার পায়েসটুকু না খেলে তো চলবে না? পটলী কত কষ্ট করে তোমার জন্যে বানিয়েছে, না খেলে মনে বড় কষ্ট পাবে।" একটু মুখে দিলাম। বাবারে, কি ভীষণ মিষ্টি!

খাওয়াদাওয়ার পরে আর এক ফ্যাসাদ। মল্লিকমশাই বললেন, "সে কি বাবা, তুমি এখুনি যাবে কি? পটলী যে তোমার সঙ্গে গাড়ি করে আজ সিনেমায় যেতে চায়। বুড়োমানুষ আমি, ওটি তো আমার দ্বারা হয় না।"

ওদিকে ডোরিনকে বলে এসেছি 'সাউথ প্যাসিফিক' দেখতে যাব, ফিল্মটি নাকি খুব ভলো হয়েছে। টিকিটও কেনা হয়েছে ছ-টার শোর জন্যে। পাঁচটা প্রায় বাজে!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে উনি বললেন, "তোমার লজ্জা কি বাবা? সামনের বছর তো ও কলেজে ঢুকবে, ট্রামেবাসে যাতায়াত করবে, দশজনের সঙ্গে মিশতে হবে। তুমি তো আমার আপনজন? ওর জন্যে আমি কখনো পুরুষমাস্টার রাখিনি, গানও শিখিয়েছে ওর মা নিজে, তবে তোমার কথা আলাদা।"

প্রাচীনপন্থী এই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে একা ওকে ছেড়ে দিতে চান? হঠাৎ এমন আপন-আপন ভাব কেন? বললাম, "না কাকাবাবু, আজকে মাপ করবেন, আমার এক জায়গায় যেতে হবে আগেই কথা দিয়েছি। আর একদিন হবে'খন।"

মিথ্যে বলা হল না। ডোরিনকে তো কথাই দিয়েছি, এবং যেতে হবে সেটাও ঠিক।

আসবার আগে পটলী, ওরফে নয়নতারা, আবার এসে আমাকে ঢিপ করে প্রণাম করল।

এতক্ষণ একটি অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিলাম। বাড়ি এসে যেন বাঁচলাম।

'সাউথ প্যাসিফিক' ফিল্মটি চমৎকার, বিশেষত প্রথম দিকটায়। আমেরিকানরা

সব ক্ষেত্রেই সবার ওপরে টেক্কা দিয়েছে। নতুন ধরনের ক্যামেরায় তোলা এই ছবি মনে হয় না সিনেমার পর্দায় কলকাতায় বসে দেখছি। সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল, বাগান, লোকজন যেন বাস্তবরূপ নিয়েছে, মনে হয় সশরীরে চলে গেছি ওখানে। গানগুলোয় দোলা লাগছে মনে। কিন্তু এর পরে যখন দু-জোড়া ব্যাকুল হৃদয়ের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান, জাতের ব্যবধান দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিল তখন ছন্দ গেল কেটে। ডোরিন-এর নরম হাতটি আমার হাতের মধ্যে কেঁপে-কেঁপে উঠতে খেয়াল হল কখন না-জানি ওর হাত আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।

কানে-কানে বললাম, "ভুলে যাচ্ছ তুমি যে এটা একটা গল্প বই নয়। সত্যিকার জীবনের ঘটনা নয়। এরকম একটা প্যাঁচ না থাকলে গল্প জমবে কেন? লোকে পয়সা দিয়ে ফিল্ম দেখতে আসে। দুজনের ভাব হল নির্ঝঞ্ঝাটে বিয়ে হয়ে গেল, সে তো নিতান্ত জোলো পানসে ব্যাপার।"

সিনেমার শেষে গেলাম এক ছোটো রেস্টরাণ্টে। ডোরিন কিছুই খাচ্ছে না দেখে বললাম, "খেতে পারছ না কেন ডোরিন? তোমার শরীরে আইরিশ রক্ত, তাই তুমি এত ভাবপ্রবণ।"

"কিন্তু সত্যিকার জীবনেও তো সামাজিক বৈষম্য, আর্থিক বৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, ধর্ম বৈষম্য সুখের স্বপ্ন ভেঙে দেয়?"

ডোরিন সেই আসমানী রঙের শাড়িটা পরে এসেছে। ছলছল চোখে শাড়িটায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললে, "এটিকে ভালোবেসে ফেলেছি। মানুষকে ভালোবাসলে দুঃখু পেতে হয়, শাড়িকে ভালোবাসলে তো আর দুঃখু পেতে হয় না।"

"তুমি শুধু ভাবপ্রবণই নয়, হয়তো একটু বোকাও।"

"তুমিই বা কি কম? প্রমাণ এই শাড়ি। হঠাৎ এমন একটা উপহার আমাকে দিয়ে বসলে!"

সকালবেলা যোশেফ এসে হাউমাউ করে কেঁদে পড়ল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে যা বলল তা একটা বিয়োগান্ত কাহিনী। ও যে বস্তিতে থাকে সেখানে ওর পাশের ঘরে থাকে লতিফুদ্দীন মিস্ত্রী। যোশেফের ভাষায় লতিফুদ্দীন মিস্ত্রী প্রাইভেট প্রাকটিস করে, পরের চাকরি করে না। অর্থাৎ দিনমজুরি খাটে না। কাছেই ওর ছোট্ট একটা

কারখানা আছে আর এক বস্তিতে, সেখানে জর্দা, নস্যি, গুঁড়োমসলা আর দাদের মলমের জন্যে টিনের কৌটো বানায়, খদ্দেররা নগদ পয়সায় কিনে নিয়ে যায়। যোশেক ও তার স্ত্রী মরিয়ম লতিফকে চাচা বলে ডাকে, লতিফ সেই সুবাদে যোশেকের মাকে ঢাকেশ্বরী বিবি বলে ঠাট্টা-তামাসা করে, কারণ মা নাকি ঢাকের মতোই মোটা। মায়ের সঙ্গে লতিফের এত দহরম-মহরম যোশেকের ভালো লাগত না। গতকাল রাতে ফিরে গিয়ে যোশেক শোনে মরিয়মকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আজ ভোরবেলায় জানতে পেরেছে সে লতিফের কারখানাঘরে তার সঙ্গে বসবাস করছে। জিগগেস করলাম, "ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?"

"হয়েছে। অনেক কান্নাকাটি করলাম, কিন্তু মরিয়ম আমার কাছে আর আসতে চায় না, বলে লতিফের অনেক পয়সা, খুব সুখে রাখবে, সোনার গয়না দেবে, রোজ সিনেমা দেখাবে।"

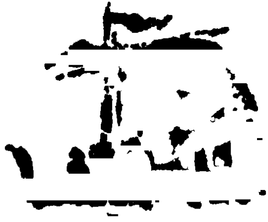
"তোমার মা কি বলেন?"

"বলার আর কি মুখ আছে? খাল কেটে কুমির তো উনিই এনেছেন?" দুঃখও বোধ হল, হাসিও পেল। লতিফ পাকা ঘুঘু, প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মালমসলার সঙ্গে একটি তরুণীকেও যোগাড় করে নিল। তাক ছিল বৌটির ওপর, ভাব দেখাল শাশুড়ীর সঙ্গে। গোবেচারা যোশেক ধূর্ত লতিফের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। ও গলিটায় লতিফের জাতভাইরা সংখ্যায় বেশি, সেই মুসলিম ব্রাদারহুডের গায়ে খোঁচা দিতে গেলে যোশেকের খৃষ্টান জাতভাইরাই ফাটন্ত মাথা আর ফুটন্ত পেট নিয়ে হটে আসতে বাধ্য হবে। হয়তো সমস্ত এণ্টালি জুড়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে। সমস্যাটি গুরুতর।

"থানায় ডাইরি করেছ?"

"গিয়েছিলাম কিন্তু দারোগাবাবু বললেন তাঁর সময় নেই। গালাগালি দিয়ে ভাগিয়ে দিলেন।"

যোগাযোগ, যোগবিয়োগ, ভাগপূরণ নিয়েই এ সংসার। লতিফের সঙ্গে মরিয়মের যোগাযোগ, যোশেকের বর্তমান অবস্থা স্ত্রীবিয়োগেরই মতো, এই শূন্যভাগ সে পূরণ করতে পারে কেবল আর একটা বিয়ে করে। বললাম আমিও ভেবে দেখছি কি করা যায়, ও নিজেও ভেবে দেখুক। এর বেশি বলার কিছু ছিল না। ডোরিনের সঙ্গে আমার, এই যোগাযোগেরও পরিণতি কি তা কে জানে?



২৩

ডোরিন বলছে ছবির পর্দায় যা আমরা দেখি তা বাস্তবজীবনেরই প্রতিচ্ছায়া। সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থিক প্রভৃতি বৈষম্য যে বাধা ও ব্যবধানের সৃষ্টি করে তাও খুব সত্যি। কিন্তু একথাগুলি ওর মনে এত দাগ কেটেছে কেন? না, ওকে ঐ ছবিটা দেখতে নিয়ে যাওয়া খুব ভালো হয়নি। তবে আমি আগে কি করে জানব?

মল্লিকমশাইরা এবং আমি তো এক সমাজেরই লোক, কিন্তু শিক্ষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য জীবনযাত্রার মান-এ কি অনেক পার্থক্য নেই? ভিন্ন সমাজ হলেও ডোরিনের সঙ্গে মিশতে পারি, আর্মস্ট্রংদের সঙ্গে মিশতে পারি, কিন্তু সেদিন মল্লিকমশায়ের বাড়িতে ঘোর অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

এখন নিজের গাড়ি থাকায় মুন্নাদির বাড়ি, নকরদার স্টুডিও, ঘোষাল সাহেবের ফ্ল্যাটের দূরত্ব অনেক কমে গিয়েছে। মুন্নাদির তন্দুরী চিকেন, শিককাবাব, দো-পিঁয়াজী, দিলখুশ-সরবত আমার জিভের ধার আরো শানিয়ে দিয়েছে। মিসেস ঘোষালের ল্যাবস্টুয়ার্ট, চিকেন-হলাণ্ডার, হাইল্যাণ্ডগ্লাসের ভক্ত হয়ে পড়েছি। তবে নকরদার স্টুডিওতে কেনা চা ও চানাচুরকেও অসম্মান করি না।

আমার মনে হয় হারীণদা তাঁর স্ত্রীকে ভুল বুঝেছেন। পরপুরুষের সঙ্গে মেমসাহেবরা ঁসংকোচে মেলামেশা করে। এটা ওদের সমাজের রীতি। হারীণদা মেমসাহেব বিয়ে করেছেন, অথচ ভারতীয় স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিদেশিনী স্ত্রীর ডক্টর মুখার্জীর সঙ্গে ঘনিষ্ট ব্যবহার সন্দেহ করছেন। মিসেস ঘোষালের বাচ্চাটির নাক তো হারীণদারই মতো?

বিকেল পাঁচটা। ক্রিং-ক্রিং টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটা হারীণদার টেবিলে, উনি ঘরে নেই, আমিই গিয়ে ধরলাম।

"মিস্টার সানিয়ালের সঙ্গে কথা বলতে পারি?" মেয়েলী গলা, ইংরেজী উচ্চারণ চমৎকার, বুঝলাম না কে।

"কথা বলছি, বলুন।"

এবার পরিষ্কার বাংলায় কানে এল, "নমস্কার, আমি মণিকা দিগলানী।"

"নমস্কার, কেমন আছেন?"

"অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা নেই।"

"তা বটে।"

"সেদিন কোঠারীদের বাড়ি গিয়েছিলেন শুনলাম?"

"হ্যাঁ।"

"তার আগে ভেঙ্কটদের ওখানে?"

"হ্যাঁ।"

"আর্মস্ট্রং আর ওয়ালেসদের ওখানেও?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের এখানে একদিন আসবেন না?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, যাব একদিন।"

"আজই আসুন না?"

"তাড়াতাড়ি কি? যাবই একদিন সময় পেলে, মিসেস দিগলানী।"

"আজ বিশেষ কোথাও যাবার আছে?"

"তেমন কিছু নয়, তবে..."

"তবে-টবে নয়, আজকেই অফিসফেরতা আসুন। একসঙ্গে তিনজনে চা খাওয়া যাবে। মিন্নুর জন্যে খাবার তৈরি করতে-করতে আপনার কথা মনে পড়ে গেল।"

"আমার সৌভাগ্য।"

"তবে তাই ঠিক রইল।"

সত্যিই আমার ত্রুটি হয়ে গেছে। আর সবার বাড়িই গিয়েছি, শুধু দিগলানী-রাই বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু মিসেস দিগলানীর নামে যা শুনেছি তাতে মনের দিক থেকে কোনো তাগিদ পাইনি। সেদিন আমার পার্টিতে যেরকম সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি নিজের চোখে দেখলাম ও ফ্লার্ট করা শুনলাম, তাতে আমার সাবধান হওয়াই উচিত।

নকরদা একদিন বলছিলেন—রথ কাকন, ছেলেবেলায় আমাদের মা, মাসী,

খুড়ি, পিসী, দিদি, বৌদিদের ভেতর যে কল্যাণময়ী মাতৃরূপটি দেখেছি আধুনিক নব্যসমাজে সে রূপটি আর চোখে পড়ে না। এখনকার নারীরা হতে চায় পুরুষের সখী, বান্ধবী। স্বামীরা হবে সহচর বা অনুচর, যাগাবে বিলাসের উপকরণ, খাটাবে না প্রভুত্ব। পরপুরুষ হবে সখা। সতীসাবিত্রীর দিন চলে গেছে, হয়তো এটা কালের হাওয়া, কিন্তু মাত্রা যদি ঠিক থাকে তবে দোষের কিছু নেই। কিন্তু জানিস তো আজকাল ভারতীয় নারীদের মধ্যেও পানদোষ ঢুকেছে এই পার্টির দৌলতে সমাজের উঁচু স্তরে! ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড ডেভিল গো টুগেদার।

দিগলানীদের ফ্ল্যাটে এসে কলিং বেল টিপলাম। উর্দিপরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে সেলাম দিল। আধময়লা পাজামা ও নীলসার্টপরা যোশেফের মূর্তি এর পাশে দাঁড়াতে পারে না। যোশেফের নেপালী জেনানা যেমন নোয়াখালিনিবাসী কলকাতা প্রবাসী লতিফুদ্দীনের সঙ্গে ভেগে গিয়ে ঘর পাল্টেছে, আমাকেও তেমনি নতুন একটি বেয়ারা যোগাড় করে ভালোপাড়ায় ঘর বাঁধতে হবে।

ড্রইংরুমটি সাজানোগোছানো। সোফাসেটি ছাড়া আর সব কিছুতেই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের, বিশেষ করে বাঙলাদেশের ছাপই বেশি। জয়পুর, আগ্রা, মোরাদাবাদ, মাইসোরের কয়েকটি শিল্পনিদর্শন; সারদা উকীল, অসিত হালদার, গগন ঠাকুরের আঁকা কয়েকটি ছবি; এককোণে শ্বেতপাথরের ছোট টেবিলের ওপর শ্বেতপাথরের বিবেকানন্দ, হাতে মশালের মতো একটি বাতি, যেন তমসাগ্রস্ত দেশবাসীকে পথপ্রদর্শন করছেন।

একপাশের দরজা খুলে মিসেস দিগলানীর আবির্ভাব হল। আবির্ভাব কথাটাই সাজে, কারণ শব্দটির ভেতরে একটা বিস্ময়ের ইঙ্গিত আছে। সেদিন পার্টিতে যার ভিতর দেখেছিলাম উদগ্রযৌবনের উদ্ধতপ্রকাশ, আজ তাকে দেখলাম শান্তশ্রী, কল্যাণীমূর্তিতে। ভ্রূযুগ চিত্রিত নয়, ওষ্ঠাধর রঞ্জিত নয়, বক্ষাবরণ হ্রস্ব ও স্বচ্ছ নয়। অতি সাধারণ বেশ, অলঙ্কারবর্জিত।

"বস, বস, কাঞ্চন। দেখ তো কি কাণ্ড মিস্তুর? এইমাত্র ফোনে বলল ফিরতে দেরি হবে, ক্লাবে কমিটি মিটিং আছে। আগে বললেই তো পারত?"

হঠাৎ 'কাঞ্চন' বলে ডাকা, 'তুমি' সম্বোধন, অবাক হলাম, বিরক্তও হলাম। 'সর্বনেশে জীব' বলেছিলেন হারীণদা। ঠিকই বলেছিলেন!

"তবে আজ চলে যাই, আর একদিন আসব মিসেস দিগলানী।"



"তোমাদের ওখানকার সবাই আমাকে মণিকা বলেই ডাকে। বিজু সেনগুপ্ত বাঙালী, আমাকে সেও 'তুমি' সম্বোধন করে। যাই, চা নিয়ে আসি।"

"আহা তুমি নিজে কেন মণিকা? বেয়ারাকে বল?"

"এটা পার্টি নয়, আমার বাড়ি, এদেশের মেয়েরা নিজের হাতে অতিথিকে খাওয়াতেই ভালোবাসে। মিন্টুর ওপর খুব রাগ হচ্ছে।"

বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে এল, মণিকার হাতে খাবারের ট্রে। উঠে গিয়ে ওর হাত থেকে ট্রেটা নিতে যাচ্ছিলাম, মণিকা কিছুতেই দিল না।

"সব আমার নিজের হাতের তৈরি, একেবারে দিশি খাবার, কেক, পেস্ট্রি, প্যাটি আশা করে থাকলে ঠকবে।"

"করেছ কি মণিকা? দেহটা আমার মাপে বড় হলেও পেটের মাপটা নিতান্তই সাধারণ, এ গুদোমে এত ধরবে না।"

"যতটুকু ধরে। মিন্টু একাই এসব সাবাড় করতে পারে।"

"তাই মোটা হয়ে যাচ্ছে।" ভুলে আবার মিসেস বলতে যাচ্ছিলাম, মণিকা থামিয়ে দিল।

"আমি পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছি, বামুনপূজারীর মেয়ে, মিসেস-ফিসেস আমার ভালো লাগে না। মিন্টুর পাল্লায় পড়ে মেমসাহেব হতে হল, গভর্ণেসের কাছে ইংরিজি শিখতে হল। পুতুলের মতো সেজেগুজে এখন পার্টি জমাতে পারি, রীতিমতো স্মার্ট করতে জানি। প্রগতির মুখে গতি খুব দ্রুতবেগে হয়েছে আমার। ক'চামচ চিনি দেব তোমার কাপে?"

"একচামচ কম হবে, দুচামচ বেশি হবে, দেড়চামচ। খাসা বাংলা শিখেছ তুমি।"

"বাঙলাদেশে থাকতে হলে বাংলাভাষা ভালো করে শিখতে হয়। অবাঙালী বিস্তর আছে কলকাতায়, তাদের বেশির ভাগই ভালো বাংলা শেখে না, ন্যাকামি ঢঙে ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলে।"

"পড়তে জানো?"

"শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর সব পড়া হয়ে গেছে। ও কি কাঞ্চন? মাছের কচুরি যে কখানা দিয়েছি সব খেতে হবে। চিংড়ির কাটলেট এখন পর্যন্ত ছুঁলে না?"

"আস্তে-আস্তে খেলে বেশি খাওয়া যাবে মণিকা দেবী, যা চমৎকার রেঁধেছ! কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, ক্রমে-ক্রমে উদরগহ্বরে প্রবেশলাভ করবে।"

মণিকা দিগলানী সত্যিই খুব সুন্দরী। সেদিন প্রসাদন-আধিক্যে মনে হয়েছিল ওর রূপের কিছুটা কৃত্রিম, আজ প্রসাধনবিহীন ওকে আরো শ্রীমণ্ডিতা দেখাচ্ছে। জিগগেস করলাম, "বলছিলে, তুমি পূজারীবামুনের মেয়ে, গ্রামে মানুষ হয়েছ, নামটি এত আধুনিক কেন?"

"বাবা নাম রেখেছিলেন রাজরাজেশ্বরী। ডাকতেন রাজু। কিন্তু বিয়ের সময় মিন্থু ধরে বসল ঐ সেকেলে নাম বদলে মণিকা রাখতে হবে।"

"মিন্থু তাহলে তোমাকে একেবারেই নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছে?"

"পতি পরম গুরু, জানো তো? যা বলবে, করতেই হবে আমার। যেরকমভাবে চালাবে, সেরকম চলতে হবে। হালুয়াটা আর একটু দেব?"

"দিতে পার। আর একখানা পাঁপড় খেতেও আপত্তি নেই। তবে ওখানেই ফুলস্টপ, পূর্ণচ্ছেদ।"

মণিকার মতো রূপধন্যা স্ত্রীরত্ন যার সে সত্যিই ভাগ্যবান পুরুষ। পুরুষদের প্রশংসমান দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে যে-স্ত্রী অন্য নারীদের ঈর্ষার কারণ হয় তার স্বামী ভাগ্যবান নয় তো কি? নিজস্ব রোলসরয়েস গাড়ির মতোই সে-স্ত্রী জাহির করবার মতো জিনিস। লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেই তো মালিকানার গর্ব। যদিও ডোরিনের ওপর আমার মালিকানার স্বত্ব নেই তবুও ও যখন আমার সঙ্গে কোথাও যায়, এবং সকলে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তখন আমারও বুক কি গর্বে ভরে ওঠে না?

"তোমার কটি ছেলেমেয়ে মণিকা, কাউকেই তো দেখছি না।"

"না থাকলে কি করে দেখবে? মিন্থু বলে কাচ্চাবাচ্চা হলে আমার শরীরের ফর্ম খারাপ হয়ে যাবে। গিন্নীবান্নি হতে দেবে না কোনোদিন, তন্বীই থাকতে হবে।"

কথাটা ও হাসতে-হাসতে বললেও সে-স্বরে মাতৃত্বের ক্ষুধিত হাহাকার ছিল। স্ত্রীলোক মাতৃত্ব চায়, তার দেহ মাতৃত্বের উপাদানে গঠিত। তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার কোনো স্বামীর আছে কি? 'ফর্ম' কথাটার মানে আন্দাজে বুঝে নিলাম।

"তোমাদের এইসব সাহেবী কোম্পানীগুলোর বড় চাকরিতে দোষ কি জানো কাঞ্চন? স্ত্রীরাও রেহাই পায় না, প্রায়ই পার্টি লেগে থাকে। মাকে সেজেগুজে

বেরিয়ে যেতে দেখলে, সারাসন্ধ্যে বাইরে আছে দেখলে, কচিকাচা ছেলেমেয়েরা মনে দুঃখু পায়, তার ফল ভালো হয় না। ওরা বাপ-মায়ের সঙ্গ চায়। বড় হলে ওরা বাপ-মায়ের মধ্যে খুঁজতে চায় একটা আদর্শ, সেখানেও আঘাত লাগে। দিশি কোম্পানী আর সরকারী অফিস এর চাইতে ঢের ভালো। ড্রইংরুম সাজিয়ে রাখতে হয় না, সোফা-সেটি পর্দার বাহার রাখতে হয় না, ককটেল ডিনার লাঞ্চের হাঙ্গামা করতে হয় না। বাবুর্চির দরকার হয় না, ধোপদোরস্ত বেয়ারা বয় রাখতে হয় না, খুশিমতো খাওয়া যায় রুটি, তরকারি, শাক, ঝোল। বাড়িতে খালি পায়ে হাঁটা যায়, ভাঁজভাঙা কাপড়চোপড় পরা যায়, মাটিতে পাটি পেতে শোয়া যায়।"

"এ অসুবিধেগুলো তো ওরা পুষিয়ে দেয় বেশি মাইনে দিয়ে, এটা-সেটা অনেক সুবিধে দিয়ে। এটা স্বীকার কর ?"

"তা বটে।"

"আচ্ছা মণিকা, অনেক মেয়েরাই তো আজকাল ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে থাকতে চায় না ? সিনেমায় যাওয়া, পার্টিতে সেজেগুজে যাওয়া, ক্লাবে স্বামীর সঙ্গে যাওয়া পছন্দই করে।"

"আমি করি না।"

"মিন্টু কখন ফিরবে ?"

"ঘরে তো মন টেঁকে না ওর। খেলা আছে, ক্লাব আছে, অফিস তো আছেই, এখন আর একটা বাতিক এসেছে ঘোড়ায় চড়া শেখা। সন্ধ্যেবেলা একা-একা বসে বই পড়ি আর মিনিট গুনি।"

"কিন্তু তোমার দিকটাও তার দেখা উচিত! এরকম নিঃসঙ্গতা কি কারু ভালো লাগে ? তোমার সময় কাটে কিসে ? পুরুষের সঙ্গী নারী, নারীর সঙ্গী পুরুষ, প্রাণী-জগতের সর্বত্র এটা চলে আসছে সৃষ্টির আদিমকাল থেকে। বই কথা বলে যায়, কিন্তু কথা শুনতে পায় না। বইয়ের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান চলে না, হয় ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক।"

"ছবিও আঁকি।"

"দেখতে পারি দু-একখানা ?"

মণিকা দিগলানী একগাদা ছবি নিয়ে এল। ও দেখাচ্ছে, আমি ঝুঁকে পড়ে

দেখছি। একবার মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। মণিকা বলল, "মাথা ঠোকাঠুকি হলে কি হয় জানো? শিং গজায়।"

"খাসা আঁকো তুমি। কোথায় শিখলে?"

"নিজে-নিজে।"

"তুমি একটি জিনিয়াস, মণিকা।"

"ধন্যবাদ।"

ছবিগুলো দেখা হয়ে গেলে গুছিয়ে ওর হাতে দিলাম। জিগগেস করলাম, "রোজই কিছুক্ষণ ছবি আঁকো?"

"প্রায় রোজই।"

"তবে মাঝে-মাঝে আসব তোমার ছবি দেখতে।"

"জন আর্মস্ট্রঙের মতো?"

"সেও আসে নাকি?"

"তবে ছবি দেখতে নয়, গালগল্প করতে। আমি ওকে খুব পছন্দ করি না। লোকটি বড্ড মেয়ে-ঘেঁষা। গত বছর একটু কড়া কথা শোনাতে বাধ্য হলাম। তারপর আর ঘনঘন আসে না। আজকাল প্রায় আসেই না বলা চলে, আমিও বেঁচে গেছি। মিনু বেজায় রেগে গিয়েছিল সেবার।"

ঘড়ি দেখলাম। বললাম, "আটটা বাজে, মণিকা, এখন তবে আসি।"

"বড্ড দেরি হয়ে গেছে তোমার, না? চল তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।"

আমার ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি হারীণদা বসে আছেন। গম্ভীর, বিষণ্ণভাবে বললেন, "এত রাত হল তোমার ফিরতে?"

"কিন্তু আপনি এখানে? কখনো তো আসেননি এর আগে?"

"খারাপ খবর আছে, মলি টেভারেস খুন হয়েছে।"

"খুন হয়েছে? বলেন কি?"

"যেতে হবে তার বাড়ি, চল আমার সঙ্গে। পুলিস ফোন করেছিল কার্ল্সনের কাছে। আমাকে ও তোমাকে মৃতদেহ সনাক্ত করতে হবে। ট্যাক্সিতে এসেছি, তোমার গাড়িতে যাব।"

"শেষে ওর লাস সনাক্ত করতে হবে আমাকে আর আপনাকে ?"

আজ সমস্তদিন মিস্ টেভারেস খুব খেটেছিল। তখন কল্পনাও করতে পারিনি ঐ নিরীহ মেয়েটির প্রাণ হারাতে হবে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

হারীণদা বললেন, "আমাদের সনাক্ত করার পরেই পুলিস মর্গে পাঠাবে লাস।"

'লাস' কথাটা কনে খচ করে বিঁধল। প্রাণশিখা দপ করে নিভে গেলেই শরীরটা হয়ে যায় লাস। কিন্তু প্রাণ নামক জিনিসটি দেহের কোথায় কিসের আড়ালে লুকিয়ে থাকে তা কেউ জানে না!

জিগগেস করলাম, "ঠিকানা জানেন ?"

গাড়ি চালাতে-চালাতে হারীণদা জবাব দিলেন, "কার্গুসনও জানত না, পুলিসের কাছে জেনে আমাকে বলেছে।"

একটা ঝরঝরে পুরনো বাড়ি। সামনে পুলিস দাঁড়িয়ে। আমাদের রুখতে এগিয়ে এসে বলল, "ভিতর যানেকো হুকুম নেহি।"

হারীণদা লালবাজারের নাম করতেই সেপাইটি যেন কেঁচো। বলল, "যাইয়ে সাব, দোতলামে।" লালবাজারের নাম শুনলে শহর কলকাতার পুলিসবেশী জাত-সাপদের কুলোপানা চক্রে যেন ধুলো পড়ে।

তালতলা থানার ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে বললেন, "ঘোষাল সাহেব নাকি ? লাস এই ঘরে। সান্যেল সাহেব আসেননি ?"

"তিনিই এই আমার সঙ্গে।"

আমি নমস্কার করলাম।

"পাশের বাড়ির এ দুটি ভদ্রলোককেও সাক্ষী আনা হয়েছে। বলুন এ মেম-সাহেবের নাম মলি টেভারেস কিনা এবং আপনাদের কাজ করত কিনা।"

হারীণদাই জবাব দিচ্ছিলেন, বললেন, "হ্যাঁ মিস্ মলি টেভারেস, স্টেনোটাই-পিস্টের কাজ করত আমাদের দুজনের। কাঞ্চন, তোমাকেও বলতে হবে।"

বীভৎস দৃশ্য। বুকে ছুরি বসানো। রক্ত শুকিয়ে আছে মুখে বুকে গায়ে। মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া এখনো লেগে রয়েছে, চোখ দুটো অর্ধেক খোলা। হারীণদার কথামতো বললাম, "হ্যাঁ, ইন্সপেক্টরবাবু—এ মিস্ টেভারেসই বটে।"

ইন্সপেক্টর বললেন,"মিস্টার দীনদয়াল, মিস্টার কোলসন, আপনারা আগে সই

করুন এই ফর্মে, পরে মিস্টার ঘোষাল আর মিস্টার সানিয়াল সই করবেন। মিস্টার ঘোষাল, মেমসাহেব কদ্দিন আগে আপনাদের অফিসে ঢুকেছিল?"

"প্রায় দেড় বছর।"

"এর প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে কিছু জানেন?"

"না।"

"মিস্টার সান্নেল?"

"ওর শীঘ্রই বিয়ে হবে শুনেছিলাম, ওই বলেছিল।"

"অফিসে কারুর সঙ্গে ওর শত্রুতা, মানে ঝগড়া ছিল?"

"বোধহয় না, ভারি মিষ্টিস্বভাব ছিল, ঝগড়াঝাঁটির পাত্র ও নয়।"

"বয়েস কত মিস্টার ঘোষাল? আপনি ওর বড়সাহেব, নিশ্চয়ই জানেন?"

"অফিসের রেকর্ডে আছে।"

"কাল দয়া করে আমাকে তালতলা থানায় ফোন করে জানাবেন? বলবেন ইন্সপেক্টর বটব্যালের সঙ্গে কথা কইতে চান।"

"নিশ্চয়ই জানাব।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হারীণদা বললেন, "আশ্চর্য এই জগৎটা কাঞ্চন, এমন মেয়েটাকে খুন করল কে? কেনই বা করল?"

মিকিমাউস রেস্টরাণ্টের ঘটনাটা চেপে যেতে হল, কি ফ্যাসাদে পড়ি কে জানে সেই ভয়ে।



২৪

পরের রবিবার ফার্গুসনের বিদায় সম্বর্ধনা। বেলা চারটের। আমরা সবাই চাঁদা দিয়েছিলাম, কেরানীবাবুদের হাতে ব্যবস্থাপনার ভার। বড়বাবু এসে আমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন, সাহেবদের সঙ্গে যেন মেমসাহেবরাও আসেন এই অনুরোধ।

আমি হেসে বললাম, "মিসেস সানিয়াল এখনো এসে হাজির হননি তাই আসতে পারবেন না।"

"কলকাতার বাইরে গেছেন বুঝি?"

"আমার জীবনেই তাঁর শুভাগমন এখনো ঘটেনি, অর্থাৎ বিয়ে করিনি।"

চোখ কপালে তুলে বুড়ো বিস্ময় প্রকাশ করল, "বলেন কি স্যর? আমার তো চোদ্দ বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল।"

"কত বয়েস আপনার এখন?"

"প্রায় সত্তর।"

"এই ছাপান্ন বছরে অনেক কিছু যে বদলে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না?"

"তা বটে, কিন্তু মাঝে-মাঝে ভুলে যাই। সুরেনের মা আজ প্রায় পঁচিশ বছর গত হয়েছেন, ঘরে বসে থেকেই বা সময় কাটবে কিসে, তাই এই চাকরিতে পড়ে আছি। সুরেন আমার ছেলে, সেও নেই। ফার্গুসন সাহেব কিছুতেই আমাকে অবসর নিতে দেননি, মহাপ্রাণ লোক। উনি চলে যাচ্ছেন, এবার আমারও যাবার সময় এসেছে।"

রবিবার পৌনে-চারটের অফিসে ঢুকে মনে হল এ কোথায় এসেছি? তিন-তলার হলটি আর চেনা যাচ্ছে না। দেওয়ালে ফুলের মালা, একপাশে লম্বা এক

টেবিল শাদা ধবধবে চাদরে মোড়া, তার ওপর বড়-বড় ফুলের তোড়া সাজানো। কেরানীবাবুদের ছোট-ছোট টেবিলগুলো জোড়া দিয়ে সার বেঁধে সাজানো। রঙিন কাগজের শিকল ও রবারের বেলুন ছাদ থেকে ঝুলছে।

মিস্ টেভারেস দিনকয়েক আগে হাসতে-হাসতে আমাকে বলছিল কাণ্ডসনের বিদায় সম্ভাষণে বাবুরা খুব ঘটা করবে কিন্তু ফেদার্স্টোনের বিদায় সম্ভাষণের সময় ওরা নাকি তার গলায় ছেঁড়াজুতোর মালা ঝুলিয়ে দেবে। জানি সেও পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছিল, কিন্তু আজকের এই বিদায় সভার আগেই পৃথিবী থেকে তাকে চিরতরে বিদায় নিতে হল, বেচারী!

একে-একে হারীণদা, ফেদার্ষ্টোন, ভেঙ্কট, ওয়ালেস, আর্মস্ট্রং সবাই এসে গেল। অবস্থাভেদে সপত্নীক অথবা একাকী। বড়বাবু ঘড়ির কাঁটা-মাফিক চলেন, তাঁর হুড়োতে বাবুরা সবাই সাড়ে-তিনটের মধ্যে হাজির হয়েছে। টাইপিস্ট মেম-সাহেবদের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল পৌনে-চারটে, তারাও হাজির। ওরা সবাই এসেছে, কেবল মিস্ টেভারেসই এল না। সে আর কোনো দিনই আসবে না। সামনের সারিতে মেমসাহেবদের মাঝে একটি চেয়ার শূন্য, সেখানে দেখা গেল, কালো ফিতেয় গাঁথা এক সাদাফুলের তোড়া। বড়বাবুর সময় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনাই শুধু প্রশংসনীয় নয়, সময়োচিত রুচিজ্ঞানও যথেষ্ট আছে বলতে হবে।

কাঁটায়-কাঁটায় চারটের সময় বড়বাবু এসে মাইকের কাছে দাঁড়িয়ে মিস্টার ফেদার্স্টোনকে এই বিদায় সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ জানালেন। ফটফুটে একটি ছোট মেয়ে এসে ফেদার্স্টোনের গলায় মালা দিল, তারপর মিস্টার আর মিসেস কাণ্ডসনের গলায়। প্রচুর করতালি বর্ষণ হল।

ফেদার্স্টোনের গলায় মালা দেওয়ার সময় কে যেন বলে উঠল, "শালা!" কিন্তু হাততালির শব্দে সে ক্ষীণ কণ্ঠ ঢাকা পড়ে গেল। আমাদের কর্তাব্যক্তিদের লাইনের একেবারে শেষের দিকে ছিলাম আমি, তাই সে উক্তিটি আমার কান এড়াতে পারল না।

বড়বাবুর ইংরেজী উচ্চারণ ও পাঠভঙ্গী যে নিরঙ্কুস নয় তা বলা নিষ্প্রোজন, তবে তাঁর আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিল বিদায়ভাষণে। ছাপানো ভাষণটির এক-এক কপি আমরাও পেলাম। কাণ্ডসনের কপিটি দেখলাম সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো। তিরিশ বছর এ বাবুটি কাজ করছেন কাণ্ডসনের অধীনে, মন খারাপ হবারই কথা

এই ছাড়াছাড়ির দিনে, শেষের দিকটায় হয়তো প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ অন্য রূপ ধারণ করেছিল।

ভাষণপাঠের পরের দৃশ্যটি বেশ অভিনব। একটি কিশোরী বালিকা উঠে এসে ফার্গুসনদম্পতিকে দীপারতি শুরু করতেই কে যেন ওদের মাথার উপরে বেলুনটি ফাটিয়ে দিল, ঝুরঝুর করে খইবৃষ্টি, সঙ্গে-সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। এরপরে ওদের কপালে মেয়েটি দিল চন্দনের ফোঁটা।

তখন বড়বাবু আবার এগিয়ে এসে ফার্গুসনের হাতে দিলেন গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি, ফার্গুসনপত্নীকে দিলেন লালপাড় গরদের শাড়ি ও হাতির দাঁতের বড় একটা কৌটো। কেরানীবাবুরা চেঁচিয়ে থ্রি চিয়ার্স দিচ্ছে, ফার্গুসনের দু-চোখ বেয়ে নেমেছে জলের ধারা।

হারীণদা, ওয়ালেস, ভেঙ্কট কিছু-না-কিছু বলল। হারীণদার ভাষণই হল সব-চেয়ে ভালো। এরপরে দাঁড়াল ফার্গুসন নিজে। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট্' থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে আরম্ভ করেছিল চমৎকার কিন্তু বেশি কিছু বলতে পারল না, গলা ধরে গেল। তিরিশ বছরের জীবনকে পেছনে ফেলে চলে যাবার বেদনা বড় কম নয়। হাতজোড় করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বুড়ো বসে পড়ল।

সভাপতি ফেদার্স্টোনের ভাষণ দীর্ঘ হলেও জমল না।

অতঃপর চা-পর্ব। দশ-বারোজন বেয়ারা লেগে গেল পরিবেশনে। চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া, কচুরি, কেক, সন্দেশ।

মণিকা দিগলানী আমার পাশেই বসেছিল। মিস্ টেভারেসের খালি চেয়ারটার দিকে ইশারা করে বলল, "কাঞ্চন, তোমার ঐ টাইপিস্ট মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী নও তো?"

"ঠাট্টা রাখ মণিকা, হ্যারি ফার্গুসনের জন্যে দু-এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলতে দাও আমাকে, ও-ই আমাকে চাকরি দিয়েছিল।"

"মেয়েটার জন্যে দু-এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলেছিল তো?"

"আমার অশ্রুজল এত সস্তা নয়।"

"হায়-হায়, তুমি হৃদয়হীন পাষাণ!"

"দয়া করে চা-টা খেতে দাও, মণিকা।"

"আমার ওখানে আবার কবে আসছ?"

"যেদিন তুমি খাঁটি সিন্ধীখানা খাওয়াবে।"

"আসছে সপ্তাহে?"

"যদি বেঁচে থাকি তবে ঠিক আছে।"

"তোমারও প্রাণের আশঙ্কা হচ্ছে নাকি? কে খুন করল ধরা পড়েছে?"

"কলকাতার রাস্তায় বেরোলেই প্রাণের আশঙ্কা। টেভারেসকে যে খুন করেছে তার সঙ্গে আমার কি? ঠাট্টা রাখ দয়া করে।"

চায়ের পরে ফার্গুসনদম্পতি জনে-জনে সবার কাছে গিয়ে বিদায় নিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে দু-এক কথা বললেন, বেয়ারা দারোয়ানরাও বাদ গেল না। আমার কাছে এসে বললেন, "কাঞ্চন, যদি কখনো বাঙ্গালোর যাও আমাদের সঙ্গে দেখা কর। ঠিকানা অফিসেই রইল, ডাকবাবুকে জিগগেস কর।"

বাড়ি ফিরে যোশেফের কাছে যে খবর পেলাম তা সুবিধের নয়। ডোরিনের নামে কাল সন্ধ্যেয় নাকি এক টেলিগ্রাম আসে, সেই থেকে ওর ঘরের দরজা বন্ধ।

"কাল রাতে বললে না কেন আমাকে?"

"তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু আজও সারাদিন যখন বন্ধ তখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটি গোলমেলে।"

ডোরিন অনেক ডাকাডাকির পরে দরজা খুলল। মুখ কাগজের মতো শাদা, চোখ লাল, শরীর কাঁপছে। ফুঁপিয়ে উঠে বলল, "আমার বার্টি নেই, বুক ভেঙে চলে গেছে। মা হয়ে কি করে এই কষ্ট সহ্য করব?"

পাশেই একটা টেলিগ্রাম পড়েছিল, তুলে নিলাম, দার্জিলিং থেকে এসেছে, লেখা আছে—হার্বার্ট ব্রাউন খেলতে গিয়ে খাদের মধ্যে পড়ে যায়, আর জ্ঞান হয়নি, প্রভু খৃষ্টের কাছে তার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করছি।

জানতাম ডোরিনের ছেলে দার্জিলিঙে সেণ্ট প্যাট্রিক স্কুলে পড়ে। গত বছর শীতের ছুটিতে আনাতে পারেনি ওর কাছে খরচার অভাবে, এবার আসবার কথা ছিল।

ও পড়ে যাচ্ছিল, দু-হাত বাড়িয়ে ধরলাম। মূর্ছা গেছে। শুইয়ে দিলাম বিছানায় অচৈতন্য দেহটা।

হতভাগিনী জননী তার একমাত্র সম্বল হারিয়েছে। বড় দুঃখের ধন, বড় কষ্টে মানুষ করছিল। সমস্ত মন আমার এই দুঃখিনীর জন্যে কেঁদে উঠল।

ছুটে গেলাম ম্যাকের কাছে। ওকে বাঁচাতেই হবে। এই সঙ্কটমুহূর্তে বুঝতে পারলাম ও আমার অন্তরের কতখানি জায়গা জুড়ে বসেছে। আগে বুঝিনি।

ডোরিনের দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছে। ম্যাক চামচে দিয়ে দাঁতের পাটি ফাঁক করে কিছু ব্রাণ্ডি খাইয়ে দিয়ে বলল, "কনি, এটা লজ্জা করবার সময় নয়। তুমি ওর পিঠের দিকটা খুব জোরে ঘষতে থাক হাতের চেটো দিয়ে, আমি মালিস করছি বুকের দিকটা। ব্লাউজটা তো ছেঁড়া-ছেঁড়া, খুলেই ফেল। নইলে একেবারেই ছিঁড়ে যাবে।"

"ম্যাক, শোকের আঘাত আর অসীম ক্লান্তি দুই-ই আছে, পুত্রশোকের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা অনাহার।"

"দেখছ বিছানাটার অবস্থা? চাদরে তালি, গদিটা এবড়োখেবড়ো, বালিসের তুলো বেরিয়েছে। শুধু মিস্ গ্রেই নয়। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বেশির ভাগই দুর্দশাগ্রস্ত। রোজগারের বেশির ভাগ অংশটাই যায় বাইরের ঠাটের জন্যে, ফিটফাট হয়ে বেরোতে। আমি নিজে ওদেরই একজন, তবুও বলছি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হয়ে জন্মানোই একটা অভিশাপ। এ মেয়েটিকে জানতাম ভালো, কিন্তু কুমারী হয়েও ছেলের মা হতে গেল কেন?"

"ম্যাক, আর একদিন সব বলব, ও আসলে কুমারী নয়। ডোরিন-এর এখনো তো হুঁস হল না।"

"কনি, ডাক্তারই ডাকতে হবে বোধহয়। তবে তার আগে আর একবার চেষ্টা করে দেখি। আমি নিজেই হার্টস্টিমুলেট মাঝে-মাঝে খেয়ে থাকি, যাই নিয়ে আসি। এখন এক কাজ কর, ব্লাউজটা আবার পরিয়ে দাও। যদি সে-ওষুধে জ্ঞান হয়, লজ্জা পাবে। মেয়েটি বড় লাজুক। দারিদ্র্য ও লজ্জা দুটোই মেয়েদের কাছে মারাত্মক, একটা গল্প বলছি শোনো। গল্প ঠিক নয়, প্রত্যক্ষ ঘটনা। মেয়েটি মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী। একবার শিকারে যাই বস্তারের জঙ্গলে, যেতে-যেতে একটা পার্বত্য-নদীর কাছে এসে পড়েছি, সঙ্গে জন তিনেক লোক, ওরাও ওখানকার আদিবাসী। দেখলাম একটি মেয়ে কলসী হাতে জল তুলতে গিয়ে পা ফস্কে পড়ে স্রোতে ভেসে চলল। আমার সঙ্গী সুখন মোড়ল লাফ দিয়ে পড়ল জলে, অনেক কষ্টে টেনে তুলল,

কলসীটা উপুড় হয়ে না পড়লে মেয়েটা ডুবেই যেত। আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশন দিতে-দিতে মেয়েটার জ্ঞান হল। চোখ মেলে যখন দেখল পরনে কিছুই নেই, শাড়ি স্রোতে ভেসে গেছে, তখন লজ্জা পেয়ে এক দৌড়ে আবার নদীতে ঝাঁপ দিল, এবং তলিয়ে গেল। সুখন মোড়লও পেছন-পেছন ঝাঁপ দিয়েছিল কিন্তু এবার আর খুঁজে পেল না। হয়তো শুধু আমি থাকলে জঙ্গলবাসিনী যুবতীটি এরকমটি করত না, মনে হয় জাতভাইদের দেখেই লজ্জায় ঘেন্নায় এই চরম আশ্রয়ের শরণ নিল।"

ম্যাকের ওষুধে কাজ হল। আস্তে-আস্তে ডোরিন চোখ মেলল। ম্যাক জিগগেস করল, "কেমন লাগছে এখন মিস্ গ্রে?" কোনো জবাব পেল না তার প্রশ্নের উত্তরে, জবাব বোধহয় সে আশাও করেনি। হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"ডোরিন, আমাকে চিনতে পারছ?"

"কাঞ্চন?"

"হ্যাঁ।"

"আর বাঁচতে চাই না, বেঁচে কি লাভ? কার জন্যে বাঁচব?"

"সে কথা পরে হবে।"

"পরে কি হবে ভাবতে পারি না। উঃ!"

"এখন কিছু ভাবতে যেয়ো না।"

"তুমি কি এতক্ষণ এখানেই ছিলে? কাছে এসে বস, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।"

দুর্বল মুহূর্তে লোক অনেক কিছু করে বসে। ডোরিন আমার হাতটি বুকে চেপে ধরল। তারপর কেঁদে উঠল আবার। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "কাঞ্চন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা কর না।"

যোশেফের হাতে ট্রেতে কফি, টোস্ট, মাখন, মধু। পেছনে ম্যাক। সে বলল, "কনি, বসিয়ে দাও ওকে। মিস্ গ্রে, তোমার তো এখন কিছু না খেলে চলবে না।"

ডোরিন বলল, "খেতে ইচ্ছে করছে না, খাব না।"

ম্যাক আমাকে ইশারা করল। দুর্বল স্ত্রীলোক শক্তিমান পুরুষকে নিরোধ করতে পারবে কেন? জোর করে টেনে ডোরিনকে বসিয়ে দিলাম।

"ইউ ব্রুট !"

"গায়ের জোর খাটানো ছাড়া উপায় ছিল না। ক্ষমা কর। শোক-দুঃখু কে না পায় ? কিন্তু এভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না।"

ম্যাক রুটিতে মাখন ও মধু মাখাতে-মাখাতে বলল, "প্রভু খৃষ্টের অসীম দয়ার উপর বিশ্বাস রাখ, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, শান্তি পাবে। মনে বলও পাবে। আমিও বিষম আঘাত পেয়েছি, কিন্তু জীবনের একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে, আগে চলে যাওয়া যায় না। বাঁচতে যখন হবে তখন খেতেও হবে।"

কখনো ধমকিয়ে কখনো খোশামদ করে বুড়ো ওকে খাওয়াল। তারপর বলল, "মিস্ গ্রে, এখন চুপ করে শুয়ে থাক, আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

ম্যাককে নিয়ে আমার ঘরে গেলাম। ম্যাক্ জিগগেস করল, "কনি, ওকে দেখা-শোনা করার কেউ আছে ? মানে, কোনো চাকর বা আয়া ?"

"নেই বলেই তো জানি।"

"কোনো আত্মীয় বা বন্ধু ?"

"মনে হয় না।"

"দেখ, মানুষ যদি মানুষের অসময়ে এগিয়ে না আসে তবে আর কে আসবে ? কেউ দেখাশোনার ভার না নিলে বেচারীর কি হবে এ অবস্থায় ?"

"তাই ভাবছিলাম।"

"শুধু ভাবলে চলবে না, একটা কিছু করতে হবে। আমার যা বয়েস তাতে বেঁচে থাকবার কথা নয়, বেঁচে আছি এ-ই ঢের। নিজের শরীরের ভারই অনেক সময়ে বইতে যেন পারি না। এ ভারটি নিতে হবে তোমার।"

"ভেবে দেখব, ম্যাক।"

"ভাববার সময় নেই। আমি তোমার কথা চাইছি, ইয়ংম্যান! অন্তত দিন-পনেরো পারবে না ? তারপরেই ও সামলে উঠবে। সময়ই হানে মৃত্যু, আবার সময়ই আনে শোকের সান্ত্বনা।"

"কথা দিলাম ম্যাক। যোশেফ তো আছে।"

ম্যাকের কোঁচকানো মুখ হাসিতে ভরে উঠল। আমার বুকের ওপর ওর শীর্ণ হাতখানা রেখে বলল, "ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন কনি, আমি এখন যাই।"

ডোরিনের ঘরে ফিরে যেতেই ও চীৎকার করে উঠল, "আবার এসেছ? তামাশা দেখতে? যাও, বেরিয়ে যাও!"

শোকে ওর মাথার ঠিক নেই। রাগ হল না, দুঃখ হল। ওর মাথায় হাত রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। হাত বুলোতে-বুলোতে ও একটু শান্ত হল। জিগগেস করল, "কিছু বলতে চাও?"

"সেজন্যেই এসেছিলাম। ম্যাক বলছে দিন কয়েক তুমি আমার ওখানেই থাবে। অবিশ্যি না যেতে পার তবে যোশেফই এখানে দিয়ে যাবে।"

"ম্যাক বলবার কে?"

"ও যা আমাকে হুকুম করবে তা আমার মানতেই হবে। আমি ওকে শ্রদ্ধা করি।"

"ওর হুকুম আমাকে মানতে হবে কেন?"

"আর একজনেরও হুকুম, হুকুম না বলে বলা যাক অনুরোধ।"

"কার?"

"আমার।"

"অনুরোধ না দয়া? কেবলি আমাকে দয়া দেখাতে চাও তো?"

"দরদ স্নেহ মমতা সমবেদনা একথাগুলি কি তোমার অভিধানে নেই ডোরিন?"

"যা জীবনে পাইনি তার মানে বুঝি না। ও-সব বাজে কথা, নতুন করে শেখাতে এস না। জগৎটাকে ভালোভাবেই চিনেছি। আর তুমিই বা কি উদ্দেশ্যে আমার জন্যে এত করতে চাও?"

"জগৎটা আধখানা চিনেছ, আধখানা চেননি। সবাইকে যদি জানোয়ার ভাব তবে প্রচণ্ড ভুল করবে। যাক, আমি আর কথা বলব না, তুমি কথা কইতে হাঁপাচ্ছ, এটা কথাকাটাকাটির সময় নয়, অবস্থা মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তা তোমার মেনে নেওয়াই বোধহয় উচিত।"

পরের দিন অফিসে কাজকর্ম ভালো লাগছিল না। ভুলচুকও দুয়েকটা হয়ে গেল, হারীণদার মৃদু ভর্ৎসনা শুনতে হল। মেয়েরা একগুঁয়ে জাত। পুরুষদের মতো সব জিনিস মানিয়ে নিতে পারে না। সন্দেহও ওদের বেশি। ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স থেকে ওদের জন্মায় সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

বাড়িতে এলেই যোশেফ নালিস করল, "সেই সকালে চা-টোস্টের পরে গ্রে মেমসাহেব আর কিছুই খায়নি। দুপুরের খাবার, বিকেলের চা, সব ফিরিয়ে দিয়েছে।"

বারে-বারে বুড়ো ম্যাককে ডাকা যায় না। কি করা যায়? তার মতো আমি হাতে পায়ে ধরে সাধাসাধি করতে জানি না। ডোরিনের এ অবস্থায় ধমকাতেও মন চায় না। আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেছে। একটু কড়া না হলে তো চলবেও না এখন। চলে গেলাম ওর ঘরে। বললাম, "কেমন আছ? আমাকে দেখে চটছ না তো?"

"মাথা দপদপ করছে।"

"এস টিপে দিচ্ছি।"

মাথাটা সত্যিই খুব গরম, রগদুটো ছটাস-ছটাস করছে। মনের কষ্ট তো আছেই তাছাড়া না খেয়ে পিত্তি পড়লেও মাথা ধরে জানি। কিন্তু চুপ করে রইলাম। ডোরিন জিগগেস করল, "এসে চা খেয়েছ কাঞ্চন?"

"না, চা-টোস্ট দিয়েছিল যোশেফ, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করল না।"

"যাও-যাও, খেয়ে এস, চা সময় মতো না খেলে তো তোমার মাথা ধরে।"

"ধরে ধরুক।"

"রাগ করছ?"

"কার ওপর রাগ? পাশ ফেরো, ওধারটা টিপে দিই।"

"যোশেফকে ডাক।"

"ডাকার দরকার দেখছি না। কেন ডাকতে বলছ?"

"তবে আমাকেই উঠে ডাকতে হবে।"

"কিসের জন্যে?"

"তোমাকে চা দেবে।"

দেখা যাচ্ছে ফল হচ্ছে! মেয়েজাত মায়ের জাত। এক জায়গায় তাদের ভীষণ দুর্বলতা। প্রিয়জন না খেয়ে থাকবে তা সহ্য করতে পারে না। অন্নপূর্ণার অংশে ওদের জন্মে। ক্ষুধার গ্রাস বিলোবার ভার ওদের হাতে।

ডোরিনের কাছে আমি প্রিয়জন কিনা জানি না, জানবার দরকারও নেই। তবুও ও উঠে দাঁড়াল। বলল, "চল কাঞ্চন তোমার ঘরে, সেখানে গিয়েই বসি।"

যোশেফকে ডাকবার আমি কোনো গরজই দেখলাম না। দেখি ডোরিন কি করে।

"যোশেফ, যোশেফ!"

যোশেফ ছুটে এল। জিগগেস করল, "ডাকছেন মেমসাহেব?"

"সাহেবকে চা দাও।"

টাইটা খুলে রেখে আসবার ওজুহাতে এক ফাঁকে যোশেফকে ইশারা করলাম ম্যাককে ডেকে আনতে।

ম্যাক ও চায়ের ট্রে প্রায় একই সময়ে হাজির হল। সে বলল, "মিস্ গ্রে, তুমি চা খেতে থাক, আমি বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছি।"

মহামানবদের বাণী হৃদয়স্পর্শী। ম্যাক তার সমস্ত অন্তর উজাড় করে পড়ে যাচ্ছে। পুত্রশোকাহতা এক নারী খৃষ্টের চরণে নতজানু, পাষাণের মতো স্তব্ধ, করুণা-সিন্ধু ন্যাজারেথের সেই ঋষি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কি বেদনাঘন পরিবেশ! কি অমৃতবর্ষী উপদেশ! ম্যাকের চোখ ছল-ছল, ডোরিনের চোখে জল। মনে হচ্ছিল প্রভু খৃষ্ট যেন দাঁড়িয়েছেন এসে আমাদের পাশে। এ ঘরটি যেন আর ঘর নয়, তাঁর চরণস্পর্শে ধন্য, এক পুণ্যস্থলী।

আজ যদি কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ নিঃশব্দে ধরণীর ধূলিতে এসে দাঁড়ান তবে মর্মাহত হবেন। তাঁরা এসেছিলেন লোকাচরিত ধর্মের আবর্জনার সংস্কার-সাধনে। আজ দেখবেন তাঁদের প্রদর্শিত আদর্শ বিকৃতিলাভ করে মানবগোষ্ঠীকে বহুখণ্ডিত করে ফেলেছে। ভিন্ন-ভিন্ন ঈশ্বর গড়ে উঠেছে মন্দির মসজিদ গীর্জায়। বিদ্বেষ ধর্মান্ধতা অসহিষ্ণুতা সঙ্কীর্ণতার বিষে সমাজ জর্জরিত। সম্প্রদায়গত বিভেদ দুষ্টব্রণের মতো দূষিত করেছে মানুষের মন। কৃষ্ণ বলবেন—কই, আমি তো বৈষ্ণব নামে কোনো পৃথক মতবাদের কথা জানি না! বুদ্ধ অবাক হবেন দেখে তাঁর নামে বৌদ্ধধর্ম বলে এক ধর্ম প্রচলিত হয়েছে। খৃষ্ট বলবেন—খৃষ্টান কথাটির অর্থ তো আমি বুঝি না!

উঠে যাবার সময় বুড়ো বলল, "মিস্ গ্রে, তোমার জন্যে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এটা এসময় তোমার পক্ষে ওষুধের মতো। যোশেফ, এস আমার সঙ্গে।"

ডোরিন চা-টোস্ট খেয়েছে। বাঁচা গেল। জিগগেস করলাম, "কেমন লাগছে এখন?"

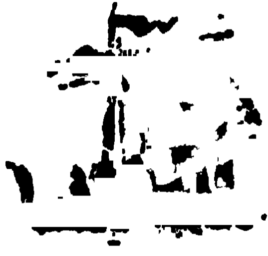
"অনেকটা ভালো।"

"ডিনারে একটু মুর্গীর ঝোল দেবে? শরীর সারতে অমন জিনিস আর কিছু নেই। ভেব না তোমাকে জোর করে খাওয়াতে চাইছি।"

ডোরিন আপত্তি করল না। মৌনং সম্মতি লক্ষণং। এ সংস্কৃত কথাটিও নফরদার কাছে শেখা। আমি সংস্কৃতের 'স'ও জানি না।

যোশেফ ম্যাকের সঙ্গে ওপরে গিয়েছিল ব্র্যাণ্ডি আনতে, দুম করে সামনে এনে রাখল একটা বেতের ঝুড়ি। একে-একে বেরোলো তার ভিতর থেকে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি, একটিন মাখন, একটিন চীজ, একশিশি নিউজিল্যাণ্ড মধু, একটিন গোল্ডেন-পাফ বিস্কুট, একবোতল হর্লিক্স, একটিন সসেজ, তিনটে জ্যান্ত মুর্গী!

রুমালে চোখ মুছল ডোরিন, গলা দিয়ে কথা বেরোল না।



২৫

মুন্নাদির কাণ্ড ! ভাইফোঁটার নেমতন্ন করেছেন !

ছিলেন মুসলমান, বিয়ের পর হলেন খৃষ্টান, আবার পিছু হটে মুসলমান ! মোটর গাড়ি চালানোর ভাষায় ফার্স্টগিয়ার থেকে সেকেণ্ডগিয়ার, তারপরে রিভার্স-গিয়ার। থার্ডগিয়ারে স্পীড দিয়ে লম্বা পাল্লায় আর যাওয়া ঘটল না।

ভাইফোঁটায় বিজাতীয় পোশাকে হাজির হওয়া বেমানান এবং বেয়াদবি। বাঙালীর নিজস্ব উৎসব এটা। বাঙালীর নিজস্ব পরিচ্ছেদেই যাওয়া উচিত। ধুতির নাকি কয়েকটা আলাদা বহর আছে। কোনোদিন ধুতি পরিনি বলে দোকানীকেই জিগগেস করতে হল। সে বোধ হয় ভাবল পুরোবহরের ধুতি কখনো পরিনি, গ্রামের লোক হালে শহুরে হয়েছি, গ্রামে খাট ধুতিতেই চলত। শরীরের লম্বত্ব দেখে যা দিল কিনে ফেললাম। গোলমাল বাধল পাঞ্জাবি নিয়ে। অনেক দোকান ঘুরে এক রেডিমেড জামার দোকানে একটা মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে ঠিক হল। অর্ডার দেবার সময় নেই, সেটাই কিনলাম। গান্ধিজী খদ্দর পরতেন, জহরলাল খদ্দর পরতেন, কংগ্রেস নেতারা সব খদ্দরধারী। আমি হরিজন, কারণ সাহেবী কোম্পানীর গোলামি করি, ঐ মহাজনদের একটু অনুকরণ করে দেখি না খদ্দরের দ্রব্যগুণ কতটুকু বুঝতে পারি !

কাছা কোঁচা নিয়ে নাজেহাল হচ্ছিলাম। কখনো বড় হয়ে যায়, কখনো ছোট। যখন ও দুটোকে বাগে এনেছি প্রায় তখন ফস-ফস করে কোমর থেকে ধুতিটাই খসে পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বেল্টের শরণাপন্ন হতে হল। ওদিকে ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে-সাতটা। দিনে অফিস আছে বলে যাবার কথা ছিল সন্ধ্যে সাড়ে-ছটায়। ধুতি পাঞ্জাবি কিনতে গিয়েই এই ক্যাসাদ। যা ভাবা যায় চট করে হয়ে যাবে তা অনেক সময় খট করে আটকে ধরে।

এন্টনীরা দুজনেই দুয়িংরুমে পথের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। এন্টনী

বলল, "এত দেরি কেন ব্রাদার-ইন-ল ? তোমার দিদি তো আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল।"

"এটুকু বলতে পারি এণ্টনীদা, যখন আসব কথা দিয়েছি, তখন প্রাণের আশা ছেড়ে দিলেও আমি শেষ পর্যন্ত এখানে এসেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতাম।"

"চিঠি ডাকে দিতে দেরি হলে লেট ফী দিয়ে ডাক ধরা যায় জানো তো ? এই লেট হবার জন্যে তোমাকেও মাশুল দিতে হবে। আজ রাতে এখানে থাকবে, কাল ভোরে চা খেয়ে তবে বাড়ি যাবে। বাঃ, আজ দেখাচ্ছে যেন রাজপুত্তুরের মতো !"

এবার কথা কইলেন মুন্নাদি। বললেন, "কেন গো এণ্টনীসাহেব, কাঞ্চন ভাই যাই পরুক না কেন, রাজপুত্তুরের মতোই দেখায়। ধুতি পাঞ্জাবিতে আরো খোলতাই দেখাচ্ছে।"

"মুন্নাদি, তুমি হিন্দুমতে ভাইফোঁটা দিতে ডেকেছ, তাই বলতে সাহস পাচ্ছি তোমার সংসার যেন লক্ষ্মীর সংসার। সব কিছু সাজানো-গোছানো পরিপাটি ছিম-ছাম, কোনো জিনিস নড়চড় হয় না জায়গা থেকে, দেখতে বেশ লাগে।"

মুন্নাদির মুখের হাসি যেন মেঘে ঢাকা পড়ল। বললেন, "যে লক্ষ্মীছাড়া ঘরে কচি-কাচাদের হুটোপুটি নেই, কোনো কিছু তচনচ হয় না, যেমনটি আছে তেমনটিই থাকে, সেখানে তুই লক্ষ্মীশ্রী দেখলি কোথায় ? পারবি কাঞ্চন তুই কাগজ কুটিকুটি করে, ঐ চীনেমাটির খেলনা ভেঙে, এখুনি সব লণ্ডভণ্ড করতে ? আমি খুশিমনে লেগে যাব আবার গোছগাছ করতে। যাই এবার ভাইফোঁটার জিনিসপত্তর নিয়ে আসি !"

হায়, এই সন্তানহীনা প্রৌঢ়ার মনে না জেনে দুঃখ দিয়েছি। নারীজীবনের এক অমূল্য সম্পদ থেকে ইনি বঞ্চিতা। কথাটা আগে ভেবে দেখিনি, বুঝবার বয়েসও আমার হয়নি বোধ হয়।

এণ্টনী বলল, "ওর হাত দিয়ে কত শিশুর জন্ম হল, কত মায়ের কোল ভরে উঠল, কিন্তু ওর নিজের কোল রইল শূন্য ! কাঞ্চন, এক-এক সময় ভাবি একটা গরীবের ছেলে এনে পুষলে কেমন হয় ? সারাদিন ও কচি খোকার মতো আমাকে আগলে রাখে, আমিও তা থেকে রেহাই পাই।"

এক হাতে রুপোর থালায় দীপ চন্দন ঘি পানের বাটা, অন্য হাতে মাটির ঘট নিয়ে এলেন মুন্নাদি, পেছনে সুলতানের হাতে কার্পেটের আসন। ওঁর পরনে লাল পাড় পাটের শাড়ি। যেন সিনেমার একটি দৃশ্য দেখছি !

ফোঁটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম। সেদিন মল্লিক মশাইয়ের স্ত্রীকেও প্রণাম করেছি না? তাঁকে প্রণাম করতে আমার মোটেই ভালো লাগেনি, এঁকে প্রণাম করতে ঢের বেশি ভালো লাগল। মন একটা আশ্চর্য জিনিস। বাইজী গর্ভজাত এই মুসলমান রমণীকে আমি স্বচ্ছন্দে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করলাম কিন্তু সেই হিন্দু গৃহকর্ত্রীকে প্রণামের ভিতরে ছিল শুধু ভদ্রতা জ্ঞাপন, শ্রদ্ধা নয়। কেন নয়, বলতে পারি না।

আমার মাথায় হাত রেখে মুন্নাদি একটা উর্দু বয়েৎ উচ্চারণ করলেন আশী-র্বাদের ভঙ্গীতে। তারপরে ধান দূর্বো দিলেন। আমি বললাম, "কি বললে মানে বুঝলাম না।"

"গোলাপের মতো তোমার যশের খুশবো হোক, সিংহের মতো মুরোদ হোক, ঝরনার মতো নিজেকে ছড়িয়ে দাও, শিশুর মতো সরল হও।"

"চমৎকার আশীর্বাদ। দাঁড়াও আর একবার প্রণাম করি।"

খেতে বসে দেখলাম একেবারেই বাঙালীর খাদ্য। মুন্নাদিকে জোর করে আমাদের সঙ্গে বসালাম, বললাম, "ভাইবোনে আজ একসঙ্গে খেতে হয়, না খেলে চলবে না।"

গরম ভাতের সঙ্গে ঘি, তিন রকমের ভাজা, ফুল কপির দমপোক্ত, রুই মাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, আনারসের চাটনি, ছানার পায়েস। বাটিতে-বাটিতে সাজানো। এন্টনী বলল, "বুঝেছ কাঞ্চন, হিন্দুদের বারোমাসে তেরো পার্বণের আনন্দ দেখে উনি হিন্দু হয়ে না যান এবার। এ-পাড়ায় এখন প্রায় সবাই হিন্দু, শুধু আমরাই হংসমধ্যে বকো যথা। ইনি যদি এখন আর একবার ধর্ম পাল্টে হিন্দু হয়ে যান তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই সঙ্গে সুলতান মিঞা যদি রাম-লাল হয়ে যায় তবে সামলাতে পারবে ভায়া? দুজনকে নিয়ে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর বেলুড়ে নিয়ে ছুটোছুটি করতে?"

"সামলাবে কাঞ্চনের বৌ।"

"আচ্ছা মুন্নাদি, তুমি এত ভালো বাংলা শিখেছ তবে কাঞ্চন না ডেকে কাঞ্চুন বল কেন? এন্টনীর বদলে এন্টুনী?"

ভাতের গ্রাস মাঝপথে থামিয়ে এন্টনীদাই জবাব দিলেন, "ওর যখন বিয়ে হয় আমার সঙ্গে তখন বাংলা খুব কমই জানত, ইংরেজী একফোঁটাও নয়। প্রথমে যে

নামে ও আমায় ডেকেছিল তা ছাড়তে পারেনি, বলে লজ্জা করে। আর তোমাকে যে কাঞ্চুন বলে তার কারণ এই যে ওর ভাই ছিল না, আদর করে 'উ'-কারটি যোগ করেছে। নবাব সাহেব মুন্নাকে আদর করে ডাকতেন মুন্নু।"

ব্যাপারটি ফাঁস করে দেবার প্রতিশোধ নিলেন এবার মুন্নাদি। বললেন, "দেখ, বুড়ো কেমন হ্যাংলার মতো গিলছে, যেন কোনোদিন কিছু খায়নি।"

"তুমি তো খোট্টা, মুন্না? আমি বাঙালি সন্তান, বাঙলা খানা পেলে ছাড়ব কেন? রোজ সকাল-বিকেল পাঁচ-ছ-মাইল বনবন করে লাট্টুর মতো ছোটা-ছুটি করলে খিদের চোদ্দপুরুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না? বুড়ো হয়েছি কে বলে? রোগে বুড়ো করেছিল।"

"না, না, কচি ছেলেটি যেন। দু'বছর পরে তো পঞ্চাশের কোঠায় গিয়ে পড়তে হবে, সেটি মোশাই মনে আছে?"

জন এণ্টনীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই যেন দশ বছর খসে গিয়েছে ওর রোগজীর্ণ পোড়াকাঠের মতো দেহ থেকে। গালে মাংস লেগেছে, শরীরে মাংস লেগেছে। মুন্নাদিও যে এমন সুন্দরী তা আগে বুঝতে পারিনি। বস্তির ঘরে যাকে শুষ্ক রুক্ষ রণচণ্ডিনীরূপে প্রথম দেখেছিলাম সে যেন অন্য কেউ। এখন আভিজাত্যের শ্রীমণ্ডিত উজ্জ্বল হরিদ্রাভ মুখমণ্ডল। না, বসোরার গোলাপ বলা চলে না, বলা চলে লক্ষ্ণৌর নবাব-প্রাসাদের উদ্যানের একটি স্থলপদ্ম।

মুন্নাদি জিগগেস করল, "গ্রে-মেমসাহেবের খবর কি, কাঞ্চুন?"

"একটি ছেলে ছিল, দার্জিলিঙে হঠাৎ মারা গেছে। শরীর ভেঙে পড়েছে, প্রায় শয্যাগত।"

কোনো প্রশ্ন তুললেন না উনি ছেলের সম্বন্ধে, কেবল ছেলের মায়ের জন্যে আপসোস করলেন। কদিনই বা দেখেছেন তাকে? সন্দেহের অবকাশই হয়নি। পরের দিন সকালে উনি ঘুম থেকে উঠবার আগেই বাড়ি ফিরে এলাম।

মিস্ টেভারেসের জায়গায় নতুন স্টেনোটাইপিস্ট এসেছে। মিস্ উইটেন বেকার। নামটি ভারি-ভারি, শরীরের ওজনও ভারি, বয়েসেও ভারি। বচন বেশি, বসন-ভূষণেও রঙের ছাট বেশি, কড়া সেন্টের সঙ্গে সিগারেটের গন্ধের ভাপও বেশি।

যা কম তা হল মুখের ছিরি ছাঁদ এবং পায়ের গতি। ওর টেবিল থেকে গজেন্দ্র-গমনে আমাদের ক্যাবিনে পৌছতে বেশ কিছু সময় লাগে। তবে সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ-রাইটারে হাত খুব চালু, এটাই আমাদের দরকার।

সেদিন টয়লেট রুমের দরজার কাছে মিস্ ফিশারের একেবারে সামনে পড়ে গেলাম। জিগগেস করল, "মিস্টার সানিয়াল, তোমাদের নতুন গার্লকে পছন্দ হয়েছে তোমার ?"

"হবে না কেন ? কাজকর্মে চৌকস।"

"আমাকে তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে বদলী করে নাও না কেন ওর জায়গায় ?"

"তোমাকে দিয়ে চলবে না।"

মিস্ ফিসার ঠোঁট বেঁকিয়ে চলে গেল।

বাবুরা মিস্ উইটেন বেকারের নাম দিয়েছে শুনলাম 'মিস্ কুমড়ো।' হারীণদাকে বলতে উনি হো-হো করে হেসে বললেন, "হয়তো তোমার আমারও এক-একটা নাম দিয়েছে ওরা, ভালোই হোক আর মন্দই হোক। ফার্গুসনকে ওরা নাম দিয়েছিল 'জ্যাঠামশাই।' এখানকার হেড-গার্লকে ওরা বলে বড়-খুকি।"

চৌরঙ্গী দিয়ে যাচ্ছিলাম অফিসফেরত, পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে সারি-সারি গাড়ি-গুলো আটকে দিল ট্রাফিকলাইটের লালবাতি। আমি বাঁদিকের ফুটপাথ ঘেঁষে। দেখি নকরদা হন-হন করে চলেছেন। ডাক দিলাম।

তড়াক করে আমার পাশে এসে বসে বললেন, "ভালোই হল তোর সঙ্গে দেখা হয়ে, ট্রাম বাসে উঠতে পারছি না, ট্যাক্সি খালি যাচ্ছে না, পৌছে দিতে পারবি আমাকে টালীগঞ্জ রিজেণ্ট পার্কে ? না তোর কষ্ট হবে ?"

"কিছু মাত্র কষ্ট হবে না দাদা, আপনার সেবায় লাগতে পারলে তো বর্তে যাই !"

ভাইফোঁটার গল্প বললাম, এণ্টনীদের দাম্পত্য জীবনের আবহাওয়া কি রকম বদলে গেছে সেই সম্বন্ধে দু-একটা মন্তব্য করতে উনি হাসতে লাগলেন। বললেন, "কাঞ্চন, নর ও নারী, স্বামী ও স্ত্রী, এদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তোর একটু জ্ঞানগম্যি হওয়া দরকার এখন। বয়েস হয়েছে, বিয়ে একদিন না একদিন করবিই, আমার কাছে শুনে নে। কোনো বই পড়ে শেখা নয় রে আমার, শুধু দু-চোখ দিয়ে ভালো করে দেখেছি, দু-কান দিয়ে ভালো করে শুনেছি, আর ভালো করে তলিয়ে যা-যা

বুঝেছি সেগুলো যত্ন করে আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে জমা করে রেখেছি। অর্থ বিদ্যা বুদ্ধি রূপ গুণ কিম্বা বংশে স্ত্রী যদি স্বামীর চাইতে অনেকটা সরেস হয় তবে সে-গাঁটছড়ায় এক জায়গায় চিড় খেয়ে যাবে। শ্রীমতী রূপসী দেমাক দেখাবে শ্রীযুক্ত রূপহীনকে। শ্রীমতী করিৎকর্মিণী শ্রীযুক্ত বিদ্বান স্বামীকেও খোঁটা দেবে যদি তিনি চালাক চতুর চটপটে না হন। ধনী কন্যা চোপা করবে শ্রীযুত স্বামীকে যদি তিনি নির্ধন হন। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব আমাদের শাস্ত্রকাররা ভালো করেই জানতেন, তাই বলে গেছেন 'পতি পরম গুরু,' অর্থাৎ স্বামী যেরকমই হোন না কেন গুরুর মতো মান্য করা উচিত। এতেই সংসারে শান্তি থাকে।"

"কিন্তু নফরদা, স্ত্রী স্বামীর কাছে সর্বদা নত হয়ে থাকবে কেন? এটা তো সুবিচার নয়, অবিচার!"

"সমাজের রূপ বদলানোর সঙ্গে-সঙ্গে তখনকার প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষ ও স্ত্রী-জগতের দাবিদাওয়ার তারতম্য বদলায়। সুবিচার অবিচার কথাগুলোর মানেও বদলায় যুগধর্মের পটভূমিকায়। আদিম বন্য জীবনেই দেখা গিয়েছিল একটা শ্রম-বিভাগের সূচনা, যাকে তোরা বলিস ডিভিসন অফ লেবার। পুরুষরা খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকত শিকারে, সেই মাংস ঝলসানো, ভাগ করা, পরিবেশন করা শিকারের হাতিয়ার তৈরির কাজে সাহায্য করা, মরা জানোয়ারের চামড়া দিয়ে শীত-বর্ষায় শরীরের আচ্ছাদন তৈরি করার ভার ছিল মেয়েদের ওপর।

"স্ত্রীজাতই প্রথম আবিষ্কার করল বীজ থেকে, কলা থেকে, শস্য জন্মানো যায়, ফলমূল শব্জী জন্মানো যায়। শিকারির যাযাবরবৃত্তি থেকে এক ধাপ এগিয়ে এসে তখন গৃহনির্মাণ ও গ্রামীণ জীবনের গোড়াপত্তন হল। গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী প্রভৃতি বন্য পশুদের পোষ মানিয়ে কাজে লাগানোও স্ত্রীজাতেরই আবিষ্কার। কাপড়বোনা, গৃহস্থালীর সব কিছু জিনিসই ওদের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে মেয়েরা ক্ষেত খামারের কাজ, কাঠ কাটা, ঘর তৈরি করা এবং আর সব ভারি-ভারি মেহনতের কাজ করত। এই কৃতীত্বের স্বীকৃতি ওরা পেয়েছিল যে-যে দেশে সভ্যতার পত্তন প্রথমে শুরু হয়েছিল, যেমন প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, সুমেরিয়ায়। স্ত্রী-পুরুষের ছিল সমান মর্যাদা, সমান কর্তৃত্ব। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য ছিল পুরুষের চাইতে বেশি। অবলা দুর্বলা এই বদনাম তখনো ওদের দিতে কেউ সাহাস পায়নি।"

"তাহলে নফরদা, ওরা কি নিজেদের দোষেই সেই সমান অধিকার হারাল ?"

"নিজেদের দোষে নয়। কালের পরিবর্তনে, সমাজের কাঠামোর পরিবর্তনে। যখন ক্রমে মুদ্রার ব্যবহার চালু হল, ধনতন্ত্রের সূত্রপাত হল, তখন থেকেই নারীর মূল্য হল হ্রাস। ক্ষেত খামার ও আর সব কষ্টসাধ্য কাজের জন্যে যখন মজুরী দিয়ে লোক পাওয়া যায় তখন নারীর সহযোগিতা ও সহকর্মিতার আর প্রয়োজন কি ? শ্রীমতীরা আস্তে-আস্তে বাইরের জগৎ থেকে হটে এসে বাঁধা পড়ল ক্ষুদ্র গৃহগণ্ডিতে ওদের কর্মশক্তি বুদ্ধিশক্তি সৃজনীশক্তি প্রসারের ক্ষেত্র অভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সমাজ-জীবনে দলগতভাবে ওদের কদর গেল কমে। হল পুরুষের বিলাসের উপকরণ, সন্তানধারণের ও সন্তানপালনের যন্ত্র, পুরুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সেবাদাসী। ওরা আগেকার সম্মান ও মর্যাদা তো হারিয়েই ফেলল, উপরন্তু খাওয়াপরার জন্যেও হল পুরুষের মুখাপেক্ষী। তবে আবার এই বিশশতকের যান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধির যুগে মেয়েজাত সেই হারানো অধিকার ফিরে পাবার জন্যে কোমর বেঁধে নেমেছে। অফিস, কারখানা, স্কুল-কলেজ কোনো জায়গায়ই ওদের সমকক্ষতার দাবি ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। রাজনীতি ক্ষেত্রে ওদের কাছে ধর্না দিতে হয় আমাদের ভোটের জন্যে, ওরা সংসদের সভ্য হচ্ছে, মন্ত্রী হচ্ছে। ভাগ্যের চাকা ওদের ঘুরেছে।"

"এতক্ষণ যা বললেন, নফরদা, তা তো সমস্ত নারীসমাজের পতন-অভ্যুদয় কাহিনী। স্বামী ও স্ত্রীর ঘরোয়া জীবনে কি স্ত্রীর প্রতি অবিচার হয় না ?"

"যথেষ্ট অবিচার হয়, কাঞ্চন। ভরণপোষণ ও প্রজননের প্রয়োজনে পুরুষ বানিয়েছে স্ত্রীকে একরকম দাসী। এ সম্পর্কের ভিতর যথেষ্ট ভালোবাসা ও একাত্মবোধ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ভেবে দেখ তুই সংসারের কর্মসূচীটি কিরকম বৈচিত্র্যহীনভাবে দিনের পর দিন একই তালে চলে স্ত্রী বেচারীর পক্ষে। দিনের পর দিন বাড়িঘরদোর কাপড়জামা সাফসাফাই রাখার অনন্ত প্রচেষ্টা, রোজ তিনচার দফা সবাইকে গেলাবার পুনঃপুনঃ আয়োজন। একঘেয়ে জীবনের চূড়ান্ত দুর্ভোগ মেয়েজাতের সহ্য করে যেতে হয় সারাজীবন। সেবা পরিচর্যা সংসারধর্মের নামে পুরুষের দাবি মেটাতে স্নেভারি ড্রাজারি দাসীগিরি। এর ভেতর যে আনন্দ ও তৃপ্তি নেই তা বলতে চাইনে, তবে এই ব্যক্তিগত সেবাধর্মকে বৃহত্তর সমাজ কোনো স্বীকৃতি দেয় না। যে রাস্তার বাতি জ্বালাচ্ছে সে লোকটাকেও সমাজের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু ঘোষমশায়ের হাড্ডিসার গিন্নী যে ঘরের মধ্যে



খেটে-খেটে সারা হচ্ছে তা কেউ চোখে দেখছে না। সেই কৃষ্ণের জাবটি কি খেল না খেল ঘোষমশাই একবার জিগগেসও করলেন না অফিস থেকে বাড়ি এসে। খুকি হয়তো জ্বরে ভাজা-ভাজা হচ্ছে, দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ঘোষজায়াকেই রাত জাগতে হবে, কারণ ঘোষমশাইয়ের অফিস আছে পরের দিন, তাই নাকডেকে আপাতত ঘুমোচ্ছেন। ছেলে হয়তো স্কুলফাইনাল পরীক্ষায় গাড্ডু খেয়ে এল, ঘোষ-মশাই ফলাও করে বলছেন—ছেলেটার মাথা হয়েছে ওর মায়ের মতো, আমার মতো নয়। পুরুষজাতের এই স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার উদাহরণ আর বাড়াতে চাইনে।"

"কি আশ্চর্য নফরদা, আপনি এতটা তলিয়ে ভেবে দেখেছেন? তবুও তো নিজে সংসার করলেন না।"

"সংসারী হলে আরো একটি নারীর মনের ওপর অত্যাচার হত।"

"কেন? আপনার মতো স্বামী পাওয়া তো ভাগ্যের কথা!"

"মোটেই নয়রে ব্রাদার। বিয়ের আগে প্রত্যেক মেয়েই স্বামীর সম্বন্ধে একটা কল্পনা গড়ে তোলে মনের গোপন কোণে। বিয়ের পরে দেখে স্বামী সে-আদর্শ থেকে মাপে অনেক ছোট, ধোপেও তেমন টেঁকসই নয়। এটা স্বামীর দোষ নয়, বিধাতার সৃষ্টির খেয়াল। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলো বেশিরভাগই কবির কল্পনা, কিন্তু ওর ভেতরে অনেক কিছু আবিষ্কার করা যায় যার বাস্তবমূল্য আছে। ধর না এই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর কথা। ঐ পাঁচটি স্বামী যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব স্বামী-আদর্শের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি। মেয়েরা যা কিছু চায় স্বামীর মধ্যে তার সবই এই ছবিটির মধ্যে রয়েছে। এই পাঁচটি চরিত্র যৌথভাবে স্বামী-আদর্শের প্রতীক: যুধিষ্ঠিরের মতো ধার্মিক, ভীমের মতো বীর্যবান, অর্জুনের মতো তীক্ষ্ণধী, নকুলের মতো বিদ্বান, সহদেবের মতো রূপবান। কুমারী মেয়েরা এই পাঁচটিই চায় একসঙ্গে যখন স্বামীর কল্পনা করে, তাই কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের অনেকটা তফাত ধরা পড়ে।"

"কিন্তু বড়-বড় সাহিত্যিক দার্শনিক শিল্পী রাজনৈতিকদের স্ত্রীরা?"

"টলস্টয়, সেক্সপীয়ার, সোপেনহাওয়ার, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, ডিজরেলীদের দাম্পত্যজীবনও সুখের ছিল না। ওদের স্ত্রীরাও বহু ভোগ ভুগে গেছেন, সাহিত্যিক হয়তো লিখতে-লিখতে কাগজ ছিঁড়ে খুব নোংরা করছেন, বিখ্যাত চিত্রকরস্বামী হয়তো আঁকতে-আঁকতে তুলি ঝাড়া দিয়ে দেওয়াল নষ্ট করছেন, দার্শনিকস্বামী

হয়তো অন্যমনস্কভাবে খেতে-খেতে মুখ মুছছেন জামার হাতায়, কবিবরস্বামী হয়তো ঘুমিয়ে এমন বাঘের মতো নাক ডাকেন যে পাশে শুয়ে স্ত্রী আর ঘুমোতে পারছেন না। ইন্টিমেসী ব্রিড্‌স্‌ কনটেম্‌ট্‌।

"এবার এসে গিয়েছিরে। সামনের ঐ লাল বাড়িটার কাছাকাছি গাড়ি থামা। বড্ড উপকার করলি।"



২৬

নকুরদাকে রিজেণ্ট পার্কে নামিয়ে দিয়ে চলে এলাম চাঁদনীর বাজারে। ডোরিনের বিছানার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রেটার ইণ্ডিয়া বেডিং স্টোরের মালিক এরফান শেখ সেলাম দিয়ে স্বাগত জানাল, "আসুন হুজুর! অনেকদিন পরে এলেন।"

যে চেয়ারটায় বসতে দিল সেটা বেশ পরিষ্কারই ছিল, কিন্তু আমাকে খাতির দেখানোর জন্যে নিজের রুমাল দিয়ে সাফ করে দিল। এরফান শেখ বাঙালী মুসলমান, কিন্তু মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে নাগপুরের এক গুজরাটি মুসলমানের সঙ্গে সেইসূত্রে ও জানে আমি মস্ত বড় ব্যারিস্টার সাহেবের ছেলে। ওর দোকানে আমি আগেও কয়েকবার এসেছি।

সিঙ্গল বেডের মাপে গদি, চাদর, তোশক, বালিস, বালিসের ওয়াড়, বিছানার চাদর কিনলাম। তোশকটা ডানলোপিলোর। এরফান শেখ বলল, "শাদা চাদর আর বালিসের ওয়াড় নিচ্ছেন সাহেব? আজকাল রঙিন চাদর আর বালিসের ওয়াড় খুব চলছে। সেট-মেলানো আছে, যে রঙের চান।"

ফিকে নীল ও গোলাপী চাদরই পছন্দ হল। বললাম, "দুটো প্যাকেটই দিন, শেখসাহেব। দুটো রঙই নেব।"

"ওর সঙ্গে ম্যাচ-করা বড় তোয়ালেও আছে। দেখবেন?"

দু-রঙের দুটো করে মোট চারটে তোয়ালেও নিলাম। ডোরিনের তোয়ালের অবস্থা কেমন কে জানে? এরফান শেখের বরাতে আমার কাছ থেকে আজ প্রাপ্তি-যোগ ছিল যথেষ্ট। সেলস ট্যাক্স নিল না খাতির করে।

বাড়িতে এসে দেখি যোশেফের মুখে হাসি ধরছে না, জিগগেস করলাম কি ব্যাপার। যোশেফ বলল, "মরিয়ম ফিরে এসেছে, লতিফ ওকে পাকিস্থানে পাচার করেছিল।"

"বেশ, বেশ। ভাগ্যিস নেপালী বিয়ে করেছিলে, বুকের পাটা আছে ওর বলতে হবে! বাঙালী বৌ হলে ফিরে আসতে পারত না। অনেক হাত পাল্টে শেষে গলায় দড়ি দিত। তোমার ঢাকেশ্বরী মা কি বলেন?"

"আগে এত মাখামাখি ছিল এখন লতিফের নাম শুনতে পারেন না। বলেন, দেখা হলে ঝাঁটাপেটা করবেন। বৌকে ঘষেমেজে চান করিয়ে এনেছেন গঙ্গায় নিয়ে।"

"গঙ্গায় কেন?"

"পরের এঁঠো হয়েছে, শুদ্ধ করে আনলেন। নতুন একখান সিঁদুর এনেও বৌয়ের কপালে ফোঁটা দিয়েছেন। নইলে নাকি আমার অকল্যাণ হবে।"

"তোমরা যে রকম খৃষ্টান, আমি সে রকম হিন্দু। ঠিক জায়গায়েই এসে জুটেছ। মেমসাহেব কাল রাতে কি খেল?"

"অল্প একটু চিকেন সেদ্ধ আর কড়াইশুঁটি সেদ্ধ। ব্রেডপুডিং করেছিলাম, একদম ছোঁননি। বাকিটা নষ্ট হবে, তাই মরিয়মের জন্যে নিয়ে গেলাম।"

"ভালো করেছিলে। আজ দুপুরে কি রান্না করলে?"

"মাটন কারি, ভাত। খাচ্ছেন বড্ড কম।"

"এক কাজ কর যোশেফ, গাড়ির মধ্যে নতুন বিছানা আছে। মেমসাহেবের বিছানা তুলে ফেলে ওগুলো পেতে দাও। গোলাপী রঙের চাদর, ওয়াড় লাগিয়ে দিও, ঐ রঙের একখানা তোয়ালে বাথরুমে ঝুলিয়ে দিও, বাদবাকি সব ওর রেডিওর ওপর রেখে দাও। মেমসাহেবকে এঘরে ডেকে আনছি, তুমি চটপট কাজটি সেরে ফেল।"

ডোরিন চোখ বুজে বসে আছে। বললাম, "আমার ঘরে এসে বস তুমি, চান করবার আগে একটু কথাবার্তা বলা যাক। খারাপ লাগছে?"

"ভালো কিসে লাগবে কাঞ্চন, চল।"

ওর মুখ ফ্যাকাশে, চোখের কোণে কালি, কিছুতেই যেন সামলে উঠতে পারছে না। পুত্রশোকের মতো শোক নেই শুনেছি, সেই শোকের মূর্ত প্রকাশ আমার সামনে। শোককে প্রশ্রয় দিতে নেই, ভোলাবার চেষ্টা করাই উচিত, সমবেদনা দেখালে শোকের আগুনে ঘৃতাঞ্জলি পড়ে। মরিয়মের কাহিনীটি বললাম বেশ রঙ-চঙ দিয়ে। গঙ্গাস্নান এবং সিঁদুরের ব্যাপারটি শুনে ওর পাণ্ডুর মুখে একটু হাসির ঝলক খেলে গেল।

"কাল ডিনার ছিল আমাদের অফিসের একজনের ফ্ল্যাটে, আজও ফিরতে দেরি হয়ে গেল।"

"আমাকে আগলে বসে থাকলে তো তোমার চলবে না!"

"সমস্ত দিন কি করে সময় কাটাও?"

"কাটতে আর চায় কই?"

"আমার একটা উপকার করবে?"

"তা আবার জিগগেস করছ?"

"আমি পছন্দ করে উল নিয়ে আসব, তুমি একটা পুলোভার তৈরি করে দেবে আমাকে? আমার যেটা আছে সেটা পোকায় কেটে দিয়েছে। এইবার আমি চান করতে যাই, তুমি ডিনারের জন্যে তৈরি হয়ে এস।"

স্নান করে বসে আছি অনেকক্ষণ কিন্তু ও আসছে না দেখে আমিই চললাম ওর ঘরে। আমাকে দেখে ওর চোখদুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। বলল, "তোমার পয়সা আছে জানি, তাই বলে আমাকে অপমান করবার অধিকার তোমার নেই। আমার অবস্থা যাই হোক না কেন সেটা তোমার উপহাসের বস্তু নয়। আর যদি দান করে পুণ্যসঞ্চয়ের বাসনা হয়ে থাকে তবে ঢের লোক পাবে। দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও এগুলোকে জানলা দিয়ে।"

"অপমান উপহাস দান এসব কি বলছ? ছিঃ!"

ও চুপ করে গেল। তারপর বললাম, "এখন দয়া করে একবার বিছানাটায় একটিবার বসে দেখ ঠিক আছে কিনা?"

ডোরিন কতক্ষণ গুম হয়ে রইল, তারপর সোজা চলে এসে খাবার টেবিলে বসল। নতুন বিছানাটার ধারেও গেল না।

মুখ নিচু করে খাচ্ছিল। হঠাৎ এককোঁটা চোখের জল গড়িয়ে টপ করে ওর হাতে পড়তে দেখে বললাম, "শিগ্‌গির মুছে ফেল, যোশেফ হয়তো এখুনি এসে পড়বে।"

"ধন্যবাদ। জিনিসগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। পুরনো বিছানাটা যোশেফকে দিয়ে দেব ভাবছি।"

"খুব ভালো কথা। ও তোমার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। লতিফ মিঞা বোধ হয় মরিয়মকে গদির বিছানায় শোয়াতে পারেনি, এখন যোশেফ পারবে।"

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে ও হাসল।

"একটা কথা কি জানো ডোরিন? প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব সেন্টিমেন্ট থাকে। পরের সেন্টিমেন্টে ঘা না দিয়ে চলতে পারাটাই কি ভালো নয়?"

"হুঁ।"

"নিজস্ব সেন্টিমেন্টের মতো নিজস্ব একটা মতামত থাকে সবার। তুমি যে জিনিসটার খারাপ দিকটাই বড় করে দেখছ, আমি হয়তো তার ভালো দিকটাই শুধু দেখছি, আর একজন হয়তো ভালোটাও দেখছে না, মন্দটাও দেখছে না, জিনিসটার ওপরেই তার খেয়াল নেই।"

"হুঁ।"

"আর এক টুকরো মাংস প্লেটে তুলে নাও। তুমি খাচ্ছ বড় কম। ম্যাক বলেছিল দিন পনেরো তোমাকে রান্নাবান্না করতে দেওয়া ঠিক হবে না। দশদিন তো হয়ে গেল, এর পরে তুমি ঘরে বসে কি খাবে না খাবে দেখতে যাব না তো।"

"আমাকে নোটিশ দিচ্ছ যে এখানে খাওয়া আমার আর চলবে না?"

"মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে যে একটু বেশি না খেলে শরীর সারবে কেন। তুমি আর একটু করে নিলে আমিও আরো খানিকটা নিতে পারি।"

খাওয়া হয়ে গেলে বললাম, "আমার শোবার ঘরে একবার আসবে কি দয়া করে?"

"শোবার ঘরে কেন? তোমার শোবার ঘরে আমাকে ডাকছ কেন?"

"হয়তো কোনো খারাপ মতলব নেই, হয়তো বা আছে!"

"চল। তুমিও ঘা দিয়ে কথা বলছ আমাকে।"

শোবার ঘরে গিয়ে একটি প্যাকেট দেখিয়ে দিয়ে বললাম, "খোলো এটা, কি আছে দেখ।"

"এ যে দু-সেট ফ্রক-ব্লাউজ?"

"হ্যাঁ, ভাঁজ ভেঙে দেখ তো যার জন্যে তৈরি করিয়েছি তার পছন্দ হবে কি না?"

জিনিসগুলো আমার বিছানার ওপর ছড়িয়ে রেখে ডোরিন তাকিয়ে রইল। বলল, "পছন্দ আবার হবে না তার? চমৎকার খাপী সিল্ক, মনে হচ্ছে ট্যাফেটা, চমৎকার রঙ, চমৎকার ছাঁটকাট। তোমার কেউ হয় সে? না, বান্ধবী?"

"তোমার যখন খুব পছন্দ হয়েছে তখন এগুলো তুমিই নিয়ে যাও। তাকে পরে দেওয়া যাবে। তোমার কাছে আমার ক্ষমাও চাইতে হচ্ছে, কারণ তোমার একটা ফ্রক, একটা ব্লাউজ যোগেশকে দিয়ে চুরি করিয়ে এনেছিলাম মাপের জন্যে। সে-গুলো সেদিনই জায়গামতো ফিরে গিয়েছিল, চুরি ধরা পড়েনি। আবার চটে উঠবে নাকি? আমি বাজে ব্যয় করি না, এগুলো তোমার দরকার, আমি জানি।"

ডোরিন নিঃশব্দে কাঁদছিল শেষের কথাগুলো শুনে। বলল, "কাঞ্চন, তুমি মানুষ নও, এঞ্জেল, এগুলি আমি মাথা পেতে নিলাম।"

"ছবিতে নিশ্চয়ই দেখেছ এঞ্জেলদের একজোড়া ডানা থাকে?"

"এঞ্জেলরা যখন স্বর্গ থেকে এসে মাটির পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মায় তখন ডানা দুটি স্বর্গেই রেখে আসে।"

ডোরিন চলে যাবার পরে দরজা বন্ধ করে দিলাম। খালিগায়ে পায়জামা পরে একটা নভেল নিয়ে বসলাম। রাত সবে ন-টা। এমন সময় বাধা।

"কাঞ্চন, ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?"

মুন্নাদির গলা। বইটা রেখে দিয়ে উঠলাম। খালি গায়ে ডোরিনের কাছে যাওয়া চলে না কিন্তু এই প্রৌঢ়া মহিলাকে লজ্জা কি? দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। বললাম, "এস মুন্নাদি, আসুন এন্টনীদা, এস সুলতানভাই।"

মুন্নাদি বলল,"আসতে বড় দেরি হয়ে গেল কাঞ্চন, ট্যাক্সির ব্যাপার!"

"আমাকে বললেই তো তোমাদের নিয়ে আসতাম? সুলতান তুমি ট্যাক্সি বিদেয় করে দাও, আমি পৌঁছে দেব'খন।"

"কাঞ্চন, গ্রে-মেমসাহেবকে একটু ডাকবি এঘরে? ওর সঙ্গে দেখা করতেই এলাম।"

"ওর নাম ডোরিন, ডোরিন বলেই ডেকো তুমি। দেখি গিয়ে শুয়ে পড়েছে কি না।"

গায়ে একটা সার্ট চাপিয়ে ওর ঘরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই খুট করে আলো জ্বলে উঠল দেখলাম দরজার তলা দিয়ে।

"আবার কি কাঞ্চন?"

ডোরিনের পরনে রাতের শোবার পোশাক। বুকের ওপরের দিকটা খোলা, চুল এলোমেলো, ছোট পায়জামা হাঁটুর উপরে থেমে গেছে। নিখিলচিত্তমোহিনী

নারীর অন্যতম নৈশসজ্জা! এ-বেশে ওকে আগে কখনো দেখিনি। ওর বোধ হয় এদিকে খেয়াল নেই, কিন্তু আমার চোখে বিস্ময়ের ঝলক দেখে ও সঙ্কুচিত হল বুঝলাম।

"মুন্নাদিরা এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ওঘরে আছে। তোমার হাউসকোটটা পরে এস, গলা থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে তাহলে।" ডোরিনের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। মুন্নাদিকে জিগগেস করলাম,"ঐ বেতের টুকরিতে কি এনেছ মুন্নাদি? নিশ্চয়ই আমার জন্যে।"

"তোর জন্যে কিছুই নয়, সব ঐ মেয়েটির জন্যে?"

"খুলে দেখব?"

"ইচ্ছে হয় দেখ, কিন্তু ভাগ বসাতে পারবি না।"

প্রথমে বেরোল আঙুর, আপেল, নাসপাতি, মুসাম্বি। তারপর প্লাস্টিকের ছোট-ছোট থলেতে কিসমিস, মনাক্কা, খেজুর, বাদাম, খোবানী, সেমুই, পাঁপড়। তারপর টিনভর্তি মাখন, চীজ, মধু, চকোলেট।

ডোরিন ঘরে ঢুকে মুন্নাদির দুই গালে চুমো খেল বিলিতি কায়দা মাফিক, এণ্টনীদাকে গুড ইভনিং জানাল। নবাবজাদী মুন্নাদিও আদব-কায়দায় কম যান না, ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমো খেলেন।

বললাম, "ওঁকে ধন্যবাদ দাও ডোরিন, এসব তোমার জন্যে এনেছেন। এণ্টনীদা, এই নিন সিগারেটের টিন, দেশলাই। ধরিয়ে নিন।"

ডোরিন শ্রীনগর ও দিল্লিতে মানুষ হয়েছে, হিন্দী ভালোই জানে। মুন্নাদির সঙ্গে হিন্দীতে এবং এণ্টনীদার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে চলল।

একসময় মুন্নাদি আমার দিকে ফিরে বললেন, "এমন একটি মিষ্টি স্বভাবের টুকটুকে বৌ হলে তোর পাশে মানাত ভালো। গলার স্বরটাও কেমন মিষ্টি, দেখেছিস?"

এণ্টনীদা মন্তব্য করলেন, "ওসব ঢুকিও না কাঞ্চনের মাথায়, মুন্না। বয়েসের ছেলে, কখন কি করে বসবে কে জানে? আমিও তো তোমাকে দেখে ভুলে-ছিলাম? গলায় একবার ফাঁস লাগলে আর তা খোলা যায় না।"

"এখন বুঝি পস্তাচ্ছ? দিল্লিকা লাড্ডু যো খায়া উওভি পস্তায়া, যো না খায়া উওভি পস্তায়া।"

ডোরিন মুন্নাদির কথাগুলো বোঝেনি, বুঝলে লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। বললাম, "আমার গলায় ফাঁস লাগাতে পারবে না কেউ সহজে, এণ্টনীদা।"

"আরে ভায়া তুমি ইচ্ছে করেও তো নিজের গলায় ফাঁস লাগাতে পার? এ-ফাঁস বড় মধুর ফাঁস। বেহেস্তের কোন হুরী এসে তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে কে জানে?"

মুন্নাদিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন অফিসে হারীণদা বললেন, "তোমার একবার বাইরে বেরোতে হচ্ছে, কাঞ্চন। কেবল কলকাতায় চেয়ার ঠেসে বসে থাকলে ব্যবসা চালানো যায় না।"

"কোথায় যেতে বলেন?"

"ব্যাঙ্গালোরের সিল্ক, চন্দনকাঠের জিনিস, হাতির দাঁতের জিনিস, কিছু-কিছু চালান দিতে চাই। ওখানকার ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রীজ মুথুস্বামী দাসাপ্পার কাছে চিঠি দেব। ও গ্লাসগোতে আমার সঙ্গে পড়েছে। মাইসোরও যেতে হতে পারে।"

"কবে যেতে বলেন?"

"পরশু?"

"ঠিক আছে। যেমন করে পারি ঠিক রওনা হব।"

"রোজ রিপোর্ট পাঠাবে, কি করলে।"

"ভুল হবে না, হারীণদা। যা বলবেন ঠিক তাই করব।"

"দাসাপ্পাকে একদিন লাঞ্চ কি ডিনারে নেমন্তন্ন কোরো।"

"মনে থাকবে।"

চায়ের সময় ডোরিনকে বললাম পরশু যেতে হচ্ছে কলকাতার বাইরে অফিসের কাজে। ওর শরীরটা এখনো খুব ভালো দেখাচ্ছে না। আমি জোর করে ওকে খাওয়াচ্ছি, চলে গেলে ও আবার খাওয়া কমিয়ে দেবে ভয় হয়। জিগগেস করলাম, "যাবে আমার সঙ্গে ডোরিন? চেঞ্জে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠবে। ওখানকার জলহাওয়া ভালো, নতুন জায়গায় মনটাও একটু ভালো লাগবে।"

"অনেক খরচা যে!"

"খরচার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। সে ভাবনা আমার।"

"তোমার কাজের অসুবিধে হতে পারে আমাকে সঙ্গে নিলে।"

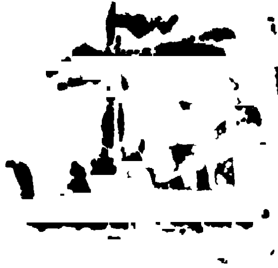
"কিছুমাত্র নয়। বরঞ্চ কাজ ভালোই হবে কোনো চিন্তা না থাকলে।"

আমি সত্যিই আশা করিনি, কিন্তু ও রাজী হল। বললাম, "চল তোমার ঘরে. দেখি গরম জামাকাপড় তোমার কি আছে। বাঙ্গালোর ঠাণ্ডা জায়গা, কিন্তু মাইসোরে হয়তো গরম পাবে।"

ও যা-যা বার করল তা সবল করে যাওয়া যায় না। বললাম, "অর্ডার দেবার সময় নেই ডোরিন, তৈরি জামাই কিনতে হবে। চলে এস আমার সঙ্গে, চৌরঙ্গীর অনেক দোকানে আজকালকার ডিজাইনের ভালো জিনিস পাওয়া যাবে।"

ডোরিনের শরীরের মাপটি বেশ ভালো। গরম শ্ল্যাক, জেপার কোট, ড্রেসিং-গাউন, উলের জাম্পার, যা পাওয়া গেল তা আশ্চর্য ফিট করেছে ওকে, যেন অর্ডার দিয়েই তৈরি। ওর পছন্দও হয়েছে এগুলো। ও-যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এগুলো ওর। বললাম, "স্লিপিং সুট আর যা-যা দরকার নিজেই পছন্দ করে কিনে নাও। কার্পণ্য কর না, সব অন্তত চারপ্রস্থ করে কিনো। সঙ্গে যথেষ্ট টাকা আছে ভাববার কিছু নেই। আমি ওদিকে অপেক্ষা করব।"

পোশাকের দোকানের দাম চুকিয়ে দিয়ে গেলাম জুতোর দোকানে। ওর জন্যে একজোড়া ভালো জুতো, একজোড়া স্লিপার আর একটা সুটকেস কিনে বাড়ি ফেরা গেল।



২৭

বাঙ্গালোরে পৌঁছে বেশ ফ্যাসাদে পড়া গেল। ওয়েস্টএণ্ড হোটেলই এখানে সব চেয়ে ভালো শুনেছিলাম। প্রথমেই সেখানে উপস্থিত হলাম। না, কোনো ঘরই খালি নেই। অতঃপর, আরো তিনটে হোটেলে। না, সেখানেও একই পরিস্থিতি। শুনলাম মিণ্টন নামে আরো একটা ভালো হোটেল আছে একমাইল দূরে। ট্যাক্সিওয়ালারই লাভ। নিয়ে চলল সেখানে। ওর বোধহয় মনে আশা সেখানেও কিছু জুটবে না, আরো ভাড়া উঠবে।

আজ যেন আমার রাহুর দশা, শনির অন্তর্দশা। মিণ্টনের ম্যানেজারনীও নিরাশ করলেন। বললেন, "না, কোনো ডাবল কামরা খালি নেই।"

"একটা সিঙ্গল ঘরে আরেকটা নেওয়ারের খাট পেতে দিলেই চালিয়ে নেব।"

"না তাও নেই।"

"তবে কি করা যায় বল তো? এই দেড় ঘণ্টা ঘুরছি।"

"কখন পৌঁচেছ এখানে?"

"সকাল সাতটায়।"

"কোথা থেকে আসছ মিস্টার... ?"

"সানিয়াল। কলকাতা থেকে।"

"কলকাতায় একবার যাবার ইচ্ছে আছে। বেশ সুন্দরী স্ত্রী তোমার। এখন সীজন শুরু হয়েছে, আগে রিজার্ভ করা উচিত ছিল।" ডোরিনের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে দেখলাম।

মহিলাটি বললেন, "একটি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলার কথা জানি, সে পেইং-গেস্ট্ রাখে, কিন্তু সেখানেও জায়গা আছে কিনা জানি না। বস একটু, দেখি কি করা যায়।"

আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে ভদ্রমহিলার বোধহয় একটু দয়া হল।

একজন বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "দেখে এস তো চোদ্দ নম্বরের ওরা কখন যাবে।"

ভদ্রমহিলা ডোরিনের মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। জিগগেস করলেন, "এদিকে এই প্রথম এসেছ মিসেস সানিয়াল?"

একে হোটেল থেকে হোটেলে গমন ও প্রত্যাগমন, তারপরে এখন মিসেস সানিয়াল বলে সম্ভাষণ, ডোরিনের কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। আমিই জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, এই প্রথম।"

এর পরের প্রশ্নটি উনি আমাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, কিন্তু ডোরিনের দিকেই তাকিয়ে, "তোমরা দুজনে একসঙ্গে এই প্রথম বেরিয়েছ না?"

ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট। উনি ধরেই নিয়েছেন যে আমরা সদ্যবিবাহিত, মধুচন্দ্রিকায় এসেছি। এর জন্যে দায়ী ডোরিনও কম নয়। লজ্জায় এত লাল হয়ে উঠছে কেন?

বললাম, "হ্যাঁ, এই প্রথম।"

সত্যি কথাই বলা হল। দুজনে একসঙ্গে তো এই প্রথমই বেরিয়েছি।

এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এবং আরো অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নের হাত থেকে বাঁচাল ঐ বেয়ারাটি, যে দৌত্যকার্যে চোদ্দ নম্বরে গিয়েছিল। বলল, "ম্যাডাম, ওদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে, দশটার সময় চলে যাবে, বিকেল পর্যন্ত থাকবে না।"

ম্যানেজারনী হাসিমুখে ভিজিটার্স বুক এগিয়ে দিলেন। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে ফসফস করে লিখে দিলাম মিস্টার আর মিসেস সানিয়াল।

মহিলা বললেন, "তোমাদের মালপত্র ট্যাক্সি থেকে নিয়ে আসবে এই লোক, এখানেই এখন থাক। ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তোমরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে এস। চোদ্দ নম্বর খালি হলেই জিনিসগুলো ওখানে পাঠিয়ে দেব।"

"ধন্যবাদ, মিসেস...?"

"মিস্ হ্যারিসন।"

ঘরটি পেলাম চমৎকার। দোতলায়। পাশাপাশি দুটো স্প্রীঙের খাটে ধবধবে বিছানা, মাঝখানে দুটি বেডসাইড ব্যুরো, তিন পাল্লা আয়নাওলা ড্রেসিং টেবিল, দুটো আলমারি, রাইটিং টেবিল, টিপয়, দুখানা চেয়ার, সোফাসেটী, কার্পেট, কাঁচের সেণ্টার-টেবল, বড় অর্ধচন্দ্রাকার জানলায় ফুলকাটা পর্দা, সিল্কের সেড দেওয়া গোটা তিনেক টেবললাম্প। সেণ্টার টেবিলে মস্ত বড় ফুলের তোড়া, তার সঙ্গে একটি

রঙিন কার্ডে লেখা : শুভেচ্ছা—দীর্ঘ ও সুখী হোক যুগল দাম্পত্য-জীবন ! জিগগেস করলাম, "ঘর পছন্দ হয়েছে, ডোরিন ? মনটা ভালো লাগবে ?"

"হ্যাঁ।"

"দেখে যাও কার্ডে কি লেখা আছে। আমাদের নবদম্পতী ভেবেছে।"

কার্ডটি পড়লো ও, তারপরে গালে হাত দিয়ে চুপ করে খানিকক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল, "কাঞ্চন আগে জানলে আসতাম না তোমার সঙ্গে। মিস্টার আর মিসেস লিখতে গেলে কেন ? আইনের চোখেও এটা তো ভীষণ দোষের ?"

"সেটা তোমার হাতে, ইচ্ছে করলেই ফাঁসিয়ে দিতে পার আমাকে। কিন্তু অন্য উপায় ছিল না। দায়ে পড়ে এই প্রতারণাটুকুর আশ্রয় না নিলে মাথা গুঁজবার আশ্রয় জুটত না। গোড়া থেকেই ভুল বুঝেছে মিস্ হ্যারিসন, সে ভুলটা ভাঙিনি, এই যা আমার দোষ, কিন্তু তুমি ক্ষমা করবে আশা করি।"

"কি মুশকিলে ফেললে আমাকে !"

"ডোরিন, জীবনটাই তো একটা থিয়েটারের স্টেজ ! সবাই এক-একটা পার্ট অভিনয় করে যাচ্ছে। ধরে নেও এটাও একটা অভিনয় করছি আমরা দুজনে।"

"অভিনয় নয়, প্রবঞ্চনা।"

"প্রবঞ্চনা নয়, বাস্তব-বুদ্ধি। সময়োচিত ব্যবস্থা। সকল অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে চলা, আপোষ করে চলাই জীবনের সারমর্ম। কিছুটা ছাড়তে হবে, কিছুটা কৌশল করে আদায় করতে হবে। জীবনটাই একটা আপোষ-মীমাংসার ধারাতে বইছে।"

"এটা তোমার বাস্তব বুদ্ধি নয়, বেকুবি। আগুন নিয়ে খেলা করাকে সময়োচিত ব্যবস্থা বলে না। আমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।"

"শান্ত হও ডোরিন, চট করে কিছু করতে নেই। আগুন যাতে আমাদের গায়ে না লাগে সে সম্ভাবনা ঠেকিয়ে রাখা আমাদেরই হাতে। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর বলেছিলে একদিন মনে আছে ?"

"আছে, এবং সে বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু সে বিশ্বাস রাখতে পারছি কই ?"

"সে বিশ্বাস ভেঙে যাবার কোনো কারণ দেখছি না।"

"পাশাপাশি খাটে কি শোয়া যায় ? হাত বাড়ালেই তো ছোঁয়া লাগে ? রক্ত-মাংসের শরীর আমাদের—ইটপাথরের গড়া তো নয়, কাঞ্চন ?"

"তুমি যদি নিজেকে ঠিক রাখতে পার তবে আমিও রাখতে পারব, আমার দিক দিয়ে তোমার কোনো ভয় নেই।"

"ভয় ছাড়া লজ্জাও তো আছে!"

"খুব সত্যি কথা। তোমার ও আমার শরীর যে আলাদাভাবে তৈরি সে বোধটুকু আমাদের চেতনায় রয়েই যাবে। তোমার যেমন লজ্জা করবে, আমারও তেমনি লজ্জা করবে, আমি বরঞ্চ বাইরের বারান্দায় চেয়ারে রাত কাটিয়ে দেব। ঘুম আমার খুব অনুগত দাস, কিচ্ছু কষ্ট হবে না। মাথা একপাশে কাত করলেই ঘুম এসে হাজির হবে।"

"আশেপাশের ঘরের লোকরা দেখুক, আর কানাকানিটা মিস্ হ্যারিসনের কানেও উঠুক, কেমন?"

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম এ-বিষয়ে আমাদের চাইতে মেয়েদের বুদ্ধি ঢের বেশি।

ডোরিন বলল, "পরের কথা পরে হবে কাঞ্চন, এখন জামাকাপড় ছাড়ি কোথায়?"

"কেন বাথরুমে? বেশ জায়গা আছে ওখানে, আয়নার নিচে কাঁচের সেল্‌ফে তোমার পাউডার ক্রীম সেণ্ট টুকিটাকি সাজিয়ে রাখ, বেসিনের পাশে সাবানের ট্রে আছে, কাপড় রাখবার আলনা আছে, ওটা তোমার ডিপার্টমেণ্ট করে ফেল। আমার যখন যাওয়ার দরকার হবে ঘুরে আসব।"

ডোরিন ওর সুটকেস খুলে সব বার করতে লাগল। কতক বাথরুমে, কতক ড্রেসিং টেবিলে, কতক আলমারিতে রাখল। তারপরে চলে গেল বাথরুমে স্নান করতে। বাথটবের কল খুলে দিয়েছে শব্দ পেলাম।

কিছুক্ষণ পরে খুট করে শব্দ হল। তাকিয়ে দেখি বার হয়ে এসেছে বাথরুম থেকে, গায়ে তোয়ালে জড়ানো, কোমরে আরেকটা তোয়ালে। মাথা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছে। দেখে চমকে উঠলাম। ডোরিন বলল, "চুলে কয়লার গুঁড়ো কিচ-কিচ করছে, তোমার কাছে শ্যাম্পু আছে?"

শ্যাম্পুর শিশিটা ওর হাতে দিলাম, ও বাথরুমে ফিরে গেল।

একটি ঘরের মধ্যে নিঃসম্পর্কিয়া এই যুবতীর সঙ্গে কদিন থাকব কি করে? একটি মাত্র ঘরের এই ঘনিষ্ট পরিসরে সব সময়ে তো আব্রু বজায় রাখা যায় না। পরনারীর এই সান্নিধ্যে আমি অভ্যস্ত নই। ওদের কতরকমের প্রয়োজন পুরুষের

চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে। তা ছাড়া আমি তো ওর কাছে পরপুরুষ? মাঝে-মাঝে একটু আব্রু আড়াল আমার নিজের জন্যেও দরকার নেই কি?

আমার মন বলল—আহাম্মক! এখন ভেবে আর কি হবে? ভাবা উচিত ছিল আগে। এর জন্যে তুমিই তো দায়ী? স্বামী-স্ত্রী বলে মিথ্যা পরিচয় দেবার দরকার ছিল কি? আর তুমি কি সত্যি বলছ যে এই সান্নিধ্য তোমার ভালো লাগছে না? যদি ভালো নাই লাগে তবে ঐ যৌবনধন্যা রূপসীটি যখন স্বল্পাবরণে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল তখন ও-ভাবে তার দিকে তাকাচ্ছিলে কেন?

জবাব দিলাম—মন, তুমি ভুল বুঝেছ, সে-দৃষ্টিতে কোনো লোভ ছিল না। ছিল কৌতূহল।

মন বলল—মনের অগোচর পাপ নেই, তা জানো কাঞ্চন? ওকে একান্তে তোমার এত কাছে পাবার ইচ্ছেটা কি মোহ নয়—নারীর প্রতি পুরুষের মোহ? ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ওর পেশা নৃত্যগীত, কুলে বংশে অর্থে শিক্ষায় কোনোদিক দিয়েই তোমার কাছাকাছি নয়, তবে কাছাকাছি থাকতে তোমার ভালো লাগে কেন? ও সুন্দরী বলে?

ডোরিন স্নান করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। পরনে স্ল্যাক, উলের জাম্পার, চুল এলোমেলো। একটি মিষ্টি সুবাসের গন্ধ নাকে এল। স্ল্যাক জাম্পারের আঁটসাট বন্ধনে ওর দেহের প্রতিটি ভাঁজ আরো ফুটে বেরিয়েছে। ডোরিন জিগগেস করল, "ওকি! চোখ বুজে আছ যে কাঞ্চন? তোমার শরীর কি খারাপ লাগছে?"

"ভাবছিলাম।"

"কি ভাবছিলে?"

"তোমার বড্ড অসুবিধে হবে এখানে।"

"যাও চান করে এস। গরম জলে গা ডুবিয়ে চান করে খুব আরাম হল।"

"বেশ শীত পড়েছে, না?"

"ওকি! তোমার সুটকেস এখনো খোলনি? দাও চাবি দাও, সব গুছিয়ে রাখি।"

ডোরিনের সামনে থেকে বাথরুমের নিভৃত আশ্রয়ে পালিয়ে যেন বাঁচলাম। বেসিনের উপরে আয়নার মুখ দেখে একটু চমকে উঠলাম। মনের মধ্যে যে ঝড় উঠেছে তার ছায়া পড়েছে আমার মুখে!

দুটো বড়-বড় তোয়ালে ঝুলছে আলনায়। একটা ভেজা, একটা শুকনো। মনে এল ডোরিনের তোয়ালে-পরা মূর্তি। শুকনো তোয়ালেটা ও স্নানের সময় ব্যবহার করেনি বোঝা গেল, আমার জন্যে রেখে দিয়েছে, কিন্তু এটায়েও তো ওর দেহবল্লরীর স্পর্শ রয়েছে। ওর অঙ্গের সুবাস জড়িয়ে আছে।

মন ধমক দিল—ও কি ভাবছ কাঞ্চন? এসব চিন্তা তো পাপ? তবে না ওর দেহের ওপর তোমার মোহ নেই?

স্নান হয়ে গেলে খালি গায়ে শুধু ট্রাউজার পরেই বেরিয়ে আসতে হল, পরিষ্কার গেঞ্জি নিয়ে যাইনি।

ডোরিন আমাকে খালি গায়ে দেখে বুঝতে পারল, আলমারি থেকে গেঞ্জি বার করে হাতে দিল। জিগগেস করল, "তুমি রোজ এক্সারসাইজ কর?"

"কেন বল তো?"

"তা না হলে শরীরের বাঁধ এমন হয় না।"

"রোজ সকালে পনেরো মিনিট।"

"এখানে কি করবে? দেখলে আমার হাসি পেয়ে যাবে।"

"তবে করব না।"

মধ্যাহ্নভোজনের পরে যেতে হবে সেক্রেটারিয়েটে, দাসাপ্পাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। রওয়ানা হবার আগে ডোরিনকে বললাম, "কাল রাতে মনে হল ভালো ঘুম হয়নি তোমার, একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"ঘুম কি আমার আছে? রাতে অনেকবার ঘুম ভেঙে যায়। জেগে বাটির কথা ভাবি। পুত্রশোকের কি জ্বালা তুমি কি করে বুঝবে?"

"চেষ্টা কর এখন ঘুমোতে পার কিনা। সেই ঘুমের ওষুধটা খাও।"

এককোটি টাকার উপর খরচা করে মাইসোর গভর্নমেন্ট নতুন সেক্রাটারিয়েট তৈরি করেছে। সারা ভারতেই সরকারী দপ্তরগুলি বৃদ্ধিলাভ করছে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায়। সেই সঙ্গে কর্মচারীর সংখ্যা, ব্যয়ভার ও করভার। কমেছে কার্যকুশলতা, নিয়মতান্ত্রিকতা, জনগণের প্রতি সংবেদনশীলতা, সততা। দুষ্টের শাসন হচ্ছে না, হচ্ছে তোষণ ও পোষণ। গান্ধিজীর রামরাজ্য স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ।

দাসাপ্পাসাহেবের কামরার কাছে যেতেই বেয়ারা বলল সাহেব ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে কনফারেন্সে গিয়েছেন। কনফারেন্স নামক এই রোগটি শাসনতন্ত্রে খুব প্রসারতা

লাভ করেছে দেশী আমলে। অনেক নতুন বিভাগ গজিয়ে উঠেছে, অনেক পুরনো বিভাগ ঢেলে সাজাই করা হয়েছে। এই শিকলি বাঁধা অবস্থার ফলে যে-কোনো ব্যাপারেই অনেকগুলো বিভাগের বড় কর্তা বা মেজোকর্তাদের একসঙ্গে হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কাজ মন্থর গতিতে চলে।

বৃটিসরাজতন্ত্র খতম হয়ে স্বদেশী গণতন্ত্র চালু হয়েছে ষোলো বছর আগে, কিন্তু শাসক-শাসিতের মনোভাবটি এখনো ঝেড়ে ফেলতে পারেননি ঐ কর্তাব্যক্তিরা। ওঁরা নিজেদের জনগণের ভৃত্য বলে ভাবতে শেখেননি, সেবক না হয়ে প্রভুই রয়ে গেছেন।

ঝাড়া দেড় ঘণ্টা বারান্দায় পাইচারি করে বেড়াতে হল অধীর প্রতীক্ষায়। চাপরাশীরা টুলে বসে বিড়ি ফুঁকছে, দর্শনার্থীদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য। প্রশ্ন করলে বসে-বসে জবাব দেয়, অথবা মোটেই জবাব দেবার ইচ্ছা দেখা যায় না। কারণ ওরাও এখন এই ওয়েলফেয়ার স্টেটে ক্লাস-ফোর অফিসার আখ্যা পেয়েছে। এদের অধিকাংশই নির্ধারিত পোশাক পরে না, যা-খুশি তাই পরে আসে। ফলে কারা বাইরে থেকে খোস গল্প করতে এসেছে, এবং কারা এখানকার বেতনভোগী চাপরাশী তা বেছে নেওয়া দুঃসাধ্য।

চারটের পরে দাসাপ্পা ফিরে এলেন তাঁর কোটরে। হারীণদার চিঠিটা আগেই ওঁর টেবিলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পড়ামাত্রই ডেকে পাঠালেন। বললেন, "তুমি হারীণের সহকারী? বেশ-বেশ। ও আমার বিশেষ বন্ধু। তবে মেম বিয়ে করবার ব্যাপারে আমার সঙ্গে বেশ ঝগড়াও হয়েছিল। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর ঝগড়া চটপট মিটে যায়, কোনো দাগ রেখে যায় না। গত বছর গিয়েছিলাম তোমাদের কলকাতায়, হারীণের বাড়িতেই ছিলাম, ও কিছুতেই হোটেলে উঠতে দিল না।"

"খুব ভালো লোক, খুব কাজের লোকও তিনি।"

"কাল এগারোটায় আসতে পার? আমায় ছুটতে হচ্ছে এখুনি মিনিস্টারের বাড়ি। অসুখের জন্যে কদিন অফিসে আসতে পারেন না, আমার হয়রানি। এরা ভোটের জোরে মিনিস্টার হয়, কাজকর্ম কিছুই বোঝে না, আমাদের ভোগান্তি করে ছাড়ে। জেল খাটা আর স্লোগান চেঁচানো এক কথা, শাসনতন্ত্র চালানো অন্য ব্যাপার। আমরা যারা ব্রিটিশ আমলে কাজ করেছি তারা এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি না।"



দাসাপ্পাসাহেবের বিলিতি বেশ। নেকটাই বর্জন করে গলাখোলা বুসসার্ট পরতে এখনো পারেননি। কিন্তু মাথায় জরিপাড় চাদরের পাগড়ি, নাকের মাথা থেকে কপালের সীমান্ত পর্যন্ত সুক্ষ্ম একটি রক্ত চন্দনের তিলক রেখা। বোধ হয় হারীণদার মতোই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম কিন্তু বিলেতের জলে এঁর ব্রাহ্মণত্ব ধুয়ে মুছে যায়নি। অথচ ব্রিটিশজাতের প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা এখনো যে অচল তা দূরাগত বন্ধু-সহকর্মীর কাছে প্রকাশ করে ফেললেন!

ভদ্রলোক জিগগেস করলেন, "কোথায় উঠেছ?"

"সেন্ট মার্ক রোডে মিন্টন হোটেলে।"

"তা হলে আমি যেদিকে যাচ্ছি তার উল্টোদিকে। মিনিস্টারটি থাকেন বাসব-গুণ্ডিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাপ নেই গায়ে, ছিলেন মাস্টারমশাই, মিনিস্টার হয়ে শহরের বাইরে বিরাট জমি কিনে নতুন কলোনী বসিয়েছেন, নিজে প্রকাণ্ড বাড়ি হাঁকিয়েছেন, নিজের নাম বাসবাপ্পা, কলোনীটার নাম দিয়েছেন তাই বাসব-গুণ্ডি। পাশের সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলে ভালো চাকরি হয় না, কিন্তু মিনিস্টার হওয়া যায়। কাল এগারোটায় এস, কেমন?"

বাইরে নেমে ট্যাক্সি পেতে বেশ কিছু ঘুরপাক খেতে হল। সর্বত্রই অভাব এবং সঙ্কট। কোনোটা বিকট, কোনোটা সবে প্রকট।

ট্যাক্সি অবশেষে মিলল, চলে গেলাম মহাত্মা গান্ধী রোডে। রাস্তাটির আগেকার নাম ছিল নাকি প্যারেড রোড। এমন একটা শহর নেই ভারতে যেখানে গান্ধিজীর নামে রাস্তা বা পার্ক হয়নি। কেউ মহাত্মাজীর আদর্শ মানছেন না, শুধু রাস্তাঘাটের মাধ্যমে এই মহান ব্যক্তির মান রাখছেন ঘটা করে।

ইংরেজ গোরা পল্টনের দৌলতে প্যারেড রোডের দোকানগুলো খুব ফেঁপে উঠেছিল, এখনো এটি ঠাটবাঁটে মাথা উঁচু করে রয়েছে। বিলাসপণ্যের বিবিধ ও বিচিত্র সম্ভার। একটা বইয়ের দোকান থেকে হাল্কা ধরনের দুটো বই কিনলাম ডোরিনের জন্যে; কিছু একটা নিয়ে না থাকলে ওর সময় কাটবে কেমন করে?

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হোটেলের বাতিগুলো ঝকমক করছে। ঘরে ঢুকে দেখি অন্ধকার। ডোরিন আলো জ্বালেনি এখনো। জিগগেস করলাম, "ঘুম হয়েছিল?"

"না।"

"চা খেয়েছ?"

"না।"

"একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলে ?"

"না। ইচ্ছে করল না।"

"শোনো ডোরিন, তুমি যদি সারাক্ষণ এমন ব্যাজার হয়ে থাক, চুপ করে থাক, তবে আমি এ-ঘরে টিকব কি করে ?"

কোটটা খুলে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে ওর পাশে বসে বললাম, "শোনো একটা গল্প বলছি : এক রাজার দুই রানী ছিল। একজনের নাম হাসি, আরেকজনের নাম কান্না। রাজা এক-এক রানীর সঙ্গে ছ-মাস করে থাকেন। যে ছ-মাস হাসির কাছে থাকেন সে ছ-মাস কেবলই হাসেন, রাজকার্যে মন দেন না। আবার যে ছ-মাস কান্নার কাছে থাকেন তখন কেবলই কাঁদেন, রাজকার্যে হাত দেন না। মন্ত্রীমশাই কিছুতেই বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা কি, গুপ্তচর লাগিয়ে ভেতরের খবরটি বার করে তিনি ছুট-লেন রাজবৈদ্যের কাছে, কারণ হাসি ও কান্না দুটোই বড় ছোঁয়াচে রোগ। রাজবৈদ্য বললেন—এ রোগদুটি সারানো আমার সাধ্য নয়, যান রাজগুরুর কাছে। তিনি মস্ত বড় তান্ত্রিক, পারলে তিনিই পারবেন, আর কেউ নয়। রাজগুরু বললেন—হাসি ও কান্না দুটোই ঘাড়ের ভূত। তাড়ানো যাবে। নিন এই মন্ত্র-পড়া জল, দাসীকে দিয়ে দু-রানীকেই আধা-আধি খাইয়ে দিন। ওরা দুজনেই স্বাভাবিক অবস্থা পাবেন, রাজামশাইরও সংস্পর্শ-দোষ কেটে যাবে।"

ডোরিন হেসে ফেলল। বলল, "আমার ঘাড়ের ভূত তাড়াতে পারবে ? তুমি তো মন্তর-তন্তর জানো না!"

"কে বললে জানি না ?"

সমস্ত সন্ধ্যেটা ডোরিন বেশ হাল্কা মনেই ছিল, ডিনার খেয়ে এসেই ঘুমিয়ে পড়ল।



২৮

ছ-দিন হয়ে গেছে বাঙ্গালোরে। দাসাপ্পা আমাকে অনেক তথ্য যোগাড় করে দিয়েছেন, প্রায় রোজই একবার যাই ওখানে। তাছাড়া বড়-বড় দোকান, কারখানা, পাইকারদের কাছেও ঘুরে-ঘুরে অনেক খবর যোগাড় করেছি। মোটা নোটবুকটা আমার অর্ধেকের বেশি ভরে উঠেছে। রোজ ডিনারের পরে হারীণদার কাছে রিপোর্ট লিখি, ডোরিন ঘুমিয়ে পড়ে।

মনটা ওর একটু সতেজ হয়ে উঠেছে এ-কদিনে। স্থান পরিবর্তনের গুণ আছে বইকি। শরীরটাও বেশ সেরেছে। রোজ বিকেলে আমার সঙ্গে চা খাবে বলে বসে থাকে, আমার জামাকাপড় আলমারিতে গুছিয়ে রাখে। পরের দিন সকালে দেখি কি পরে বেরুব ঠিক করে রেখেছে। কখন কি দরকার হবে বুঝে সব হাতের কাছে গুছিয়ে রাখে। মেয়েলি হাতের এই নীরব সেবাটুকু আমার কাছে একেবারেই নতুন, তাই বেশ ভালো লাগছে।

একটা কিছু কাজকর্ম নিয়ে থাকা ওর পক্ষেও ভালো। তাই ইচ্ছে করে আলসে সেজে বেশ ফাইফরমাশ চালাই। ওর অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

বিকেলে যাতে বাধ্য হয়ে বেড়াতে যায় সেজন্যে কোনোদিন বলি একটা অডি-কোলন নিয়ে এস, কোনোদিন বলি সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, কোনোদিন বলি বলপেনের রিফিল দরকার।

মোড়ের মাথায় একজন এম. আর. সি. পি. ডাক্তারের চেম্বার। কলকাতার বিলিতি ডিগ্রীধারী ডাক্তারের হাঁক ষোলো কিম্বা বত্রিশ টাকা, এখানে মাত্র পাঁচ। একদিন সেখানেও যেতে বললাম, দেখিয়ে আসুক না। পাশ্চাত্য দেশের লোকরা মাঝে-মাঝে অসুখ না থাকলেও ডাক্তারের কাছে শরীর যাচাই করিয়ে আসে, খরচাটা গ্রাহ্য করে না। আমাদের দেশে রোগশয্যায় না পড়লে কেউ ডাক্তার ডাকে না।

ডাক্তারটি বললেন, রক্তস্বল্পতায় ভুগছে, দীর্ঘকাল টনিক খেতে হবে। একটা টনিকের নামও লিখে দিলেন।

যেদিন দাসাপ্পা সাহেবকে মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিমন্ত্রণ করলাম সেদিন একটু সমস্যায়ই পড়তে হয়েছিল। অবশেষে ঠিক হল ডোরিন বাইরে কোনো রেস্টরাণ্টে গিয়ে খেয়ে আসবে। আমি দাসাপ্পাকে একেবারে অফিস থেকে সঙ্গে এনে সোজা খাবার ঘরে নিয়ে যাব এবং খাওয়া হলে ওখান থেকেই বিদায় দেব। এঘরে আনা চলবে না, কারণ শ্রীমতী সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও ওর অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এখানে।

আজ ভোর-ভোর সময়ে দেখি ডোরিন জেগেছে। আমারও ঘুম ভেঙেছে দেখে ও ডাকল, "কাঞ্চন!"

"ম্যাক আমাকে 'কনি' বলে ডাকে, তুমিও তাই ডাকতে পার। তোমাকে আমি ডাকব 'ডো'।"

"দুটি নামই বেশ হল কাটছাঁট দিয়ে। কনি আর ডো। শোনো..."

"কি বলতে যাচ্ছিলে?"

"তুমি পরীক্ষায় ভালোভাবেই পাশ করেছ, কনি। তুমি এঞ্জেলই বটে।"

"সার্টিফিকেটটা লিখে দিও।"

"সত্যিই বলছি তোমার সঙ্গে এভাবে থাকতে আমার আর লজ্জা বা ভয় হচ্ছে না।"

কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে ওর খাটে বসলাম। ওর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললাম, "ডো, তোমার কাছে আমারও আর কোনো সংকোচ নেই, তোমাকেও আমি চিনেছি, তুমিও একটি এঞ্জেল। আমি ডানা-কাটা এঞ্জেল, তুমি ডানা-ওয়ালা এঞ্জেল। পরীক্ষায় শুধু আমি একা পাশ করিনি, দুজনেই পাশ করেছি।"

পুরুষের পক্ষে এটা যে কত কঠিন সংগ্রাম তা ও কি করে বুঝবে? সৃষ্টিরক্ষার জন্যে প্রকৃতি পুরুষকে যে দুর্বার প্রবৃত্তি দিয়েছেন তা রোধ করতে গেলে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। জয়-পরাজয়ের চরম মুহূর্ত এখনো আসেনি। ও জানে না যে গতরাতেও আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে ঘণ্টা দুই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসেছিলাম। কঠিন তপস্যামগ্ন বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করেছিল অপ্সরী মেনকা, স্বয়ং শিবের ধ্যানভঙ্গ

করেছিলেন পার্বতী, আদিমানবী ইভের মোহে পতিত হয়ে আদিমানব অ্যাডাম স্বর্গচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হলেন মর্ত্যে। পরীক্ষায় যে পাশ করে গেছি তা এখনো বলা যায় কি ?

"কি ভাবছ, কনি ?"

"ভাবছি কোথায়-কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব কাল। সকালেই আমার কাজ সেরে ফেলব, দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একখানা গাড়ি যোগাড় হয়েছে। দুপুরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।"

বয় চা নিয়ে এল। স্লীপিংস্যুট ছেড়ে, খালি গায়ে, শুধু জাঙ্গিয়া-পরা অবস্থায় বাথরুমে চলে গেলাম দাঁত মাজতে। ওর সামনে আগের মতো এখন আর সংকোচ বোধ হয় না। পুরুষের নগ্নবুক নারীর দৃষ্টি সহ্য করতে পারে!

চা খেতে-খেতে বললাম, "পরশুর প্রোগ্রাম শুনতে চাইলে না ?"

মেরুনরঙের শোবার পোশাকটি ওকে খুব মানিয়েছে। দেহবর্ণ আরো ফুটিয়ে তুলেছে, অঙ্গসৌষ্ঠব ফেনিয়ে তুলেছে। শীতের হিমেলস্পর্শে গালদুটি আপেলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। ডোরিন বলল, "আগে একটা জামা গায়ে দিয়ে এসো, তারপর বল পরশুর প্রোগ্রাম, না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

"খালিগায়েই ভালো লাগছে আমার। রক্ত আমার গরম, রক্তস্বল্পতায় তোমার মতো ঠাণ্ডা নয়। পরশু সকালের ট্রেনে যাচ্ছি মাইসোর, তারপর সোজা কলকাতা।"

কলকাতার নাম শুনে ও একটু মুষড়ে পড়ল। পড়বারই কথা। কলকাতায় ওর জীবন বৈচিত্র্যহীন, অস্বচ্ছলতার কণ্টকে কণ্টকিত। হোটেলের এই বিলাসপূর্ণ স্বচ্ছন্দ পরিবেশ ওর কাছে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এখানে ওর পুত্রশোকটা চাপা পড়ে গেছে নতুন পরিবেশের আড়ালে, কলকাতায় ফিরে গেলে আবার নতুন করে দেখা দেবে। জিগগেস করল, "কদিন থাকতে হবে মাইসোরে ?"

"বড় জোর তিন দিন।"

ডোরিনকে দুপুরবেলা ঘুরিয়ে আনার বন্দোবস্ত করেছি যাতে কাণ্ডসনদের নজরে না পড়ে যাই। ওদের সঙ্গে দেখা করা উচিত ছিল, ঠিকানাও সঙ্গে আছে, কিন্তু ডোরিনকে সঙ্গে এনেছি, ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। দেখা হলে হয়তো হোটেলেই একদিন এসে হাজির হবে, তখন কি করব ? দুপুরবেলা দাসাপ্পাও থাকবে অফিসে, সুতরাং এ সময়টিই বেশ নিরাপদ।

কাবনপার্ক, লালবাগ, অ্যাসেমব্লী হাউস, টাটা ইনষ্টিটিউট, হিন্দুস্তান এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট ফ্যাক্টরী, সেণ্ট স্টিফেন গীর্জা দেখে ও খুশি হল। গীর্জায় কিছুক্ষণ প্রার্থনাও করল নতজানু হয়ে।

চা খেয়ে ও গোছগাছ করতে লেগে গেল। সিগারেট খেতে-খেতে দেখছিলাম কি সুন্দর গোছাতে পারে। এটা মেয়েদেরই কাজ। পুরুষরা অত নিপুণভাবে সব ভাঁজ করতে পারে না। কোথায় কোনটা রাখলে ভালো হবে বোঝে না ওদের মতো।

ডোরিন বলল, "যা পরে যাবে, তাই শুধু বাইরে রেখেছি, কনি। কর্ডুরয় ট্রাউজার, সার্ট, পুলোভার। কাল সকালে উঠে তোমার স্লীপিংস্যুট আর বাদবাকি সব ভরে ফেলব। এখন দাও তো তোমার টাকাপয়সা কি আছে? দুখানা দশ টাকার নোট তো এরই মধ্যে হারিয়েছ বললে? নিশ্চয়ই ভাড়া দেবার সময় ট্যাক্সিতে ফেলে এসেছিলে সেদিন। আরো কিছু খোয়া গেছে তোমার?"

"না।"

ওর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একখানা একশো টাকার নোট বার করে আমার সামনে ধরল ডোরিন, বলল, "এটা কার?"

"বোধহয় তোমার?"

"মোটে গোটা পনেরো টাকা নিয়ে কলকাতা থেকে বেরিয়েছি।"

"তবে বোধহয় আমার। কারণ পনেরো টাকা ডিম পাড়তে-পাড়তে এ-কদিনে একশো হতে পারে না।"

"পরশুদিন কাজে বেরোবার সময় পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল তোমার, দরজার কাছে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

"স্যুটকেসের পাউচে কিছু পাবে, কোটের পকেটে ওয়ালেট আছে, রাইটিং টেবিলের দেরাজটাও খুঁজে দেখ।"

ডোরিন সব শুনে, কতক রাখল আমার স্যুটকেসে, কতক ওর স্যুটকেসে, কতক ওর হ্যাণ্ডব্যাগে, আর মাত্র দুশোটাকা আমার ওয়ালেটে। বলল, "কখনো এতটাকা নিয়ে বেরোতে হয়? সেজন্যেই তো হিসেব থাকে না!"

"দুশো টাকায় হবে না আমার। হোটেল বিল, বয়েদের বকশিশ, টিকিট, ট্যাক্সি ভাড়া, কুলিভাড়া আছে।"

"হোটেল চার্জ কত এখানে ?"

"রোজ বেয়াল্লিশ।"

"এত ? তবে নাও আরো দেড়শো। টিকিটের দাম, কুলি, ট্যাক্সি আমি সব দেব হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে বার করে।"

"তবে সাড়ে তিনশোই ভিক্ষে দাও। বাকি টাকা নিয়ে যেন ভেগে যেও না।"

"ভেগে যেতেও পারি, কনি। হুঁশিয়ার থেক। বেড়ালের পাহারায় দুধের বাটি।"

শহর মহীশুর ওরেফ মাইসোরেই মহীশুর রাজ্যের রাজবংশের বাস। ইংরেজী আমলে প্রত্যেক বড় দেশীরাজ্যে মহারাজাদের ওপর নজর রাখতে এবং হুমকীবাজী করতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট থাকত। অথচ এই হাতি পোষার ব্যয়ভার বহন করতেন মহারাজা। ব্যবস্থাটি মন্দ নয়। এই রেসিডেণ্টদের শ্যেন দৃষ্টির বাইরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে এবং খুশিমতো ফুর্তি করার লোভে সে-আমলের অনেক রাজা মহারাজাই বছরের কয়েকমাস ইয়োরোপে কাটাতেন। মহিষমর্দিনী চামুণ্ডেশ্বরীর উপাসক মহীশুর রাজবংশ গোঁড়া হিন্দু, কালাপানি পার হয়ে তাঁরা কস্মিনকালেও পাপ সঞ্চয় করেননি, তাই ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের আওতা বাঙ্গালোর থেকে একশো কিলোমিটার দূরে মাইসোরেই থাকতেন।

রেসিডেণ্টের সাঙ্গপাঙ্গ ও গোরাফৌজের দৌলতে বাঙ্গালোরের সমৃদ্ধি ফুলে-ফেঁপে উঠল। দেশী আমলেও এ-শহরটা হয়ে উঠল মাইসোর রাজ্য সরকারের সদর মহল। শাসনতন্ত্রের এই পীঠস্থান ক্রমে হয়ে উঠেছে শিল্পতন্ত্রেরও একটি তীর্থভূমি। কিন্তু মাইসোর শহরের ধমনীতে কোনো নতুন রক্তের জোয়ার আসেনি, পাহাড়ের তলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিবেশে এর প্রাণশক্তি মন্থরভাবে চলছে।

হোটেল মেট্রোপোল এখানকার সবেধন নীলমণি বিলিতি ধরনের হোটেল। বাঙ্গালোরে যত লোক যায়, মাইসোরে তত লোক আসে না। আসে বেশির ভাগই স্বদেশের এবং বিদেশের ভ্রমণবিলাসীরা।

দুটো আলাদা কামরা পাওয়া গেল। মাঝখানে আর তিনখানা ঘর। এবার আর মিস্টার ও মিসেস বলে মিথ্যা পরিচয় দিতে হল না। বিবেকের কাছে খালাস।

ভদ্রলোক রিসেপশনক্লার্ক ঘুঘু লোক। টুরিস্ট শহরগুলোর ভালো-ভালো হোটেলে পরকীয়ার লীলাভূমি। যুবক-যুবতীদের কথা ছেড়ে দিলেও, চলে বিগত যৌবন ও বিগত যৌবনাদের ম্লান দীপ শিখায় স্নেহদানের নব-নব প্রয়াস।

এ ব্যাপারে ভারতীয়দের পথ দেখিয়েছে বিদেশী টুরিস্টরা। পঞ্চ-'ম'কারতন্ত্রের অনেক সাধনেই ওরা জ্ঞানালোক বিকিরণ দ্বারা আমাদের চক্ষুদ্বয় উন্মিলিত করে উচ্চমার্গের সন্ধান দিয়ে গেছে গুরুর আসনে বসে।

কেরানীটি ফিসফিস করে বলল তুজনের জন্তে একটা বড় কামরাও পেতে পারি। ডোরিন প্রস্তাবটা নাকচ করে দেওয়ায় ভদ্রলোক উপরীর এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল দেখে নিরাশ হল। অতিথিদের ছোটবড় অনেক সঙ্গত-অসঙ্গত প্রয়োজনের সুবিধা-সুরাহা করে দিয়ে এরা বেশ কিছু পকেটে তোলে।

ডোরিনকে তার ঘরে পৌছে দিয়ে বললাম, "লাঞ্চের খুব দেরি নেই, তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে আমার ঘরে এস, ততক্ষণ আমিও তৈরি হয়ে নেব।"

আজ রবিবার। কাজকর্ম আমার বিশেষ কিছু হবার আশা নেই। মধ্যাহ্নভোজের পরে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে বেরিয়ে পড়লাম ডোরিনকে নিয়ে। মহারাজার মোটর গ্যারাজ, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা দেখে সন্ধ্যের কাছাকাছি চলে গেলাম কৃষ্ণরাজাসাগর বাঁধ এবং বৃন্দাবন কাননে। মহীশুর রাজ্যের সুসন্তান বিখ্যাত ইঞ্জি-নিয়ার শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ার অপূর্ব কীর্তি এই সেতুবন্ধ ও প্রমোদ্যান। কাবেরী নদীর উন্মত্ত জলরাশিকে বাঁধ বেঁধে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই স্রোত-ধারা থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সারা মহীশুর রাজ্যে বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে একটি গ্রামও এই বর্তমান সভ্যতার বিজলীশক্তি হতে বঞ্চিত না হয়। ফলে কুটিরশিল্প, যন্ত্রশিল্প ও শ্রমশিল্পের অসাধারণ উন্নতি এখানে অতি সুস্পষ্ট।

আমেরিকার বিখ্যাত টেনেসীভ্যালি-পরিকল্পনার বহু আগে শ্রীবিশ্বেশ্বরায়া অপূর্ব প্রতিভাবলে প্রমাণ করে গিয়েছেন ভারতীয় মণীষার এই বিস্ময়কর সাফল্য—দুর্বার নদীস্রোতকে কিভাবে আয়ত্তে এনে কৃষিশিল্প প্রভৃতি জনকল্যাণ কর্মে নিয়োজিত করা যায়। দামোদরভ্যালীর তিলায়া, পাঞ্চেৎ, দুর্গাপুর বাঁধ, বোখারোর বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতির পথপ্রদর্শক টেনেসীভ্যালী নয়, মৌলিক কৃতিত্ব শ্রীবিশ্বেশ্বরায়ারই প্রাপ্য। বহুকালের পরাধীনতায় মোহচ্ছন্ন আমরা দেশীয় প্রতিভাকে উপযুক্ত সম্মান না দেখিয়ে বিদেশীর কৃতিত্বকে বাহবা দিতে শিখেছি।

বাঁধের পাশেই বৃন্দাবন কানন। শ্রীবিশ্বেশ্বরায়া শুধু বস্তুবিদ্যারই পূজারী ছিলেন না, সৌন্দর্যেরও উপাসক ছিলেন মনে হয়। বৃন্দাবন কানন তাঁর সৌন্দর্যসৃষ্টির অপূর্ব অবদান, স্বর্গের নন্দন কাননেরই মতো বিস্ময়কর। প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আলো-

গুলো জেলে দেওয়া হয়। ফোয়ারাগুলির লাল নীল হলদে সবুজ রঙের জলোচ্ছ্বাস এক স্বপ্নরাজ্যের শোভা বিকীর্ণ করে। সমস্ত কাননটি হয় বিবিধ রঙের আলোক সজ্জায় নয়নানন্দদায়িনী।

ডোরিন আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে আছি। যেখানে এমন অপরূপ শোভার পরিবেশন চলেছে চারধারে, সেখানে কথা হারিয়ে যায়, মন আবিভূত হয়। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল জানি না। ওর একটি হাত আমার হাতে টেনে নিয়ে বললাম, "এই স্বপ্নলোকে আমরা দুটি যেন কোনো অশরীরী জীব। যেন সুখ বলে কিছু নেই, দুঃখ বলেও কিছু নেই, আছে শুধু আনন্দঘন পরম শান্তি। আছি শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নেই, শুধু তুমি আর আমি।"

ওর যেন সম্বিৎ ফিরে এল, কিন্তু মুখে রক্তের লেশ নেই, কাগজের মতো শাদা! বলল, "চুপ কর কনি, এতখানি আনন্দ আমার সহ্য হবে না, ভয় হয়। এখান থেকে নিয়ে চল আমাকে, না হলে ঐ নদীর জলে ডুবে মরতে দাও।"

"এসব কি বলছ, ডো?"

"তুমি বুঝবে না, বুঝবে না, জিগগেসও করো না।"

হোটেলে ফিরবার সময় সারাপথ ও ট্যাক্সির এককোণে নিঃশব্দে বসে রইল। ও রাত্রে ভালো করে খেতে পারলে না, হুঁ-হাঁ ছাড়া কোনো কথার জবাব দিল না। খাবার পরে সোজা চলে গেল ওর ঘরে, সঙ্গে-সঙ্গে দরজা বন্ধ করে দিল।

কি আর করা যায়? আমিও চলে এলাম আমার ঘরে, সিগারেট ধরিয়ে বসে পড়লাম। ওর হঠাৎ এমন ভাবান্তর হল কেন?

বেশি মাত্রায় সুরা পান করলে কেউ খুব আনন্দে থাকে, কেউ কাঁদতে শুরু করে, কেউ গালাগাল দিতে থাকে, কেউ অকারণে রেগে যায়। বৃন্দাবন কাননের উচ্ছল আনন্দ মুখরতা কি ওর দুঃখদগ্ধ মনে সেরকম একটি বিপরীত ভাব সঞ্চার করেছে? অথবা ওর অবচেতন মানসের কোনো সুপ্ত বাসনা বর্ণালী আলোকচ্ছটায় এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে যার সংবেগে ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে? ওখানে ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমার মনেও কি উত্তাল তরঙ্গ ওঠেনি? ইচ্ছা হয়নি ওকে গভীর আলিঙ্গনে বুকে টেনে নিতে?

বেল টিপে বয়কে হুকুম দিলাম এক পেগ ব্র্যাণ্ডি আনতে। আমিও ভুলতে চাই, ভুলতে চাই আমাকে, ভুলতে চাই বৃন্দাবন কাননের এই সন্ধ্যাটিকে।

ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে দুটো এ্যাসপ্রিনের বড়ি গিলে ফেললাম। ঘুমের সাধ্য নেই আজ আমাকে এড়িয়ে যেতে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

"কনি, কনি!"

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। জানলার কাছে ডোরিন দাঁড়িয়ে, বাইরে রোদের আলো! দরজা খুলে দিলাম। ডোরিন জিগগেস করল, "কৌচেই শুয়ে আছ সারারাত? পোশাক না ছেড়েই?"

"বড্ড ঘুম পেয়েছিল।"

"এ গ্লাসে কি ছিল? সত্যি করে বল?"

"ব্র্যাণ্ডি।"

"কটা খেয়েছিলে?"

"দুটো।"

"আর কি খেয়েছিলে?"

"এ্যাসপ্রিন দুটো ট্যাবলেট।"

ডোরিন আমার কোট সার্ট গেঞ্জি খুলে ফেলে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেল। মাথায় অনেক করে জল ঢেলে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল। বয়কে ডেকে চা আনিয়ে বলল, "চা খাও।"

ব্রেকফাস্টের সময় ও স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলল। একটিবারও জিগগেস করল না এ্যাসপ্রিন খেয়েছিলাম কেন। তারপর বলল, "কনি আজ তোমার বেরোতে হবে কাজে? না বেরোলে হয় না?"

"না, মিস্টার দাসাপ্পা ফোন করেছিলেন এখানকার গভর্ণমেণ্ট সিল্ক কোও-পারেটিভের ম্যানেজারের কাছে, ওরা গাড়ি পাঠাবে দশটার সময়, ওখানেই দুপুরের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। জায়গাটা শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে।"

"কবে এখান থেকে যেতে হবে?"

"কাল রাত এগারোটার ট্রেনে।"

"বেশ ছিলাম, কলকাতা যেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না।"

কলকাতার জীবন ওর কাছে খুব সুখের নয় জানি। আমারও খুব ভালো লাগছে বাইরে বেরিয়ে। বললাম, "আমার তো চাকরি আছে, ফিরতেই হবে, তুমি কয়েকদিন থেকে যাও না এখানে?"

"না, না, না, না, একা আমি থাকতে পারব না এখানে।"

"তুমি তো বাঙালীঘরের মেয়ে নও, কেন পারবে না?"

"একা-একা খুব খারাপ লাগবে।" কথাটা বলে ফেলেই ও লজ্জা পেল আমার সাহচর্য ওর ভালো লাগে এ-স্বীকৃতি দুর্বল মুহূর্তে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়বে ও আগে বুঝতে পারেনি। কিন্তু মানুষের মন একদিকে যতই শক্তিমান, অন্য দিকে ততই দুর্বল, একটু অসতর্ক হলেই মনের গোপন কথাটিও ফাঁস হয়ে যায়। আমি হাসছি দেখে ও রেগে গেল। আমার ওপর রাগ? না ওর নিজের ওপর রাগ?

গভর্ণমেণ্ট সিল্ক কোওপারেটিভের ম্যানেজারটি খুব ভদ্র। মালয়, জাপান এবং হংকং-এ উনি এ-বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। প্রতিষ্ঠানটি মস্ত বড়, চার-পাঁচখানা গ্রাম অনায়াসে এর মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যায় তাই পদব্রজে ঘুরে দেখা সাধ্যাতীত বলে একখানি জীপগাড়ির ব্যবস্থা রয়েছে। কোথাও সিল্কের গুটিপোকার চাষ হচ্ছে, কোথাও বিজলীর তাপে গুটিগুলোকে আরো বড় করা হচ্ছে; কোথাও গরম বাষ্পে পোকা থেকে সুতো ছাড়ানো হচ্ছে, কোথাও সুতো মাকুতে জড়ানো হচ্ছে; শেষে আবার মাকুগুলো পাঠানো হচ্ছে আর এক জায়গায় সুতোগুলি উজ্জ্বলতা সমৃদ্ধি করার জন্যে।

ম্যানেজার বললেন, "এখন এ পর্যন্তই থাক মিস্টার সানিয়াল। খাবার সময় হয়েছে। ও-বেলা তাঁতে যেখানে রেশম বোনা হচ্ছে সেখানে নিয়ে যাব।"

খাঁটি দক্ষিণী খাদ্য। মাছমাংসবর্জিত নারিকেল তৈল পক্ক। নাক বুজে খেয়ে ফেললাম। খাবার পরে গেলাম তাঁত ঘরে, যেখানে নক্সা আঁকা আর কাপড় ছাপানো হচ্ছে সেখানে। রেশমের কত রকমের কোয়ালিটি, কিভাবে চিনতে হয়, কোনটার বাজারে কত চাহিদা, দামের হার সব টুকে নিতে নোটবইটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেল। রেশমের ব্যাপারে আমাকে আর কেউ ধাপ্পা দিতে পারবে না।

যে গাড়িটায় গিয়েছিলাম সেটাই আবার আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে দিয়ে গেল বিকেল ছ-টায়। সোজা চলে গেলাম ডোরিনের ঘরে। জিগগেস করলাম, "চা খেয়েছ, ডো?"

"তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।"

"তবে বয়কে ডেকে বল দুজনের চা এখানে দিয়ে যাক, আমি অফিসে দেখে আসি কোনো চিঠি এসেছে কিনা।"

দুপুরের খাওয়াটা ভালো হয়নি, তাই গরম চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে একটু চাঙ্গা হওয়া গেল। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, অকালের বৃষ্টি। যাক বাঁচা গেল, যা গরম পড়েছিল।

"ডো, তুমি নিজেকে বল অপয়া, কিন্তু আমি দেখছি তুমি খুব পয়মন্ত। যে জন্যে এ তল্লাটে এসেছিলাম তা খুব ভালোভাবেই হয়ে গেছে আর বিশেষ কোনো কষ্টও করতে হয়নি।"

"তুমি নিজেই পয়মন্ত, ভাগ্যবান বাপের ভাগ্যবান ছেলে!"

"কাল সারাদিন সারাসন্ধ্যে কোনো কাজ নেই, দুজনে শুধু গল্প করে কাটানো যাবে। কেমন?"

"বেশ তো।"

"কলকাতায় ফিরে গেলে তোমাকে এরকম কাছাকাছি আর পাওয়া যাবে না।"

"হুঁ।"

"দুজনের কাছ থেকে দুজনকেই বেশ দূরে সরে যেতে হবে।"

"হুঁ।"

বৃষ্টি বেশ জোরে পড়ছে, সেই সঙ্গে জোর হাওয়া। জানলার পর্দা উড়ছে, ডোরিনের চুল নিয়ে খেলা করছে অশান্ত হাওয়া। গম্ভীর হয়ে গেছে ও, কি যেন ভাবছে।

"ডো, কিছুদিন ধরে একটা কথা ভাবছি।"

"কি কথা?"

"কলকাতায় ফিরে গিয়ে তুমি আর আলাদা সংসারী করতে পাবে না।"

"তবে কি করব?"

"আমার সঙ্গে থাকবে, আমরা ও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব। কেমন?"

কি জানি কেন ডোরিন একেবারে ফোঁস করে উঠল, চোখে আগুনের হল্কা। বলল, "কাঞ্চন সানিয়াল! কি বলতে চাও খুলেই বল না, আর ভালো মানুষের মুখোশ পরে থেক না। পুরুষজাত আগাগোড়া পাজি—কেউ বেশি, কেউ কম। টাকা দিয়ে তুমি আমাকে কিনতে চাও?"

"ভুল বুঝো না ডো।"

"ভুল করেছিলাম। তোমাকে যা ভেবেছিলাম তা তুমি নও, এখন সে ভুল ভাঙতে যাচ্ছে।"

ডোরিন কাঁপতে-কাঁপতে আমার পাশ থেকে উঠে যাচ্ছিল, হাত ধরে টেনে বসালাম। বললাম, "শোনো ডার্লিং, ভুল আগে করনি, এখনি করছ।" ও আবার উঠে যাবার চেষ্টা করছে দেখে এক হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বসিয়ে বললাম, "শোনো ডো, দয়া করে। মিস্ ডোরিন গ্রে কি মিসেস ডোরিন সানিয়াল হতে পারে না? তুমি ক্যাথলিক, নিজের ধর্ম ছাড়তে পারবে না জানি, আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী আছি। ক্যাথলিক ফাদারদের কাছে স্কুলকলেজে পড়েছি, বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ছিল ক্যাথলিক, খৃষ্টধর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, বিবেকের কাছে দোষী হব না জেনো।"

ডোরিন আমার বুকে মাথা রেখে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "কনি, আমাকে ক্ষমা কর, আমি ভুলই বুঝেছিলাম তোমার প্রথম কথাটা। যাকে দেবতার আসনে বসিয়েছি, তার মুখে হঠাৎ ও-কথাটা শুনে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। রাগে দুঃখে বেসামাল হয়ে গেলাম। আমাকে ক্ষমা কর কনি। তুমি এত মহৎ বুঝতে পারিনি।"

"এখন তো জানলে কি বলতে যাচ্ছিলাম? বলি-বলি করেও এ কথা বলতে পারিনি তোমায় এতদিন, কিন্তু তুমি আমার মন বোঝোনি।"

"প্রথমে হয়েছিল রাগ, এখন দেখ আমার বুকে কি রকম ঝড় উঠিয়ে দিয়েছ তুমি। হয়তো সত্যিই তোমার মন বুঝিনি, নিজের মনও বুঝতে পারিনি।"

ও আমার একখানা হাত ওর বুকে চেপে ধরল। হৃৎপিণ্ড খুব দ্রুত চলছে, সেই দুরন্ত রক্তের তরঙ্গে ওর মুখ হয়ে উঠছে রক্তিমবর্ণ। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না, আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণের মতো নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিলাম ওর চোখে, গালে, ঠোঁটে, ললাটে। আমার কোলে মাথা রেখে ও কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।



২৭

কলকাতায় ফিরে আসার পর ডোরিন একদিন আমাকে বলল, "তা হয় না, কনি। নিজের ধর্ম, নিজের সমাজ থেকে তোমাকে আমি কেড়ে নিতে পারব না। এত স্বার্থপর আমি হতে পারি না।"

"আমার সমাজ নেই, আমার কেউ নেই, যে ধর্মে আমি জন্মেছি তার ওপরও আমার খুব বিশ্বাস নেই।"

"বাঙালী মেয়ে বিয়ে করলে তোমার অনেক স্বজন বান্ধব জুটে যাবে, সমাজ-জীবন গড়ে উঠবে, তুমি সত্যিকারের সুখী হবে।"

"তোমাকে না পেলে আমি কোনোদিনই সুখী হতে পারব না, তুমি কি এখনো আমার মনের খোঁজ পাওনি?"

"যা পেয়েছি তোমার কাছে তা জীবনে আর কারু কাছে পাইনি, কিন্তু প্রতি-দানে কি বেইমানি করব তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে? আমি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, আমি ক্যাবারে গার্ল, আমাকে বিয়ে করলে তোমার চাকরিরও আশঙ্কা আছে, বিলিতি অফিসে এ ধরনের বিয়ে ভালো চোখে কেউ দেখে না। আমি দুটো ঘটনা জানি বলেই 'না' বলছি।"

"চাকরি করি শখ করে, জীবিকার জন্যে নয়। বাবা এত টাকা রেখে গেছেন যে চাকরি না করলেও সারাজীবন আমার খুব ভালোভাবেই কেটে যাবে।"

"লোকে বলবে টাকার লোভে তোমাকে বিয়ে করেছি, ছিঃ! নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"

"তোমার বয়েস এই মোটে চব্বিশ, সমস্ত জীবন সামনে পড়ে আছে। এভাবে নিঃসঙ্গতার মরুভূমিতে নিজেকে নিঃশেষ হতে দিও না। তোমার এক ছেলে গেছে, আরো ছেলে আসবে, নিজের সংসারে সুখ ও সম্মানের সঙ্গে তুমি সাম্রাজ্ঞী হয়ে

থাকবে। তোমার সে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাকে গড়ে তুলতে দাও ডার্লিং, আমারও বাঁচবার পথ আর নেই। একথা বিশ্বাস কর।"

"আমার ভবিষ্যৎ রচনা করতে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ দেখবে না যদি বল তবে আমাকেই তা দেখতে হবে, কনি। আমার অদৃষ্টে সুখ লেখেননি ভাগ্যদেবতা, জীবন আমার একটা অভিশাপের মতো, আমার ভাগ্যের সঙ্গে যার ভাগ্য জড়াবে সেও সুখী হবে না আমার বিশ্বাস। একথা থাক।"

"আবার ভুল করছ ডো, ও-সব তোমার মন-গড়া ধারণা, একফোঁটাও সত্য ওতে নেই। তুমি একটা অভিশাপ নও, তুমি আমার সাগরপুরীর রাজকন্যা, সে জল-রাশি ভেদ করে পৃথিবীর কোনো বিষাক্ত হাওয়া পৌঁছতে পারে না।"

"তুমি আমার স্বপনপুরীর রাজপুত্তুর। সাগরপুরী স্বপনপুরী থেকে অনেক দূর। সামাজিক ব্যবধান, ধর্মের ব্যবধান, আর্থিক ব্যবধান, জাতের ব্যবধান একটা দুস্তর সমুদ্রের মতো আমাদের দুজনের মাঝখানে। হাত বাড়ালেও দুজন দুজনকে ধরতে পারব না, ঢেউয়ের আঘাতে দুদিকে ভেসে যাব।"

"তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসো না, ডো?"

"জবাব চেয়ো না এ প্রশ্নের। যদি পবিত্র ফুলের মতো গাছের শাখা থেকে তোমার মতো দেবতার চরণে নিজেকে অর্ঘ দিতে পারতাম তাহলে ভেবে দেখা যেত কিন্তু আমি একটা পিশাচের আলিঙ্গনে অপবিত্র, অশুচি, নিজেকেই আমি ঘেন্না করি।"

"থামো ডো, শুধু-শুধু আমার মনে কষ্ট দিও না। নিজেও তা ভেবে কষ্ট পেয়ো না।"

"কষ্ট আমাদের দুজনকেই মাথা পেতে নিতে হবে। অন্ধের মতো পথ হাতড়ে-হাতড়ে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি, কিন্তু এখনো সময় এসেছে ছাড়াছাড়ি হবার।"

ডোরিন কেঁদে লুটিয়ে পড়ল কৌচের উপর।

মাইসোর থেকে ফিরে আসার দিন তিনেকের ভিতরেই ডোরিনের কাছে এমন আঘাত পাব আশা করিনি। রূপে ধনে মানে বংশগৌরবে আমি যে-কোনো যুবতীরই

কাম্য এটাই ছিল আমার ধারণা, কিন্তু ডোরিন আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়! এত বড় আশ্রয়, এতখানি ত্যাগ স্বীকার, এতখানি ভালোবাসা ও কার কাছে পাবে? কিন্তু ওর চরিত্রের একদিক যেমন কুসুমকোমল, অন্যদিক তেমনি বজ্রের মতো দৃঢ়। ওর যা রূপ, যা জীবিকা, তাতে ঐ দৃঢ়তাই ওকে মুগ্ধ ও লুব্ধ পুরুষের দৃষ্টি থেকে তফাতে রেখেছে। কিন্তু সব জায়গায় দৃঢ়তা ভালো নয়।

আমাকে 'না' বলার একটা কারণ দেখাচ্ছে ও অন্য পুরুষের উচ্ছিষ্ট। কিন্তু অসহায় ষোড়শী বালিকা কেমন করে নারীমাংসলোভী একটা নরপশুর কবল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে যদি পালাবার পথ বন্ধ থাকে? বুড়ো ডেভিস জানোয়ার ছাড়া আর কি? সেই বিসদৃশ মিলনে গীর্জাও তো সম্মতি দিয়েছিল। স্বর্গস্থ পরম পিতা এবং তাঁর প্রিয়তম পুত্র যীশুর নামে পাদ্রী আশীর্বাদও করেছিলেন। যে-পাশবিকতা আইনের চোখে দণ্ডনীয়, সেটা ধর্মীয় বিধানের ছাপ নিয়ে পবিত্র বন্ধন হিসাবে স্বীকৃত হল ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আর সেটাই এই অসহায় বালিকাকে মেনে নিতে হল? কিন্তু ও তো হিন্দু বিধবা নয়, আবার বিয়ে করতে পারে। আমিও সাদরেই ওকে গ্রহণ করতে চাচ্ছি। এ ওজর ওর টিকবে না শেষ পর্যন্ত। প্রথম জীবনে ও দুঃখ পেয়েছে বলে সারাজীবন দুঃখ পাবে ও দুঃখের কারণ হবে এটা ওর মস্ত বড় ভুল ধারণা। ওকে ভালো করে বোঝাতে হবে।

আবার বড়দিনের মরসুম এসে পড়েছে। কোনো ক্লাবের মেম্বার হইনি এখনো, কিন্তু ব্যবসায়-সূত্রে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গেও যথেষ্ট প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পার্টির পর পার্টি লেগে আছে—ককটেল, ডিনার, লাঞ্চ, পিকনিক, একটার পর একটা উৎসব।

গত বছর এই বড়দিনের উপলক্ষেই ডোরিন আর মুন্নাদিদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এর একটি হয়ে উঠেছে অনুরাগের সোনার শিকল, বাঁধা পড়ে গেছি সেই শিকলে। আরেকটি হয়েছে প্রীতির বন্ধন, সে বন্ধনে জ্বালা নেই, শেকলের মতো দাগও কাটে না।

ডোরিনের সঙ্গে যে মাত্র এই এক বছরের পরিচয় তা মনে হয় না, মনে হয় বহুদিনের। বোধ হয় জন্ম-জন্মান্তরের। তা না হলে একটা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে

এতখানি আপনার বলে মনে হয় কেন? ওর জন্যেই যেন এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম। দয়া থেকে সহানুভূতি, সহানুভূতি থেকে আকর্ষণ, আকর্ষণ থেকে তীব্র অনুরাগ আমার সমস্ত সত্তাকে বিহ্বল করেছে। আমি কোন পথে চলেছি জানি না, জানতে চাইও না। প্রতিদানে কতটুকু পেয়েছি ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু যেটুকু বুঝতে পেরেছি সেটুকুই যথেষ্ট।

নকরদা একদিন আমাকে বলেছিলেন—মেয়ে জাতের কাছ থেকে দূরে থাকবি কাঞ্চন, ওরা মোহিনী, মায়াবিনী, ছলাকলায় পটিয়ে ফেলতে জানে। কিন্তু কই, ও তো আমাকে ছলাকলায় ভোলাতে চেষ্টা করেনি? বরঞ্চ আমাকে দূরেই রাখতে চায়। আমিই তো ওকে কাছে টেনে রাখতে চাই। কেন? ভালো লাগে বলে।

মন বলল—কাঞ্চন, তুমি না নিজেকে ভাবতে বীরপুরুষ, শেষে এই দোঁ-আশলা খৃষ্টান মেয়েটার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছ? তুমি বামুনের ছেলে, বড় ব্যারিস্টার সাহেবের ছেলে, শিক্ষিত মার্জিত বুদ্ধিমান, তোমার এ দুর্বলতা কেন? রূপের মোহ? মেয়েটার বুদ্ধি তোমার চেয়ে ঢের বেশি, ও বলেছে এখন ছাড়াছাড়ির সময় এসেছে, তাই ভালো তোমাদের দুজনের পক্ষে। যে-শিকলে তুমি বাঁধা পড়েছ, সে-শিকলে ও নিজেও বাঁধা পড়েছে, বুঝতে পারছ না? শিকল কেটে দুজনেই পালিয়ে যাও। এখনো সময় আছে, পালিয়ে যাও।

নিউ মার্কেটের এক ফুলের দোকানে ফরমাস দিয়েছিলাম ২৫শে ডিসেম্বরের সকালে একটা খুব বড় ফুলের তোড়া ডোরিনের ঘরে, আরেকটা ম্যাকের ঘরে পাঠিয়ে দিতে। টের পেলাম তোড়া পৌঁছে গেছে। এক বাক্স দামী চকোলেট নিয়ে ডোরিনের ঘরে ঢুকলাম। বললাম, "মেরি ক্রিসমাস ডো!"

"তোমাকেও সেই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কনি!"

"শুধু মুখের কথায় খুশি হচ্ছি না আজকের দিনে।"

"তবে কি চাও?"

এগিয়ে গিয়ে ওকে বাহুপাশে বেঁধে ফেললাম। বললাম, "ট্রেনের ভিতর এক তরফা হয়েছিল, আমার পাওনা এখন মিটিয়ে দাও।"

ডোরিন দুহাতে আমার মুখ নিচু করে আমার ওষ্ঠাধরে ওর অধর সুধা ঢেলে দিল। বলল, "দুষ্টু ছেলের আবদার!"

"দানের প্রতিদান দিতে হয়, এবার আমার পালা।"

"হয়েছে হয়েছে, আর না, এখন বস, পাঁচমিনিটেও শেষ হলো না!" বলে ডোরিন টলতে-টলতে বসে পড়ল।

"ওকি ডো? ভয় পেয়েছ? অমন দেখাচ্ছে কেন?"

"ও কিছু নয়, যাই তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসি।" বলেই ও ছুটে পালিয়ে গেল আমার দৃষ্টি অন্তরালে।

সেদিন বৃন্দাবন কাননে ওর চোখেমুখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল আজও তেমনি। মন ডেকে বলল—ওহে কাঞ্চন, নিজেও মরছ, মেয়েটাকেও তিলে-তিলে হত্যা করছ।

—আমি? হত্যা করছি ওকে?

—হ্যাঁ তুমি। ওর মনে যে আগুন ধরিয়েছ সে আগুনে ও পুড়ে মরছে। মেয়েরা দেহ মন প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসে, সে ভালবাসার জ্বালা তুমি বুঝবে না।

—ও তো সেটা স্বীকার করে না?

—মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, শোনোনি?

ডোরিন কফি নিয়ে এল, কফির সঙ্গে কেক। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম ও আমার দেওয়া সবুজ রঙের ফ্রকটা পরেছে, বলল, "গত বছরের ক্রিসমাসের কথা মনে পড়ে, কনি?"

"সে দিনটি কোনো কালেই ভুলতে পারব না, ডো।"

"চেষ্টা করলেই ভুলতে পারা যায়।"

"চেষ্টা করবার কোনো প্রয়োজন আছে?"

"প্রয়োজন হতে পারে। চেষ্টা করা হয়তো দরকার।"

হাতের কাপটা ঠকাস করে টেবিলে রেখে বললাম, "আজকের দিনে মিষ্টি কথা বলতে হয় জানো?"

"মাপ চাচ্ছি। দুপুরে তোমার যদি কোনো জায়গায় নেমতন্ন..."

রাগটা উবে গেল। বললাম, "যদি-কদি নয় তোমার নেমতন্ন খুশি হয়ে গ্রহণ করলাম। দাও আরেক কাপ কফি। যোশেফ বাজারে গেছে, এলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব'খন। সে হাত লাগালে তোমার কষ্ট হবে কম। ওঃ, বেলা যে প্রায় দশটা বাজে!"

ঘরে এসে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরপর কদিন পার্টি থেকে অনেক

রাতে ফিরেছি, তাই ক্লান্ত। হঠাৎ কানে এল, "কাঞ্চন, কাঞ্চন, এমন অসময়ে ঘুমোচ্ছিস, নেশা-কেশা করেছিস নাকি ?"

হঠাৎ নক্ষরদার এই আবির্ভাবে হকচকিয়ে গেলাম। কাঁধে ক্যামেরাটি ঝুলছে, মুখে সিগারেট, হাতে ঠোঙা। বললেন, "নে পেয়ারা চিবো, খুব ভালো পেয়ারা। তোর কি কোনো সঙ্গীসাথীও জুটল না যে আজকের দিনে পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছিস কচ্ছপের মতো ?"

কি করে বলি কিছুক্ষণ আগেই সেই ডোরিন গ্রে নামের মেয়েটির সঙ্গে কফি খাচ্ছিলাম! নক্ষরদা আবার বললেন, "সেই মেয়েটার সঙ্গে তোর আলাপ হয়নি তো এর মধ্যে ? এ বাড়িতেই তো থাকে ? খবরদার কক্ষনো কথা কবিনে।"

উনি জানেন না, ডোরিন আমার পাশের ঘরেই থাকে, এবং শুধু আলাপ নয় সে অবস্থা অতিক্রম করে অনেক দূরে এসে পৌঁচেছি। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার ফিকিরে বললাম, "যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে ব্রাহ্মণকে পেয়ারা ভোজন করিয়ে আপনার পুণ্যের ভাণ্ডার ভারি হল।"

"তুই এঁচড়েপাকা বখাটে হয়ে গেছিস। পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরকের কল্পনা মানুষকে ভয় ও লোভ দেখাবার ফিকির। ধর্মগুরুদের ভিতর এক বুদ্ধই তাঁর ধর্মকে এগুলো থেকে আলাদা রাখতে পেরেছিলেন। এটা আমার কথা নয়, স্বামী বিবেকানন্দের কথা। আর যীশুখৃষ্ট পঁচিশে ডিসেম্বরে জন্মাননি, জন্মেছিলেন মার্চমাসের পঁচিশে। এখনো একটি খৃষ্টান সম্প্রদায় আছে যারা এ উৎসব পালন করে পঁচিশে মার্চে।"

"তবে পঁচিশে ডিসেম্বর কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল ?"

"পঁচিশে ডিসেম্বর সূর্যের একটি পরিক্রমা শেষ হয়ে আরেকটি শুরু হয়। পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে যায়, কিন্তু সূর্য এক জায়গাতেই নিজের এ্যাক্সিসের উপর আস্তে-আস্তে ঘোরে। আদিম মানবের মনের উপর ভোরের সূর্যোদয় যেমন রেখাপাত করেছিল, বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, তেমন আর কোনো কিছুই করতে পারেনি। মিশর, পার্শিয়া, বাবিলন, এ্যাসিরিয়া, ভারতে এবং জগতের বহুদেশে প্রাচীনকালে সূর্যের উপাসনাই ছিল ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান। আমাদের বেদে আছে সূর্য পরমেশ্বরের একটি চোখ, তিনি সব দেখছেন। পরমেশ্বর ও মানুষের মধ্যস্থ হয়ে তিনি প্রাণদাতা, মুক্তিদাতা। বেদ বলেছে তাঁকে 'মিত্র,' পার্শিয়ার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে তাঁকে বলেছে 'মিথ্র,' অর্থাৎ মানুষের পরমবন্ধু। প্রাচীন

গ্রীস ও রোমে তিনি ছিলেন 'এ্যাপোলো' অর্থাৎ সকল সৌন্দর্যের প্রতীক। পৌত্তলিক জগতেও সেকালে সূর্যের পূজা হত এই সময়ে। ক্রমে খৃষ্টানরাও এ-দিন-টাকে পরিত্রাণদাতা খৃষ্টের জন্মদিন বলে উৎসবের জন্যে বেছে নিল। বোধ হয় লক্ষ্য করেছিস যে পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে দিন বড় হতে থাকে, রাত ছোট হতে থাকে, এজন্যেও ঐ দিনটাকে বড়দিন বলি আমরা।"

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে উনি উঠে গেলেন। এদিকে কি কাজে এসেছিলেন, ফিরতি পথে আমার খোঁজ নিয়ে যাবার ইচ্ছে হল বললেন।

ডোরিন, খাওয়ালো ভালো। খাওয়ার পর ওকে বললাম, "আমি ব্রাহ্মণ জানো তো? সব চেয়ে উঁচু জাত।"

"এখন জানলাম। কি আমার ব্রাহ্মণ রে!"

"ভালো করে ব্রাহ্মণভোজন করালে কি হয় জানো? স্বর্গে যায়।"

"কপালে আমার টিকিট এঁটে সেখানে সরাসরি পাঠিয়ে দাও না—সব জালা জুড়িয়ে যাবে।"

"আবার যা তা বলছ?"

"তোমার ঘরে কে এসেছিল? পেছনটাই দেখলাম।"

"ঐ তো নফরদা! বললেন তোমার কাছ থেকে তফাত থাকতে। মিশলে খারাপ হয়ে যাব। মেয়েজাত নাকি ভয়ঙ্কর জাত, পুরুষের রক্ত শুষে খায়!"

"আমি বলি পুরুষজাত ভয়ঙ্কর জাত, মেয়েদের মাংস চিবিয়ে খায়।"

"এ দুটোই ঠিক, তর্ক করতে চাই না।"

কথায়-কথায় ডোরিন বলল ও আরেকটা কণ্ট্র্যাক্ট পেয়েছে ডায়মণ্ড নাইট ক্লাবে, পয়লা জানুয়ারী থেকে দু মাসের জন্যে। জিগগেস করলাম, "এবার কি সাজবে তো?"

"ব্রেজিলিয়ান বিউটি! ব্রেজিল দেশটা কোথায় জানি না, কিন্তু সাজব ব্রেজিল-সুন্দরী!"

"বেশভুষা কি হবে?"

"ওটা জিগগেস কর না। তবে মাথায় খুব বড় একটা বেতের টুপি থাকবে, চওড়া বারান্দাওয়ালা। একটা কথা দেবে আমাকে? কক্ষনো দেখতে যেও না সেখানে এ-দুমাস। দেখলে তোমার ঘেন্না হবে। আমারও ঘেন্না ধরে গেছে!"

"কথা দিচ্ছি, কিন্তু আমার আবেদন এখনো ফিরিয়ে নিইনি, ছেড়ে দাও পথটা, বদলে ফেল মতটা, লজ্জা-বেয়াকে গুডবাই করে নতুন করে সংসার পাতাও, আমি আশায়-আশায় দিন গুনছি।"

বুঝতে পারিনি যে চারটে বেজে গেছে। ডোরিনের কাছে বসলে আমার সময়ের হিসেব থাকে না। ও চা নিয়ে এল।

"কনি, কনি!" বুড়ো ম্যাকের গলার স্বর। "যোশেফের কাছে শুনলাম তুমি এখানে আছ।"

ম্যাক আমাদের দুজনকে বড়দিনের সম্ভাষণ জানাল। তারপর দুটো প্যাকেট ওর র‍্যাশন ব্যাগ থেকে বার করে আমাদের দুজনের হাতে দিল। আমার জন্যে দু টিন সিগারেট, ডোরিনের জন্যে একবাক্স বিস্কুট। ডোরিন বলল, "ধন্যবাদ, ফাদার ক্রিসমাস, শাদা বড় দাড়ি থাকলে স্যান্টাক্লসের পার্টটি তোমায় আরো বেশি মানাত।"

ডোরিন আর একটা পেয়ালা নিয়ে এসে বুড়োকে চা দিল, বিস্কুটের টিনটাও খুলল। চমৎকার পাঁচমিশালী বিস্কুট।



৩০

পয়লা জানুয়ারী। ইংরেজী নববর্ষ। ডোরিনের ঘরে গিয়ে দেখি সব খাঁ-খাঁ করছে, ডোরিন নেই, তার কোনো মালপত্রও নেই।

দারোয়ানকে জিগগেস করলাম, মেমসাহেব কোথায় উঠে গিয়েছে, সে জানে না না, যোশেফ জানে না, কেউ জানে না।

আমাকে একবার বলেও গেল না ডোরিন? ছাড়াছাড়ি হবার ব্যবস্থাটা ও এত গোপনেই সেরে ফেলেছিল! ছাড়াছাড়িটা পাকাপাকি করবার জন্যে ঠিকানাও গোপন রেখে এই বিশাল নগরীর জনসমুদ্রে একেবারে ডুব দিয়েছে! আমার ওপর এই নিষ্ঠুর অবিচার করতে ও পারল? ওর শরীরে কি দয়ামায়া বলে কিছু নেই? নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে এসে এতবড় আঘাত আমায় পেতে হল?

দুর্বার দুরন্ত কাল ছুটে চলে বিরামহীন, মানুষের সুখদুঃখে ভ্রূক্ষেপহীন। আমারও দিন কেটে যায়, কিন্তু বুকের ভিতর একটা শূন্যতার অসহ্য গুরুভার। অফিসে খুব খাটছি, হারীণদার কাজের অনেকটা ভার ইচ্ছে করে ঘাড়ে নিয়েছি নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে, কিন্তু বাড়িতে যখন থাকি তখন চারপাশের দেওয়াল যেন এগিয়ে এসে চেপে ধরে।

ডোরিনের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে এসেছে। আলাপ করিনি। ডোরিনের স্মৃতিবিজড়িত আমার ঐ আনন্দ মহলে ওরা যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে। ও চলে যাবার পরে প্রায় দেড়মাস কেটে গেছে, মুন্নাদি হারীণদা দিগলানী কারুর বাড়িই একবারও যাইনি। যেতে ইচ্ছেও করে না!

অফিসেও আবহাওয়াটা খুব ভালো নয়। কেদার্স্টোনের নয়ারাজত্বে ওয়ালেস, ভেঙ্কট, আর্মস্ট্রং, দুবে খুব খুশি নয়। সেনগুপ্তর সম্বন্ধে ওরা বলছে সে কেদার্স্টোনের

গুপ্তচর। ওদের সামলাতে হচ্ছে হারীণদাকে। আমাকে একদিন বললেন, "আশা করি তুমি কোনো দল-পাকানোর মধ্যে ভিড়বে না। কেদাস্টেনের বাবা ছিল মুচি, জানি ওর নজর ছোট, কিন্তু জুট ডিপার্টমেন্ট, মেশিনারি ডিপার্টমেন্ট আর ইম্পোর্ট ডিপার্টমেন্ট ভালো চলছে না, গ্লাসগোর অফিস থেকে কড়া-কড়া চিঠি আসছে, তাই ওর মেজাজ তিরিক্ষি।" আর একদিন তিনি বললেন, "তোমার চোখের কোণে কালি পড়েছে কেন? শুকিয়েও যাচ্ছ? ডক্টর গ্রেনকে তো আমরা মাসে-মাসে একটা মোটা ফি দিচ্ছি, একবার দেখিয়ে এস না?"

নফরদাও সেদিন একথাই বলেছিলেন, তাই গেলাম একবার ডাক্তার গ্রেনের চেম্বারে। ডাক্তার জিগগেস করলেন, "কি অসুস্থতা বোধ হচ্ছে মিস্টার সানিয়াল? কোথায় খারাপ লাগছে?"

"আমার নিজের কোনো অসুস্থতা বোধ নেই, শুধু আর সকলে বলছে আমি রোগা হয়ে যাচ্ছি।"

ডক্টর গ্রেন আমাকে খুব যত্ন করে দেখলেন। বললেন, "মিস্টার ঘোষালকে আমি ফোন করে দেব, তুমি এখন যেতে পার।"

আমি অফিসে পৌঁছাবার আগেই বোধ হয় ডাক্তার গ্রেন ফোন করেছিল। হারীণদা বললেন, "কাকন, গ্রেন বলেছে তোমার নার্ভাস ব্রেকডাউন, মাসখানেক বাইরে কোথাও ঘুরে এস, এত খাটুনি তোমার সহ্য হচ্ছে না।"

"না হারীণদা এসময়ে আপনাকে ফেলে আমার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি যাব না।"

"কথাটা বললে, তাইতেই খুশি হলাম, কিন্তু সারাজীবন গাধার মতো খেটে হাড় শক্ত হয়ে গেছে, কোনো কষ্ট হবে না। পাহাড়ে এখন খুব ঠাণ্ডা পাবে, গোপালপুর ঘুরে এস না?"

একদিন যোশেফ এসে বলল গ্রে মেমসাহেবের সঙ্গে ওর বাজারে দেখা হয়েছে। মেমসাহেব জিগগেস করলেন আপনি এত রোগা হয়ে যাচ্ছেন কেন, আমি কি ভালো করে খাওয়াচ্ছি না? যোশেফ আরো একটা খবর দিল, মেমসাহেবও খুব রোগা হয়ে গেছে।

ডোরিন আমাকে দেখল কি করে? তবে কি এই রাস্তায়ই কোথাও আছে?

হারীণদাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছি গত বুধবার, আসছে রবিবার গোপালপুর রওয়ানা হবার দিন। বললাম, "যোশেফ, তুমি মেমসাহেবকে বলনি তো আমার গোপালপুর যাবার কথা?" ও আমতা-আমতা করছে দেখে ধমক দিলাম, "সত্যি কথা বল।"

"বোধ হয় বলিনি।"

"এই কিছুক্ষণ আগে দেখা তাঁর সঙ্গে, কক্ষনো ভুলে যাওনি এর মধ্যে, তাহলে বোধহয়ের মানে নিশ্চয়ই বলেছ?"

ও মাথা চুলকোতে-চুলকোতে চলে গেল ভিতরের ঘরে। আমাকে এত চটতে দেখে বোধ হয় অবাক হল।

ডোরিন কি একবার আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে? আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। ও যদি আমাকে ভুলতে পারে আমিও ওকে ভুলতে পারব। দুনিয়াটাই তো এরকম বেইমান! ও তো দুনিয়া-ছাড়া নয়?

উত্তরভারতে যাতায়াত করতে অনেকগুলো মেলট্রেনের মধ্যে বাছাই করে নেওয়া যায়, কিন্তু কলকাতা থেকে দক্ষিণ ভারতে যাবার একটি মাত্র সুবিধাজনক গাড়ি মাদ্রাজ মেল। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি বেজায় ভিড়। ট্রেন ছাড়বার পনেরো মিনিট বাকি, বার্থ রিজার্ভ আছে, তাই বাক্স ও বিছানা গাড়িতে রেখে বাইরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম। যারা এগিয়ে আসছে তাদের মালপত্রের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় তারা কে কোন শ্রেণীর যাত্রী।

হঠাৎ চোখে পড়ল ভিড় ঠেলে ঐ ডোরিন আসছে না? কুলির হাতে সুটকেস, বাঙ্গালোর যাবার সময় যেটি কিনে দিয়েছিলাম। ছুটলাম তার দিকে। জিগগেস করলাম, "কোথায় চলেছ ডোরিন?"

ও জবাব দিল না। হাত থেকে টিকিটখানা ছিনিয়ে নিয়ে দেখি গোপালপুরের টিকিট, থার্ডক্লাসের! বললাম, "সারারাত দাঁড়িয়ে যাবে থার্ডক্লাসে?" জবাব নেই। "গোপালপুরে তোমার কেউ আছে?" কোনো জবাব দিচ্ছে না ও। প্রায় টেনেই তুললাম ওকে আমার কম্পার্টমেণ্টে। পয়সা দিয়ে কুলিকে বিদায় করলাম। জিগগেস করলাম, "তোমার বিছানা আনোনি?"

এবারেও জবাব নেই। আচ্ছা মুশকিল!

টিকিটচেকার যাচ্ছিল, তাকে বললাম, "কণ্ডাক্টার-গার্ডকে পাঠিয়ে দিন, বিশেষ দরকার।"

কণ্ডাক্টার-গার্ড যখন এল তখন গাড়ি ছাড়বার মাত্র দু মিনিট বাকি।

"একখানা থার্ডক্লাসের টিকিট আছে, বদলে ফার্স্টক্লাসের করতে হবে, কত বাড়তি ভাড়া লাগবে? এ মহিলাটি আমার সঙ্গে এক গাড়িতেই যাবেন।"

"কিন্তু স্যার, চারটে বার্থ ই তো রিজার্ভ করা এ কম্পার্টমেণ্টে?"

"অসুবিধে হবে না আমার।"

"মেয়েদের কম্পার্টমেণ্টে একখানা বার্থ খালি আছে।"

"দরকার নেই, আমি বসে যাব, বার্থটি একে ছেড়ে দিচ্ছি।"

ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল। কণ্ডাক্টার-গার্ড খড়্গপুরে দেখা করবে বলতে-বলতে ছুটল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

আর তিনটি বার্থেই লোক আছে। সবাই বসে আছি নিচের দুটো বাঙ্কে। শুতে যাবার ঢের দেরি, দিনের আলো খটখট করছে। একটি বাঙালী দম্পতি, একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক, ডোরিন আর আমি, মোট পাঁচজন। বাঙালী ভদ্রলোকটির মিলিটারী পোশাক, সুতরাং নিশ্চয়ই যাচ্ছেন সরকারী খরচায়। মাদ্রাজী ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই চলেছেন সরকারি কাজে, কারণ নিজের খরচায় ওরা ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করে না। ডোরিন মুখ গোমড়া করে বসে আছে আমার পাশে।

গাড়ি ছাড়বার মুখে ডোরিন-ঘটিত দৃশ্যটি বোধহয় কৌতূহলসহকারে দেখছিলেন এঁরা। আমাদের দুজনের ভিতর সম্পর্কটা কি তাও হয়তো কল্পনা করে নিয়েছেন এঁরা। নবাগতার আকস্মিক আগমন, থার্ড ক্লাসের টিকিট বদলিয়ে ফার্স্টক্লাসে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবার অভিপ্রায় বোধহয় ওঁদের কাছে একটি প্রণয়কলহের রোমান্টিক রূপ নিয়েছে।

স্টেশনে দুটো হাসির চুটকী বই কিনেছিলাম। একটা ওর হাতে দিলাম, সেই সঙ্গে একটুকরো কাগজে লিখে জানালাম, "অমন প্যাঁচার মতো মুখ বুজে বসে থেক না, যা হোক দুয়েকটা কথা কও, ওরা ভাবছে কি?"

ওর উপস্থিতবুদ্ধি আছে। আমি লিখলাম সকলে দেখেছিল, সময়োপযোগী একটা চাল চালল, "ঠিক আছে, আমি ভেবেছিলাম ঠিকানাটা তোমার মনে নেই, সেজন্যেই তো রাগ হচ্ছিল!"

মিলিটারী ভদ্রলোক বোধহয় চ্যাটার্জী, ও নামটিই দেখেছিলাম কম্পার্টমেণ্টে ঢুকবার সময় রিজার্ভেসন কার্ডে। উনি জিগগেস করলেন, "আপনিই তো মিস্টার সানিয়াল?"

আমার নামও বাইরে ঝোলানো। জবাব দিলাম, "হ্যাঁ, কর্নেল চ্যাটার্জী।"

মিসেস চ্যাটার্জী এতক্ষণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে ডোরিনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এবার জিগগেস করলেন, "কদ্দূর যাচ্ছেন? আপনার স্ত্রী ভারি সুন্দর। এমন সুন্দরী মেয়ে বড় দেখা যায় না।"

স্ত্রী কথাটা শুনে ডোরিন লাল হয়ে উঠল। আমি জবাব দিলাম, "গোপালপুর।"

ভারি মুশকিল! যেখানেই যাই ডোরিনকে আর সবাই আমার স্ত্রী বলে ধরে নেয়! ভদ্রমহিলা এবার ডোরিনকে বললেন, "মিসেস সানিয়াল, শেষ মুহূর্তে মত বদলালেন বুঝি?"

যার কাছ থেকে ও দূরে পালিয়ে গিয়েছিল তারই স্ত্রী বলে ওকে সম্বোধন করা হচ্ছে! হাসি পেল আমার। আচ্ছা জব্দ হচ্ছে। দেখিনি বুঝিনি ভান করে কনুই দিয়ে ওর পাঁজরে মারলাম এক খোঁচা, অবিশ্যি জোরে নয়। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে ও ভিতরে-ভিতরে ফুলছিল বোধহয়, কিছুক্ষণ পরে ওর হাতের বইটা আমার পেছনে রেখে দেবার ছলে ও আমাকে দিল এক চিমটি। শোধবোধ। দুজনেই হজম করে গেলাম। কর্নেল চ্যাটার্জী আমায় জিগগেস করলেন, "তোমার স্ত্রী বাংলা বোঝেন?"

"না, কর্নেল চ্যাটার্জী।"

"তবে সাহস করে বলতে পারি মেয়েদের কাণ্ডই এরকম। আমার শ্রীমতীটিও বাপের বাড়ি যাবার তাল তুলেছিলেন, ধরে-বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি মাদ্রাজে।"

"বাজে বকো না শঙ্কর। তোমার কথা কবে না শুনেছি? তবে বুড়ো বাপকে মাঝে-মাঝে দেখতে ইচ্ছে হয় না?"

ওঁরা দুজনেই হাসতে লাগলেন।

এবার মিসেস চ্যাটার্জী ডোরিনের দিকে ফিরলেন। চমৎকার ইংরেজী বলেন, বোধহয় কোনো কনভেণ্টে পড়তেন খাঁটি মেমসাহেবদের কাছে। বললেন, "মিসেস সানিয়াল, তোমার শরীরটা মোটেই ভালো দেখাচ্ছে না, মা হতে হলে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এসময়ে স্বামীর সঙ্গে এসে ভালোই করেছ।"

ভদ্রমহিলা একটির পর একটি অনুমান করে যাচ্ছেন। প্রথমে ধরে নিলেন ডোরিন আমার স্ত্রী, তারপরে আমার সন্তান ওর গর্ভে। ডোরিনের জন্যে এবার দুঃখ হল, ওর অবস্থা কি হয়েছে বুঝতে পারছি। মাদ্রাজী ভদ্রলোক একটা বই নিয়ে তার মধ্যে ডুবে গেছেন, নইলে হয়তো আরেক তরফা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত। হয়তো মিসেস চ্যাটার্জীকে দোষ দেওয়া যায় না, ডোরিনের চেহারা সত্যিই খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

খড়্গপুরে কণ্ডাক্টার-গার্ড এসে টিকিটের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে গেল। মিসেস চ্যাটার্জীকে জিগগেস করলাম, "আপনার কটি ছেলেপুলে মিসেস চ্যাটার্জী ?"

"ভগবান একটিও দেননি। মানুষের হাতে কিছু নেই, সবই তাঁর দান।"

"হলে খুব সুখী হতেন ?"

"আর কয়েকমাস পরে আপনার গিন্নীর কাছেই এ প্রশ্নের জবাব পাবেন।"

পরিস্থিতি ডোরিনের পক্ষে শোচনীয় !

রাতের আহারের পরে বিছানা পেতে ডোরিনকে শুইয়ে আমি বসে রইলাম। ডোরিন ঘুমোচ্ছে। বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। বোধহয় এমন ঘুম ও অনেকদিন ঘুমোয়নি। ঘুমন্ত ডোরিনকে বড় অসহায়ও দেখাচ্ছে, মুখখানি ফ্যাকাশে ও শীর্ণ।

শেষ মুহূর্তে ও ছুটে এল কেন ? এটাও কি মেয়েলি খেয়াল ? কিন্তু ও তো খেয়ালের বসে কিছু করে না ? ডায়মণ্ড নাইটক্লাবের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট শেষ না করেই ও চলে এল ? যেমন করে হঠাৎ আমার নাগালের বাইরে ছুটে গিয়েছিল ঠিক তেমনি করেই আবার আমার কাছে ছুটে এসেছে ?

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বসে-বসেই ঘুমোচ্ছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম হারীণদা বলছেন— অফিসে বসে ঘুম দিচ্ছ ? বাঙালী ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অতীত গৌরবের স্বপ্ন দেখে, জেগে বড়-বড় কথা বলে। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের শরৎচন্দ্র, আমাদের জগদীশ বোস, আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র, আমাদের চিত্তরঞ্জন, আমাদের সুভাষচন্দ্র, আমাদের ক্ষুদীরাম—কেবল 'আমাদের' 'আমাদের।' কিন্তু সব জায়গায় মার খেয়ে যে হটে যাচ্ছে সেদিকে হুঁস নেই বাঙালীর। কাঞ্চন, তোমাকে আমি তৈরি করে আমার চেয়ারে বসাতে চাই, ঘুমোলে তো এখানে চলবে না ?

কথাগুলোর খোঁচায় ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল, মনে হল আমার পাজামার

খুঁট ধরে কে টানছে। নরম মেয়েলি হাত। ঘুম ভেঙে দেখি ডোরিনের হাত। ও আমাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে আমার জায়গায় এসে বসল।

সকালবেলায় বেরামপুর জংসন। ট্রেনযাত্রার মেয়াদ এখানেই শেষ। এখান থেকে গোপালপুর পর্যন্ত মোটরযানই ভরসা। স্টেশনে ট্যাক্সি ও স্টেশনওয়াগন অনেক ছিল। আরো দুজন যাত্রী আছে গোপালপুরের। ট্যাক্সিতে স্বাধীনভাবে যাবার ইচ্ছে ত্যাগ করলাম, কারণ ডোরিন আবার চুপ মেরে গেছে। চারজনের জন্যে একটা স্টেশনওয়াগন ভাড়া করা হল। আমি ড্রাইভারের পাশে বসে যাব, থাক ও পেছনের সীটে ওদের সঙ্গে।

স্টেশনেই প্রাতঃরাশ খেয়ে নিলাম আমরা। অন্য দুটি যাত্রী, বোঝা গেল স্বামী-স্ত্রী। ওরা হায়দ্রাবাদ থেকে আমাদের একঘণ্টা আগে এসে পৌঁচেছে। ভদ্রমহিলার কাছা দিয়ে শাড়ি-পরা, নিশ্চয়ই মারাঠী। ডোরিন অবাক হয়ে কাছাটি দেখছিল, বোধহয় আগে কখনো দেখেনি কাছা দিয়ে শাড়ি পরা।

মারাঠীরা বাঙালীদের খালি-মাথা দেখে হাসে। আমরা ওদের মেয়েদের কাছা দেখে হাসি। আগুনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে হাঁড়ি বলে "কেটলী, তুই কালো।"

হোটেলে ভার করেছিলাম আমার নিজের একটি ঘরের জন্যে। ম্যানেজার হেসে বললেন, "ঠিক আছে, একটা ডবলরুমই দিচ্ছি, এখানকার মরশুম এখনো আরম্ভ হয়নি, তাই দিতে পারছি।"

দুটো আলাদা ঘর চাওয়া ভালো দেখাবে না ভেবে ওটাই নিতে বাধ্য হলাম। মিস্টার ও মিসেস অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি। ঘটনাচক্রের ষড়যন্ত্র মানুষ সবসময়ে এড়াতে পারে না। ডোরিন জোর করে এসেছে, তার বলার কিছু নেই।

ঘরটি সুন্দর সাজানো, চমৎকার দৃশ্য, দুদিকেই সমুদ্র দেখা যায়। সারি-সারি তরঙ্গমালা আছড়ে পড়ছে এসে বেলাতটে। এর আগে আমরা দুজনে কেউ সমুদ্র দেখিনি। ডোরিন জানলায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে আছে, যেন কল্পনালোকে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমিও কিছুক্ষণ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ঘরে এসে আমার সুটকেস খুলে কাপড়জামাগুলো আলমারিতে গুছিয়ে রাখলাম। তাড়াতাড়িতে ডোরিন ওর সুটকেসটার চাবি দিতে হয়তো ভুলে গিয়েছিল, খুলে দেখলাম ফ্রক মাত্র দুটি এনেছে, আর চারখানা শাড়ি। একখানা ওকে কলকাতায় কিনে দিয়েছিলাম, আরেকখানা বাঙ্গালোরে, আর দুখানা আর্ট সিল্কের ওপর

ছাপানো, বোধহয় এবার কিনে এনেছে। এগুলোকেও বার করে আলমারিতে রাখলাম, কিন্তু ব্লাউজ ও ভিতরে পরবার জিনিসগুলোতে হাত দিলাম না।

ওর এখনো স্বপ্ন ভাঙছে না, না ধর্মঘট চলছে?

বেরামপুরে খবরের কাগজ কিনেছিলাম। খানিকটা ছিঁড়ে পুঁটলী পাকিয়ে ওর মাথায় ছুঁড়ে মারলাম। তাক ফস্কে দেওয়ালে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। আবার আরেকটা। আবার আরেকটা। তিন নম্বর ওর মাথায় লাগল।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই ও জবাব দিল, "ছেলেমানুষী করার বয়েস নেই তোমার, থামো।"

"কোল্ড ওয়ার আর সহ্য হচ্ছে না, তাই শুটিং ওয়ার। নীরব-ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাইতে গুলি ছুঁড়ে যুদ্ধ ভালো।"

"পাগলাগারদে পাগল রোগীর সঙ্গে নার্স দরকার না থাকলে কথা বলে না।"

"আমাদের দুজনের মধ্যে রোগী কে, পাগল কে, বুঝতে পারছি না।"

উঠে গিয়ে ওর কাঁধ দুটো ঝেঁকে দিয়ে বললাম, "আমার দিকে তাকাও।" জোর করে ওকে আমার দিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম, "দেখাচ্ছেও পাগলের মতো। চুল এলোমেলো, গালে কপালে কয়লা ও ধুলোর ছাপ! মরি-মরি, কি রূপের ছিরি! যেন পেত্নীটি!"

এবার ও না হেসে পারল না।

"যে বলছে তাকে দেখাচ্ছে ভূতের মতো।"

সুটকেস খুলে ডোরিন চমকে উঠল। বলল, "কলকাতায় আজই ফিরে যেতে হচ্ছে, অনেক কিছু তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছি, এখন পরব কি?"

"স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পার, আমি তোমাকে আসতে বলিনি।"

ঘরটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিলাম। স্প্রিংঙের খাট দুটি একেবারে গায়ে-গায়ে লাগানো, বেডসাইড ব্যুরো দুটি মাথার দিকে, পাশে নয়। এত কাছাকাছি লাগালাগি হয়ে কি কোনো অবিবাহিত যুবক-যুবতী শুতে পারে? অথচ খাট দুটি যদি খানিকটা তফাত করে টেনে দিই তবে বাথরুমে যাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

বাথরুমে উঁকি দিলাম, বেশ ছোট। এখানে সবাই সমুদ্রস্নান করে, তাই, বড় বাথরুমের কথা চিন্তা করা হয়নি। অনেক অসুবিধেই হবে বোঝা যাচ্ছে।

ফিরে দেখি চেয়ারে বসে ডোরিন রুমাল দিয়ে চোখ মুচছে! বললাম, "ও কি হচ্ছে? তুমি ফিরে যেতে চাইলে, আমি বললাম যেতে পার, এর মধ্যে কান্নাকাটির কি আছে?"

"তুমি একেবারে হৃদয়হীন, দয়ামায়া নেই।"

"হৃদয়হীন ছিলাম না, এখন হয়েছি। তুমি পুরুষকে জানোয়ারই ভাব তো?"

ডোরিনের মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম, বললাম, "ডো, আমি হিন্দু, কিছু মন্তর পড়ছি, তুমি চোখ বুজে থাক। দেখবে আমার ডান হাতখানা লম্বা হতে-হতে আমাদের চৌত্রিশ নম্বরের বাড়ির সামনে উপস্থিত হল, সেখানে কিছুক্ষণ থমকে থেকে আবার চলল ঐ রাস্তার আরেকটা বাড়ির এক ঘরে, সেখানে তোমার খাটের ওপর যা-যা ফেলে এসেছিল সব নিয়ে আবার ছোট হতে-হতে ফিরে এল এখানে, জিনিসগুলো রেখে দিল আলমারিতে। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণে তবে চোখ খুল।"

ও আমার চালাকি বুঝতে পেরে উঠে গিয়ে আলমারি খুলে ফেলল। হাসতে-হাসতে বলল, "বেশ চুরিবিদ্যা শিখেছ। আগেই খুলে সাজিয়ে রেখে চালাকি!"

"খাট দুটো দেখছ, ডো? সরানো যাবে না, আমি আগেই হিসেব করে দেখেছি। কিন্তু ভয় নেই। আমার যৌবনকে আমি আপিং খাইয়ে দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছি, তুমি তোমার যৌবনকে পাথরের ঘায়ে বেহুঁস করে রেখেছ। তবে লজ্জা যেমন তোমারও করবে, আমারও করবে। তুমি ভেব এ-খাটে যে আছে সে মরে গেছে, আমি ভাবব ও-খাটে যে আছে সে-ই মরে গেছে। ব্যস্। এখন আমি বাইরে গিয়ে বসি, তুমি চান সেরে নাও। এই নাও স্যাম্পু, মাথাটা তো আর ধোপা বাড়িতে পাঠাতে পারবে না? এখানেই ধুয়ে সাফ করতে হবে।"

কলকাতার ঘোলা গঙ্গা, জাহাজের মাস্তুল ও দেশী নৌকোর পালের খুঁটি-কণ্টকিত আকাশসীমার সঙ্গে এই দিগন্তবিস্তৃত সাগর ও গগনের ছোঁয়াছুঁয়ির কি বিরাট প্রভেদ! আধ ঘণ্টা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

ভিতর থেকে সাড়া এল, "এখন ভেতরে আসতে পার।"

আসমানী রঙের শাড়ি-ব্লাউজ পরে ডোরিন দাঁড়িয়ে। সর্বপ্রকার প্রসাধন-বর্জিত, এমন কি একটু পাউডারও মাখেনি।

এ কি ডোরিন গ্রে? না, যে চিরন্তনী নারী জননী ভগ্নী কন্যা জায়া প্রিয়া রূপে

পুরুষের কাছে রহস্যময়ী থেকে গেছে যুগে-যুগে তারই এক ভাবঘন বিগ্রহ? অথবা এ কি ঐ অসীম অনন্ত লীলাময়ী সুনীল জলধির জলদেবীর মূর্ত প্রকাশ? প্রবল প্রলোভন অনুভব করলাম ওর শুভ্র ললাটে একটি মাত্র চুম্বনস্পর্শ দিতে কিন্তু হঠাৎ মনে হল ঐ শুচিশুদ্ধা তাপসীকে স্পর্শ করবার আমি যোগ্য নই, ও যেন দূরে, বহুদূরে আপন মহিমায় মহিমান্বিত।

আলমারির দিকে পা বাড়াচ্ছিলাম। ডোরিন বলল, "তোমার প্যান্ট আর গেঞ্জি বাথরুমে রেখে এসেছি, যা পরে বেরুবে লাঞ্চ খেতে তাও ঠিক আছে।"

স্নান করে বেরিয়ে দেখি, ডোরিন বাইরে যায়নি, ঘরেই বসে আছে। একটা ফিকে নীল বুসসার্ট এগিয়ে দিয়ে পরতে বলল। তারপর আমাকে চেয়ারে বসিয়ে হেয়ার ক্রীম মাখিয়ে চুল আঁচড়ে দিতে লাগল।

ছেলেবেলায় ঠিক এমনি করেই মা আমাকে স্নান করিয়ে পোশাক পরিয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতেন। আমার কাছে আমার মায়ের স্মৃতি ও ডোরিনের মনে মৃত পুত্রের স্মৃতি কি জট পাকিয়ে গেল? আমার মস্তিষ্ক কি সত্যিই দুর্বল হয়ে পড়েছে? না হলে ডোরিনকে আজ এরকম লাগছে কেন?

চুল আঁচড়িয়ে দিয়ে ডোরিন হঠাৎ নিচু হয়ে আমার দুই গালে ওর ঠোঁট দুখানি স্পর্শ করল, ঠিক যেমন আমার মা করতেন! তারপরে বলল, "শান্ত ছোট ছেলেটির মতো আমার পেছন-পেছন চলে এস খেতে। খাবার হলটি একতলায় দেখে এসেছি।"

খাবার ঘর প্রায় ভর্তি। ডোরিন ঢুকতেই ওর দিকে দৃষ্টি পড়ল সবার। কিন্তু আমি যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছি না, স্বপ্নচালিতের মতো বসে পড়লাম যেখানে ও পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। ডোরিনের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। ও কে? নারী না দেবী? ওকে তো আমি চিনতে পারছি না?

ডোরিন বলল, "কি হয়েছে তোমার, কনি?"

"মাথার ভিতরে কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলে কলকাতায়?"

"হ্যাঁ, বলেছে নার্ভাস ব্রেকডাউন। মাঝে-মাঝে আমার অদ্ভুত লাগে কিছুদিন ধরে। মনের অসুখ? শরীর তো কিছু খারাপ লাগে না।"

"পেট ভরে খাও তো। সেরে যাবে ও-ভাবটা। আমার সঙ্গে কথা বল।"

"কি বলব?"

"তবে আমিই বলছি। এখানে যদ্দিন আছি শাড়ি পরেই সকাল দুপুর ও রাতের খানা খেতে আসব। কিন্তু চারখানা শাড়িতে একমাস কুলোয় না। কিনে দেবে আরো কয়েকখানা, বেরামপুর গিয়ে?"

"তোমাকে কিছু দিতে গেলে তুমি চটে যাও যে? ভাব আমি দয়া করে দিচ্ছি?"

"আজ আমি নিজেই চাচ্ছি।"

ও আমাকে জোর করে তিন কাপ কফি খাওয়াল। ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে বলল, "ঘুমোও তো এখন যতটুকু পার! এজন্যেই তো সঙ্গে আসতে হল। আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"



৩১

ঘুমিয়ে বেশ ভালোই বোধ হচ্ছিল। দুপুরবেলার অদ্ভুত ভাবটা কেটে গেছে, এখন লজ্জা করছে। ডোরিন কি ভাবল সেকথা ভেবে।

বয় চা নিয়ে এলে ডোরিন বলল, "দু-কাপ তুমি নিজেই ঢাল, সব সময়ে দাস-দাসীর ওপর নির্ভর করতে নেই। এটা কলকাতা নয়, যোশেফও নেই এখানে।"

চা ঢালতে-ঢালতে বললাম, "এখনকার মতো ঢালছি, কিন্তু নার্স যখন সঙ্গে এসেছে তখন এটা তারই কাজ।"

"যাক, তোমার হাত আর কাঁপছে না, কনি। দুপুরে খাবার সময় খুব কাঁপছিল।"

"বল তো ঐ নীল বুসসার্টটা কোথায় পেলে? ওটা তো আমার নয়? কিন্তু মানিয়েছে ভালো ট্রাউজারের সঙ্গে। কাপড়টাও বেশ মোলায়েম।"

"আমি সেলাই করেছি। ইচ্ছে ছিল পয়লা জানুয়ারী তোমাকে দেব, কিন্তু হয়ে ওঠেনি।"

"আমাকে না জানিয়ে হঠাৎ পালিয়ে গেলে কেন বল তো?"

"কই আর পালাতে পারলাম? ফিরে তো আসতেই হল।"

"কিন্তু পালাতে গেলে কেন?"

"খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বার করতে চাচ্ছ? কিছুতেই পারবে না।"

"ডায়মণ্ড নাইটক্লাবের চাকরিটা?"

"দিন দশেক বাকি ছিল, কিন্তু তোমার জীবনের চাইতে টাকা বড় নয়। তোমার জীবনের অনেক মূল্য আছে।"

"সে মূল্যটা কে দেবে?"

"যিনি দেবার মালিক তিনি দেবেন। চল এবার সমুদ্রের পাড়ে বেড়িয়ে আসি।"

জোর হাওয়া, ডোরিন শাড়ি সামলাতে নাজেহাল। আমার পরিধানে সর্ট ও সার্ট। জিগগেস করলাম, "সর্ট এনেছ, তো?"

"সর্ট আমার নেই, কলকাতায় দরকার হয় না তো। মেয়েদের সর্ট পরা বিশ্রী লাগে।"

"বেরামপুর থেকে দুটো রেডিমেড কিনে আনতে হবে, এত হাওয়ায় ফ্রকও উড়ে তোমার মাথায় চড়ে বসবে। সর্টই দরকার।" ও আঁচলটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে হাঁটু পর্যন্ত পেঁচিয়ে বাঁধল।

"এখন হাঁটবে কি করে? হামাগুড়ি দেবে?"

"ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলতে হবে। তুমি যেন সাপ হয়ে আমাকে তাড়া কর না!" নিজের রসিকতায় ও নিজেই হেসে উঠল। আমি হাসতে পারলাম না।

রাত্রের আহারের সময় ম্যানেজারকে বললাম ওদের গাড়িটা পেলে একদিন বেরামপুর ঘুরে আসতে চাই, অবিশ্যি ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দেব, দুপুর বারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত যথেষ্ট। সে বলল, "কালই যেতে পারেন। দুজনের দুপুরের খাবার সঙ্গে নিতে পারেন। আমাদের নতুন ড্রাইভার ইংরেজী জানে না কিন্তু হিন্দী বোঝে। ফ্লাস্কে আপনাদের কফিও দিতে পারি, সুপও দিতে পারি যদি বলেন।"

"বেশ তাহলে কালই ঠিক রইল, কেমন? সুপ আর কফি দু-ই পেলে ভালোই হয়। শুকনো খাবার গলায় আটকে যাবে।"

ভোর-ভোর সময় ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ডোরিন আগেই জেগেছে। বলল, "বেশ ঘুম হল কনি। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দে বেশ ঘুম হয় দেখছি।" ওকে কুম্ভকর্ণের ঘুমের গল্পটা শোনালাম। ওর বেশ মজা লাগল। তারপর বললাম, "বেরামপুর স্টেট ব্যাঙ্কে কিছু টাকা তুলতে হবে। একটার আগেই ওখানে পৌঁছব। তোমার কোমরের মাপ কত ইঞ্চি?"

"তোমার সাংসারিক বুদ্ধি কিছুই হয়নি এখনো, কনি। কোনো নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোককে এমন অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করতে হয় না।"

সত্যিই তো, ওর সঙ্গে তো আমার কোনো সম্পর্কই নেই? আপনার বলে মনে হলেই কি আপনার জন হয়? আমার কাছে ও সত্যিই পরনারী, ওর কাছে আমি পরপুরুষ বই তো নয়? শরীরের মাপ জানতে চাওয়া আমার পক্ষে

তো নেহাত বেকুবি ? কিন্তু যে হাওয়া তাতে শাড়ি পরে বেড়ানো চলে না। এখানে মেমসাহেবরা তো দেখছি সর্ট পরেই বেড়াচ্ছে। ওকে বললাম, "তবে এক কাজ কর। যতক্ষণ আমি ব্যাঙ্কে থাকব তার মধ্যে তুমি ছুটো সর্ট কিনে আনতে পারবে তোমার জন্যে, আর এক শিশি অডিকোলোন। ড্রাইভার হিন্দী জানে, যদি রেডীমেড কথাটা না বোঝে, তবে বল তৈরি কাপড়ের দোকান। নাও তিরিশটা টাকা।"

"বাপরে বাপ, আমাকে যেন পাখি পড়ানো পড়াচ্ছ! আমি মোটেই হাবাগঙ্গারাম নই। আঠারো বছর বয়স থেকে দুঃখেকষ্টে ঝামাপোড়া হয়ে একা-একা নিজের পথ নিজে তৈরি করে আসতে হয়েছে।"

ওর কথারই যেন প্রতিধ্বনি করল এই পুরোনো ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়িটা। ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করতে-করতে এবড়ো-খেবড়ো উঁচুনিচু পথ দিয়ে কখনো এ-কাত কখনো কখনো ও-কাত হয়ে ছুটে চলেছে। হাত বাড়িয়ে ডোরিনের একটা হাত ধরলাম। ও বলল, "গাড়ি উল্টে যাবে না তো কনি ?"

"আমি তো আছি তোমার পাশে ? উল্টে গেলেও তোমাকে ব্যথা পেতে দেব না।"

"আবার মন্তরের জোরে ?"

"হ্যাঁ।"

ড্রাফ্‌ট ভাঙিয়ে বাইরে এসে দেখি ডোরিনও ফিরে এসেছে। কিনেছে একটা টকটকে লাল, আরেকটা টকটকে নীল সর্ট। দেখে বললাম, "কোমর এত ছোট ? তোমার আঁট হবে না ? লম্বায়ও ছোট, হাঁটু পর্যন্ত নামবে না।"

"আঁট মোটেই হবে না। দেখ একটা প্লাষ্টিকের কানঢাকা টুপিও পেয়ে গেলাম, চুল নোনাজলে ভিজে চটচটে হবে না। দাও টাকাটা আমার কাছে, আমার হ্যাণ্ড ব্যাগে রেখে দি। তুমি যেরকম ভালকানা, হারিয়ে ফেলবে। চারটের আগে শাড়ির দোকান খুলবে না শুনলাম।"

একটা বড় বটগাছের তলায় বসে খেতে শুরু করলাম। সামনে পুকুর, বেশ হাওয়া লাগছে। বেডের টিফিনবাক্সে দেখলাম প্লেট কাপ ছুরি কাঁটা চামচ গেলাস সবই দিয়েছে, খাবার তখনো বেশ গরম আছে, সুপ ও কফি ফ্লাস্কে। ডোরিন নিপুণহস্তে বার করে সব সাজিয়ে রাখল। দুজনে খেতে শুরু করলাম। মেয়েদের

হাতের ছোঁয়ায় খাবারের স্বাদ যেন অনেক ভালো লাগে। খিদেও খুব পেয়েছিল। খাওয়ার পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বোধহয় প্রায় ঘণ্টা দুই টানা ঘুম হল। ডোরিন জেগেই বসেছিল।

বাজার যাবার পথে এক মাঠে দেখি ফুটবল খেলা হচ্ছে। মাঠের চার পাশে বিস্তর লোক বসে, ছেলেছোকরার দলই ভারি। পাঠ্যজীবনে খেলার নেশা ছিল প্রচণ্ড। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম, ডোরিনও নেমে পড়ল আমার সঙ্গে। চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি, ডোরিন ফিরে যাবার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে, একজন সরকারী চাপরাসীর মতো লোক পেছন থেকে ডাকল, "মাস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেলাম দিয়েছেন।" ভিড়ের মধ্যে পথ করে সে আমাদের যেখানে নিয়ে গেল সেখানে দুজন গণ্যমান্য ব্যক্তি বসে আছেন বোঝা গেল, পার্শ্ববর্তীনী দুজন নিশ্চয়ই ওঁদের সহধর্মিনী। গণ্যমান্য মনে হল কারণ এঁদের মাথার উপরে শাদা ধবধবে একটি চাঁদোয়া, বাকি দর্শকরা রোদে বেগুনপোড়া হচ্ছে।

আমার সঙ্গে একজন মহিলা আছেন, তাই দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠলেন। একজন বললেন, "আমি হনুমন্ত রাও, এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, আর ইনি বিভীষণাপ্পা, এখানকার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসন জজ। ইউ আর ভেরি ওয়েলকাম। দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে তোমরা রোদে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছ। চারটের সময় আরম্ভ হয়েছে, আরও পনর মিনিট খেলা চলবে। এই ভদ্রমহিলারা আমাদের স্ত্রী। ইনি আমার মিসেস, উনি মিসেস বিভীষণাপ্পা।"

নাম শুনে মনে হল হনুমান এবং বিভীষণ দুজনেই যখন এখানে উপস্থিত তখন আমরা রাম-সীতা নয় তো কি? আমার অবিশ্যি পদ্মপলাশ নয়ন এবং আজানুলম্বিত বাহু নেই কিন্তু ডোরিনকে সীতার সঙ্গে তুলনা করলে খুব বেশি ভুল হবে কি? নিজের নাম আমিও বললাম, ওরা ডোরিনকে আমার স্ত্রী বলেই ধরে নিল।

ঠিক পাঁচটায় খেলা শেষ হবার আগে একটি দল এক গোল খেল। তুমুল জয়ধ্বনি। জজসাহেব ও তাঁর মেমসাহেব মুচকি হাসি হাসতে লাগলেন। জজমেম-সাহেব ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপরে যে সিল্ডখানি ছিল সেটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন। জনতা বেশ শৃঙ্খলা রেখে মাঠের চারপাশ ছেড়ে চাঁদোয়ার দিকে এগিয়ে এল।

হনুমন্ত রাও বললেন, "মিস্টার সানিয়াল, এ-খেলাটা স্থানীয় একটি অনুষ্ঠান বিশেষ। খেলল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেস ইলেভেন ভার্সাস ডিস্ট্রিক্ট জাজেস ইলেভেন।

এখন একটি সমস্যা দাঁড়িয়েছে। আমার দল হেরে গেছে, সুতরাং আমিও হেরে গেছি, তাই আমার সিল্ড দেওয়া ভালো দেখাবে না। মিস্টার বিভীষণায়ার দল জিতেছে, উনিও নিজের দলকে নিজে পুরস্কার দেওয়ায় আপত্তি করবেন। এই সমস্যার সমাধান একমাত্র করতে পারেন মিসেস সানিয়াল।"

"কি রকম?"

"প্রাইজটা উনিই দিলে সব দিক রক্ষে হয়।"

"ওকেই জিগগেস করুন।"

ম্যাজিস্ট্রেটের মেমসাহেবের সনির্বন্ধ অনুরোধে ডোরিনকে রাজী হতেই হল। জাজেস ইলেভেনের ক্যাপ্টেন এই সুন্দরী মেমসাহেবের হাত থেকে সিল্ড নিতে গিয়ে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলে বসল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।"

উঠে আসছিলাম কর্তাব্যক্তি ও তাঁদের কর্ত্রীদের ধন্যবাদ দিয়ে, ওঁরা ছাড়লেন না, বললেন, "কাছেই আমাদের ক্লাব, চা তৈরিই আছে প্রায়। না খেয়ে গেলে দুঃখিত হব।"

পাণ্ডবদের বনবাসকালে যখন পাষণ্ড রাজা জয়দ্রথ সাঙ্গপাঙ্গ দল নিয়ে মৃগয়ায় গিয়েছিল তখন বনমধ্যে পর্ণকুটিরের সামনে দ্রৌপদীকে দেখে সঙ্গীদের বলেছিল—এই নারীকে দেখলে মনে হয় আমাদের নারীরা বানরীসমা। ডোরিনের কাছেও অন্য নারীরা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, দক্ষিণী নারীদের তো কথাই নেই।

কথায়-কথায় বললাম গোটা কয়েক সিল্কের শাড়ি কিনতেই বেরামপুর এসেছি, কেনা হলেই গোপালপুর ফিরে যাব। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, "দারুণ ঠকবে। দামও বেশি নেবে, জিনিসও খারাপ দেবে। আমার চাপরাসীকে সঙ্গে দিয়ে দেব।"

ম্যাজিস্ট্রেটপত্নী চা ঢালতে-ঢালতে প্রস্তাব করলেন তিনিও সঙ্গে যাবেন, কারণ বাড়ি ফিরে গিয়ে এখন বিশেষ কিছু করবার নেই ওঁর। জজপত্নীর কি একটা বাধা আছে নইলে তিনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারলে খুশি হতেন।

স্বামীকে হেঁটে বাড়ি ফিরতে বলে ম্যাজিস্ট্রেটপত্নী তাঁর চাপরাসীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে গেলেন আমাদের গাড়ির আগে-আগে।

দোকানের নামটি পড়তে পারলাম না। অক্ষরগুলো যেন উপুড়-করা হাঁড়ি কলসী, এখানকার তেলেগুভাষার মতোই লালিত্যহীন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেমসাহেবকে দেখে দোকানের মালিক তার ঢাক মার্কা

ভুঁড়িটা নিয়েই বাঁকা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। চেহারা বানরের মতো, রোমশ, মাথার সামনের দিকটা কামানো, বাকি চুল ঝুঁটিবাঁধা, কপালে শ্বেত ও রক্ত চন্দনের তিলক। চেয়ারের ব্যবস্থা নেই, আমরা তিনজন ফরাসের ওপরেই বসলাম। দোকানের দুটো লোক গাঁট-গাঁট শাড়ি নামাচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নীর ধমক খাচ্ছে। ওরা হিন্দীও জানে না, ইংরেজীও জানে না, উনি না আসলে বেজায় ফ্যাসাদে পড়তাম দেখছি।

"মিস্টার সানিয়াল, আপনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন, এ ব্যাপারটা মহিলাদের নিজস্ব। সুন্দরী স্ত্রী যাই পরবে তাতেই মানাবে, কিন্তু যা বেশি মানাবে তাই বার করাচ্ছি।"

মহিলাটির দাপটে দোকানের লোকেরা তটস্থ। কাপড়গুলো চটকে দেখছেন কেমন জমিন, কেমন আঁচলা কত বহর, আর অনর্গল বুঝিয়ে যাচ্ছেন ডোরিনকে। তিনখানার জায়গায় চারখানা শাড়ি পছন্দ করা হল। মোট কত টাকা দিতে হবে শুনে মহিলাটি হুঙ্কার দিলেন। আমাকে বললেন, "সাড়ে তিনশো টাকার একপয়সাও বেশি দেবেন না, এরা দারুণ ঠকায়। রঙগুলো আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা বলুন।"

টাকার অঙ্কটা শুনে ডোরিন হকচকিয়ে গেছে বুঝলাম। ওর জন্যে এত টাকা লাগছে? ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নীর মুখে বিজয়-গর্ব, চল্লিশ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন! ডোরিনকে বললাম টাকাটা বার করে দিতে ওর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে।

কলকাতায় ফিরে যাবার আগে ওঁদের বাংলোতে একদিন থাকার নিমন্ত্রণ করে মহিলাটি বিদায় নিলেন। ধন্যবাদ জানালাম। আমাদের মতো অপরিচিতদের জন্যে এ-কষ্ট স্বীকার উনি নাও করতে পারতেন তো?

আবার চললাম গোপালপুরের পথে। এ পথের শেষ আছে, কিন্তু আমরা দুজন যে পথে চলেছি তার শেষ কোথায়? ডোরিন কাপড়ের প্যাকেটটি আঁকড়ে ধরে আছে। ছোট বাচ্চা খেলনা পেয়ে যেমন দু-হাতে আঁকড়ে ধরে! আমরা সবাই তো সংসারের অনেক কিছুই এরকমই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই? ফুলকাটা ফ্রকে ডোরিনকে দেখাচ্ছে একটি পুতুলের মতো, সুন্দর পুতুল, কিন্তু এ পুতুলের প্রাণ আছে, কথা বলে, হাসে, কাঁদে।

ডোরিন বলল, "তোমার মোটা টাকা খরচ হয়ে গেল, কনি।"

"পুতুলকে সাজাতে ভালো লাগে। খুব ছোট যখন ছিলাম বাবা একটা খুব বড়

পুতুল কিনে দিয়েছিলেন। কাগজ কেটে-কেটে তাকে সাজাতুম, মা হাসতেন ; মনে হচ্ছে তুমিও সেরকম একটি পুতুল।"

"পুতুল খেলে তো মেয়েরা!"

"কিছুদিন পরেই পুতুল সাজানোর শখ কেটে গেল, বাবা কিনে দিলেন একটা এয়ারগান। সেটা ঘাড়ে নিয়ে বীরদর্পে সারাবাড়ি ঘুরে বেড়াতাম।"

"তোমার বীরদর্প আজ ঘুচে যেত, যদি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলতাম তুমি আমাকে ফুসলিয়ে বার করে এনেছ। তুমি আমার স্বামী নও, কেউ নও।"

"আমি তোমাকে এবার আনিনি, তুমি স্বেচ্ছায় এসেছ। তুমি আমার কেউ নও এটাও মিছে কথা। কানে-কানে বলছি তুমি আমার কে, কাছে সরে এস।"

রাত্রে খাবার পরে ঘরে ফিরছি, একটি বয় এসে জানাল চার নম্বর ঘরের সাহেব আমাকে ডাকছেন। ডোরিনকে ঘরে পাঠিয়ে আমি ভদ্রতার খাতিরে বয়টির সঙ্গে চললাম।

একটি বয়স্ক ভদ্রলোক কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। লাউঞ্জে, খাবার ঘরে, বাগানে, সমুদ্রের ধারে এঁকে প্রায়ই দেখি। সর্বদাই খাকি ট্রাউজার ও খাকি সার্ট পরিধানে। ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক বললেন, "খুব ব্যস্ত? বস এই চেয়ারে।"

"কি বলবেন বলুন।"

"বৎস, আজ মধ্যাহ্নভোজনে তোমাদের দেখিনি, কোথায় গিয়েছিলে অভিসারে?"

"স্বামী-স্ত্রী কি অভিসারে যায়?"

"প্রণয়ী-প্রণয়িণী যায়, তোমরা স্বামী-স্ত্রী নও। কিন্তু আমি সংস্কারমুক্ত পুরুষ। সমাজে যেগুলো নিষিদ্ধ তার সবই যে খারাপ তা মনে করি না। বিশুদ্ধ প্রেমের চাইতে নিষিদ্ধ প্রেমের ধক অনেক বেশি। এই শেষেরটা মনের সঙ্গে মনের মিল, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিল। তবে প্রেম ও কামের মধ্যে তফাত আছে।"

"আপনার নাম কি, আপনি কে, জানি না। এসব তত্ত্বকথা কার মুখ থেকে বেরোচ্ছে জানতে পারি কি?"

"বিঠলরাম হরিরাম ধাবলে। বয়েস ষাট, জাতে মারাঠীব্রাহ্মণ, মতবাদে উদারপন্থী।"

"নামটা কোথায় দেখেছি যেন।"

"পরশুদিনের কাগজে, মারাঠীভাষায় এবছরের একাডেমী পুরস্কার আমিই পেয়েছি।"

"আপনি কী আর্মির অফিসার ছিলেন ? সব সময়েই খাকি পোশাক পরেন যে ?"

"আর্মি অফ রাইটার্স। বন্দুক নয়, কলমই আমার হাতিয়ার। আমার দশখানা বই বেরিয়ে গেছে, আর দশখানা হলেই একাজে ইস্তফা দেওয়া যাবে। তোমার নাম ?"

"সানিয়াল।"

"ভারতমাতার কোন অঞ্চলের নিধি তুমি ?"

"ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমরা বলি পশ্চিমবঙ্গ।"

"ওয়েস্ট বেঙ্গল ! একদিন বেঙ্গল সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছিল জ্ঞানবিজ্ঞান-ললিতকলায়, আজ বেঙ্গল ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তোমার বান্ধবীটি কি ইংরেজ, না কন্টিনেন্টাল ?"

"বান্ধবী নয়, স্ত্রী।"

"বাজে কথা, আরেকদিন তোমার সঙ্গে আলাপ হবে। নমস্তে।"

সেদিন নিচের বাগানে বেড়াচ্ছিলাম। ডোরিন ঘরে বসে বই পড়ছে। বিঠলরাম খাবলে বসবার ঘর থেকে ডাক দিল, "শোন হে ছোকরা, তোমরা দুটি কপোত-কপোতী খুবই আনন্দে আছ মনে হয়।"

"বল স্বামী-স্ত্রী, কপোত-কপোতী উপমাটি ঠিক হল না।"

"মোটেই নয়। স্বামী-স্ত্রী এরকম ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে চলে না, বসে না, কথা কয় না। এভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে না হাঁ করে, এত ফিসফিস করে না, এত ফিকফিক করে হাসে না।"

"হনিমুন কাপ্‌ল্। সবে বিয়ে হয়েছে।"

"হনিমুন কাপ্‌ল্ ঢের দেখেছি। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।"

"এই হাটের মধ্যে বসে তোমার লেখা আসে কি করে ?"

"যাদের দেখি তারাই আমার উপন্যাসের মালমশলা।"

"আমরাও তাহলে সেই দলে ?"

"নয় তো কি ? আমি বারোমাস হোটেলে থাকি। এখানে তিনমাস আছি, এরপরে যাব মাদ্রাজ, তারপরে কন্যাকুমারী, তারপর বম্বে। সব জায়গায় হোটেল

ঠিক করা হয়ে গিয়েছে একবছর আগে। অনেকরকম লোক দেখি, তারাই আমার উপন্যাসের চরিত্রকল্পনায় প্রেরণা যোগায়।"

"বিয়ে করনি?"

"করেছিলাম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই স্ত্রী মারা যায়। নিঃসঙ্গ জীবনই আমাকে কলম ধরিয়েছে। একটা কথা বলি, শুনবে?"

"শুনব না কেন?"

"মেনে নেবে? যদি দেখ তোমাদের সন্তান আসার সম্ভাবনা হয়েছে তবে নষ্ট করে ফেল না।"

"তোমার কথা শুনে হাসি পায়। নষ্ট করব কেন? স্বামী-স্ত্রীরা কখনো সন্তান নষ্ট করে?"

"বাজে কথা রেখে দাও বাপু, তোমরা বিবাহিত নও। লেখকরা গুণী লোক সব বুঝতে পারে। বলছিলাম এই যে সত্যিকারের ভালোবাসার ফলে বিবাহবন্ধনের বাইরে যারা জন্মায় তাদের বেশির ভাগই প্রতিভাবান হয়। কালোবাজারে যেমন অনেক সেরা-সেরা জিনিস পাওয়া যায়, প্রেমের কালোবাজারেও অনেক জিনিয়াসের জন্ম হয়।"

"নেহাত বাজে কথা!"

"গত দুই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লোকেদের হিসেব আছে আমার কাছে। ফ্যাক্টস অ্যাণ্ড ফিগার্স ডোণ্ট লাই। আমি নিজেও ছোটখাটো একটা জিনিয়াস বলতে পার, কিন্তু আমার বাবা কে ছিল জানি না। মা ও প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতেন।"

"আমার মতো একজন অপরিচিত লোকের কাছে নিজেকে জারজ সন্তান বলে গর্ব করছ?"

"আমি সংস্কারহীন পুরুষ। সত্যি বলতে লজ্জা পাব কেন? তোমরা দুটি মিলেছ ভালো, যেন হরগৌরী। সন্তান হলে অনাথ আশ্রমে দিও না, বা গলা টিপে মেরে ফেল না।"

"তোমার কথাবার্তা ভারি বিশ্রী!"

"আচ্ছা বল তো, তুমি আগে ওর প্রেমে পড়েছিলে, না মেয়েটি আগে তোমার প্রেমে পড়েছিল?"

"তুমি আচ্ছা পাগল দেখছি! এসব শুনে তোমার কি হবে?"

"চরিত্র সৃষ্টি করাই উপন্যাসের লক্ষ্য। আমার কথার জবাব দাও। যা-কিছু বলবে তা আর কেউ জানবে না। প্রেমে পড়ার লক্ষণ কি? অদর্শনে হা-হুতাস অগ্নিমান্দ্য অনিদ্রা। দর্শনে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। নিকট সান্নিধ্যে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন ও নাড়ীবর্গ দ্রুততর। আলাপ-আলাপনে সহসা অকারণে ছেদ ও সতৃষ্ণ দৃষ্টি। স্পর্শে তড়িতাঘাত। কেমন, মিলছে?"

"তবে বলি আমরা দুজনে একসঙ্গেই প্রেমে পড়েছিলাম।"

"প্রথম দর্শনেই?"

"প্রথম দর্শনের অনেক পরে। যেমন ধর, হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলাম নামলাম এসে বেরামপুরে। বেরামপুর থেকে গোপালপুর? অর্থাৎ ক্রমে-ক্রমে।"

"তাহলে হঠাৎ-মোহ নয়, সত্যিকারের ভালোবাসা? ভালোবাসা সব চাইতে দামী জিনিস। এখন যেতে পার। সুখী হও, মেয়েটিকে সুখী কর।"

ভদ্রলোকের জেরার বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘরে ফিরে এলাম। ডোরিন বলল, "কনি, তুমি বাঙ্গালোর থেকে টেগোরের যে বইগুলো কিনে দিয়েছিলে, সেগুলো সব পড়া হয়েছে। কি একটা আকুলতা ফুটে উঠেছে কবিতাগুলির মধ্যে! সারাজীবন কবি যেন কাকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। কখনো তাকে বলেছেন প্রিয়, কখনো প্রভু, কখনো রাজা, কখনো সখা। কখনো দেখেছেন খুব কাছে, কখনো দূরে, কখনো চোখের সামনে, কখনো আড়ালে। কখনো পেয়েছেন, কখনো পেয়েও যেন পাননি, পেয়েও যেন সাহস করে ভাবতে পারছেন না যে সত্যিই পেয়েছেন।"

"ডো, তুমি পেতে চাচ্ছ না, তাই পাচ্ছ না। চোখ বুজে আছ তাই দেখছ না।। দূরে সরে দাঁড়ালে কি পাওয়া যায়? তবে তোমার স্বাস্থ্য আবার ফিরে পেয়েছ মনে হয়। গলার হাড় দাঁত বার করেছিল, এখন তা ঢেকে গেছে। গালের ভাঁজ ভরাট হয়েছে। রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, রক্তের লালচে আভা ফুটে বেরিয়েছে। আমি কেমন ডাক্তার বল তো?"

"হাতুড়ে! বরং আমার নার্সিঙের গুণ আছে। তোমার চোখের পাশে কালি আর নেই, গোমড়া মুখে হাসি দেখা দিয়েছে, তিনবেলা রাক্ষসের মতো খাচ্ছ। কি. গো অমন বোকা-বোকা হাসি হাসছ কেন? দিন-দিন বোকা হয়ে যাচ্ছ।"

"তুমিই বোকা বানাচ্ছ, আবার তুমিই বোকা বলছ! তোমার চোখের

দিকে চাইলে বোকা হয়ে যাই। এবার দেখছি সমুদ্রের দিকে, এখন কেমন দেখাচ্ছে?"

"অনেক ভালো। খুব সুন্দর।"

"রাজপুত্তুরের মতো?"

"হ্যাঁ ডার্লিং, তুমি আমার কাছে রাজপুত্তুরই বটে।"

"তবে আর দেরি কেন? বেরামপুরে ক্যাথলিক গীর্জা আছে। নকল মিসেস না থেকে কলকাতা যাবার আগেই সত্যিকার মিসেস সানিয়াল হও না? আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, তোমার কি দয়া হবে না?"

নকরদার চিঠি এসেছে। লিখেছেন: ব্রাদার কাঞ্চন, হঠাৎ চলে গেলি, আমাকে বলে গেলি না? গত রোববার তোদের ওখানে গিয়েছিলাম দুপুরে। ভালো লোক রেখে গেছিস পাহারায়! যোশেফ কুম্ভকর্ণের মাসতুতো ভাই, এমন ঘুম ঘুমোচ্ছিল যে ইচ্ছে করলে দরজা ভেঙে সব জিনিসপত্তর লরী বোঝাই করে নিয়ে আসতে পারতাম। তোর ঠিকানা ওর কাছ থেকেই যোগাড় করেছি।

একটা খারাপ খবর আছে। তোদের উপরতলার ম্যাক সাহেব মারা গেছে। সকালবেলায় বেড়াতে বেরিয়েছিল, কয়েক পা গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আর জ্ঞান হয়নি। পাড়ার লোক ধরাধরি করে যখন নিয়ে এল তখন প্রাণ বেরিয়ে গেছে। তোর কাছে ওর কথা শুনেছি কিন্তু আলাপটা ঘটে উঠল না। কার কখন ডাক আসবে কেউ জানে না।

আরেকটা খবরও আছে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, স্টুডিও তুলে দিয়েছি, পাট গুটিয়ে চলে যাচ্ছি পণ্ডিচেরার আশ্রমে। বাকি জীবনটায় শান্তি পেতে চাই, ওখানেই কাটাব। কোনো ব্যক্তিগত ভগবান লীলা করছেন এবং মানুষকে স্বর্গে বা নরকে পাঠান এটা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আইনস্টাইনের মতো বিশ্বাস করি দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর এই জগতের পেছনে রহস্যময় অবর্ণনীয় শক্তি আছে।

শীঘ্রই রওয়ানা হচ্ছি, কিন্তু কবে কোন ট্রেনে যাচ্ছি বলব না, না হলে তুই কষ্ট করে বেরামপুর এসে দেখা করবার চেষ্টা করবি। আমার জন্যে কেউ কষ্ট করবে এটা কোনোদিনই পছন্দ করি না।

তুই বলতিস আমি স্ত্রীলোক বিদ্বেষী। সেটা হয়তো সত্যি কথা। জীবনে যা দুঃখ পেয়েছি তা ওদের কাছ থেকেই। এটা আমার দুর্ভাগ্য। কাউকে দোষ দিই না। হয়তো বাইরের জগতের অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে ওরা পুরুষের সম্বন্ধে অবিশ্বাস পোষণ করে, এবং সেই সঙ্গে একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ। ওদের ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা সীমিত বলেই হয়তো ওরা স্বার্থপরতা সঙ্কীর্ণতা ও কপটতার আশ্রয় নেয়। ওদের বিচার করবার অধিকার আমার নেই, তোরও বয়েস হয়নি তলিয়ে বুঝবার।

জীবনে অনেক কিছু আমি পাইনি, তবুও এই জীবনটাকে আমি পরিপূর্ণভাবে ভালোবেসেছি। যাদের কাছে দুঃখ পেয়েছি তাদের ওপর অভিমান করে থাকলে আমার নিজেকেই কষ্ট দেওয়া হত। তাই শান্ত মন নিয়ে চলে যাচ্ছি পণ্ডিচেরীর আশ্রমে শান্তির আশায়। দুঃখ এই যে শ্রীঅরবিন্দ বেঁচে থাকতে ওখানে যাইনি।

তোকে আশীর্বাদ জানাবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু স্নেহ জানাবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আশা করি ওখানে গিয়ে তোর শরীর ভালো হচ্ছে।

ইতি—তোর নরুদা

ডোরিন জিগেগেস করল, "কার চিঠি কনি?"

"এই নাও পড়ে দেখ, ইংরেজিতে লেখা।"

ডোরিন চিঠিটা পড়ছে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ওর কাছেও কি আমার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত দুঃখ পাওয়ার আছে? নিশ্চয়ই না।

পরদিন আবার বিঠলরাম ধাবলের খপ্পরে পড়লাম। ডাকল, "শোন ইয়ংম্যান।"

"আমাকে বলছ?"

"হ্যাঁ, তোমার নাম কি সত্যিই সানিয়াল, না আর কিছু?"

"আচ্ছা ভদ্রলোক তো তুমি! সভ্যতার ধার ধারো না একেবারেই?"

"ভদ্রলোক আর কটা দেখা যায় আজকাল? ধাপ্পার ওপরেই তো জগৎটা চলছে। তোমরাও তো ধাপ্পা দিচ্ছ।"

"নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে।"

"বাজারে আর তেল আছে কই? পায়ে তেল দিয়ে হোমরাচোমরাদের খুশি রাখতে, অথবা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুতেই তো সব তেল খরচা হয়ে যাচ্ছে!"

"তুমি কি কমিউনিস্ট ?"

"আমি বাস্তববাদী, তাই সুবিধাবাদী। লোকের মন নোংরা হয়ে গেছে, ওরা মাছি-ভন-ভন-করা নোংরা সাহিত্য পড়তে চায়, আমি সেইরকমই সৃষ্টি করে পয়সা রোজগার করি। আমার প্রথম বইখানা কোনো প্রকাশকই নিল না, বলল নীতি-মূলক বই বাজারে কাটবে না, হিতোপদেশ কেউ শুনতে চায় না। অথচ ওটাই ছিল আমার সবচেয়ে সেরা বই।"

"এখন একটা লিখছ ?"

"এটায় তোমার নাম দিয়েছি শান্তারাম আপ্তে। মারাঠী বইয়ে মারাঠী নাম।"

"তবে রেহাই পেলাম না ?"

"রেহাই পাবেই বা কেন ? তবে ফ্রি লাভ ব্যবস্থাটি খারাপ নয়। স্ত্রী নিয়ে ঘর করা চলে, প্রেম করা চলে না। তোমার ঐ বান্ধবীটিকে নিয়ে যদি পাকাপাকি ভাবে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে যাও তবে সব মাটি হবে। প্রেম করছ কর, কিন্তু বিয়ে কর্মটি করো না, ঠকবে।"

"তুমিও তো একদিন বিয়ে করে ঘর বেঁধেছিলে ?"

"প্রকাণ্ড ভুল করেছিলাম। ছমাসের মধ্যেই ভুলটা বুঝেছিলাম বলেই বেশি দূর আর এগোবার চেষ্টা করলাম না। চায়ের সঙ্গে দিনকয়েক আর্সেনিক খাইয়ে শ্রীমতীকে পরপারে যাত্রা করিয়ে দিলাম। ডাক্তারবাবু বুঝতে পারল কচু। যে-কদিন বিছানায় পড়েছিল, কি সেবাটাই করলাম! লোকে আমাকে ধন্য-ধন্য করল।"

"কি সাংঘাতিক লোক তুমি! স্ত্রীকে হত্যা করলে ?"

"মৃতা স্ত্রীর নামে মন্দির গড়িয়ে দিয়েছি। লোকে জানে আমার মতো স্বামী হয় না। মন্দিরের দেবতা জানলেও কথা বলতে পারে না। আজ মহারাষ্ট্রে বিঠল-রাম হরিরাম ধাবলের নাম কে না জানে ? মারাঠী ভাষায় শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বি. এচ. ধাবলেকে ?"

"আমি জানলাম তুমি একজন খুনে।"

"তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"কিন্তু ভগবানের কাছে গিয়ে কি জবাব দেবে ?"

"ভগবান বলে কেউ নেই। থাকলে জগতের এ-হাল হত না!"



৩২

বিকেলে চায়ের সঙ্গে এল একটা চিঠি। হাতের লেখা অপরিচিত। খামটা ছিঁড়ে ফেলেই সইটা দেখলাম শ্রীশ্যামসুন্দর মল্লিক।

শ্রীশ্রীহরিশরণম

কাঞ্চন বাবাজীর বরাবরেষু—

যথাবিধি ভগবৎস্মরণান্তে এই পত্রদ্বারা তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার ওখানে ইতিমধ্যে দুই দিবস গিয়াছিলাম। একদিবস শ্রীমতী পটলীর স্বহস্তে প্রস্তুত সন্দেশও নিয়া গিয়াছিলাম। তোমাকে খাওয়াইতে না পারায় শ্রীমতী পটলী মনোকষ্ট পাইয়াছে।

তুমি শ্রীমতীকে সেদিন দেখিয়াছ। শ্যামবর্ণ হইলেও মুখশ্রী সুন্দর, উহার সঙ্গীতও শুনিয়াছ, আগামী বৎসর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিবে, সে-হেতু শিক্ষিতাও। রন্ধন করিতে জানে, গৃহকর্ম শিখিয়াছে।

বৈশাখ মাসে শুভ বিবাহের কয়েকটি দিন আছে, সুতরাং কালবিলম্বে প্রয়োজন দেখি না। তোমার কোষ্ঠি পাইলেই জ্যোতিষী দ্বারা শুভদিন নির্ধারণ করা যাইবে। শ্রীমতী আমার একমাত্র কন্যা। তোমার মতো যোগ্যপাত্র পাইলে বিশ হাজার টাকা নগদ, একশো ভরি সোনা, এবং যাবতীয় আসবাবপত্র যৌতুক দিতে প্রস্তুত আছি। ইহা ছাড়া আমার চৌত্রিশ নম্বর বাড়ির দোতলায় দুইখানা ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙিয়া একত্র করিয়া দিব যাহাতে ভবিষ্যতে তোমরা দুইজনে পুত্র কন্যাদের নিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পার।

ইতিমধ্যে একদিবস তোমার অফিসেও গিয়েছিলাম। তোমার উর্ধ্বতন বাঙালী সাহেবের সঙ্গেও দেখা করিয়া তুমি কত বেতন পাও, চাকুরির ভবিষ্যৎ কি, সব অবগত হইয়া আসিয়াছি।

আমরা স্বর্ণবণিক, তুমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ইহাতে আমার আপত্তি নাই। তুমিও উচ্চ শিক্ষিত, জাতিভেদ নিশ্চয়ই স্বীকার কর না। এই বৃদ্ধের আশা তুমি ভঙ্গ করিবে না আশা করি। ইতি

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীশ্যামসুন্দর মল্লিক।

কি ধৃষ্টতা কি আক্কেল! অফিস পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। ছি-ছি মাথা একেবারে কাটা গেল আমার। এসব সেকেলেপন্থীদের নদীতে ডুবিয়ে মারা উচিত। আমি যাব ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করতে? লোকটি কোন সাহসে এ প্রস্তাব করল?

ডোরিন বলল, "কার চিঠি, কনি? খুব চটে যাচ্ছ মনে হচ্ছে?"

চিঠিটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারলাম দেয়ালে, বললাম, "বাড়িওয়ালা শ্যাম মল্লিকের চিঠি। আমার ঘাড়ে ওর মেয়েটাকে গছাতে চায়।"

"বাঙালী মেয়ে বিয়ে করাই তোমার সবদিকে দিয়ে ভালো।"

"আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমার পক্ষে কি ভালো কি মন্দ, তোমাকে শেখাতে হবে না।"

"ছেলের মেজাজ দেখ!"

"এখন তোমার ওপরও চটে যাচ্ছি কিন্তু!"

ও হাসতে লাগল, বলল, "আমার ঘাড় মটকে দেবে নাকি?"

"মটকাতেও হয়তো পারি, এখন বেড়াতে চল।"

সমুদ্রতীর ধরে দুজনে এগিয়ে যাচ্ছি। লোকের বসতি ছাড়িয়ে, হণ্টনবিলাসীদের গণ্ডী পেরিয়ে। রোজই এমন যাই। এখানে এসে আমার দিনগুলো যেন হংসবলাকার মতো মনের আনন্দে পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে, যেন এক নতুন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে। ডোরিন গুন-গুন করে গান গায়, আমি মধুমক্ষিকার মতো সেই সুধা পান করি। হাঁটতে-হাঁটতে মনে হয় আমি যেন শ্রীরামচন্দ্রের মতো গোদাবরীতটে তপস্বীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি, তপশ্চারিণী শ্রীজানকীর হাত ধরে সেই কালপ্রবাহ যেন এখানে এসে থেমে গেছে।

ডোরিন জিগগেস করল, "কি ভাবছ, কনি?"

"ভাবছি এই সাগরবুকেই আমরা দুজনে ভাসিয়ে দেব আমাদের জীবন-তরী।

কাইরো ভেনিস রোম জেনিভা বার্লিন প্যারি লণ্ডন, সেখান থেকে তোমার বাপের দেশ আয়ার্ল্যাণ্ডে। সেখানে আমরা দুটিতে সুখের সংসার পাতব। তোমার সমাজ হবে আমার সমাজ, তোমার ধর্ম হবে আমার ধর্ম, তুমি হবে আমার, আমি হব তোমার।"

"নিজের দেশ ধর্ম সমাজ সব ছেড়ে যাবে। তোমাকে সব কিছু থেকেই কেড়ে নেব?"

"এটা ছাড়া নয়, পাওয়া। ছোটোর জন্যে বড় কিছু ছাড়া যায় না, বড়র জন্যে আর সব ছাড়া যায়। সেই সুখের সংসারে কচিকাচা যারা আসবে তারা হবে সেই বাগানের ফুল। সেখানে তোমাকেও পাব, তাদেরও পাব, জীবন আমার কানায়-কানায় ভরে উঠবে।"

"বস এখানে কনি, আর চলতে পারছি না পা কাঁপছে।"

ডোরিনকে বসিয়ে ওর পিঠে হাত বুলোতে লাগলাম। মাথায় ওর সিল্কের স্কার্ফ জড়ানো সেটা খুলে দিলাম, হাওয়া লাগুক। বললাম, "ডো, তুমি সেদিন বলেছিলে পুরুষরা নিজের সুখই খোঁজে কিন্তু তোমরা নিজের সুখটাই বড় করে দেখ না, এখানেই তফাত, এবং তোমাদের মনে হয় দ্বন্দ্বের সংঘাত। কিন্তু ভেবে দেখ তুমি, আমি যা ঠিক করেছি তাতে দুজনের জীবনেই আসবে পরিপূর্ণতা। তোমার বয়েস চব্বিশ, আমার বয়েস সাতাশ। এ পর্যন্ত আমরা জীবনে সত্যিকার কি পেয়েছি? কোথায় যেন কি একটা শূন্যতা রয়ে গেছে আমাদের দুজনের জীবনেই, সেটা কি বেশিদিন চলতে দেওয়া ভালো? তুমি বল আমি তোমার মতো একটা মেয়ের জন্যে সব ত্যাগ করতে চাইছি কেন, এ প্রশ্নের জবাব মুখ দিয়ে বলতে পারব না, আমার মন জানে। দাও তোমার হাতখানি আমার বুকে, কান পেতে শোনো, যদি বুঝতে পার।"

"কনি আমার অদৃষ্টে কি সুখ আছে?"

"আছে, আছে, আছে! তোমার সব ভারই যখন নিতে চাচ্ছি তখন সে ভারও আমার। তোমাকে কিছুদিন লণ্ডন স্কুল অফ মিউজিকে আরো শিক্ষা নিতে হবে, আমি ডাক্তারী পড়ব। আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে তুমি খুলবে নাচগানের ক্লাস, আমি খুলব নার্সিং হোম। দিনের শেষে হাত ধরাধরি করে বসে থাকব আমরা চুপ করে ফায়ার-প্লেসের সামনে, একজনের মন আরেকজনের মনের ভাষা শুনবে।"

"শরীরটা বড় অস্থির লাগছে কনি। আমাকে হাত ধরে হোটেলে নিয়ে চল।"

ডোরিনকে আমার দু হাতের পরে শুইয়ে নিয়ে চললাম, বুকের কাছে ধরে। এ-ভাবে ওকে হোটেল পর্যন্ত নিয়ে যাবার শক্তি আছে আমার, কিন্তু লোকে কি ভাববে, কাছাকাছি গিয়ে নামিয়ে দেব।

"কনি, সেদিনকার মতো আমার কাপালে তোমার আশীর্বাদ ছুঁইয়ে দাও, মনে যেন জোর রাখতে পারি, তোমাকে যেন সুখী করতে পারি।"

মুখ নিচু করে ওর শুভ্র ললাটে আমার স্নেহের স্পর্শ এঁকে দিলাম। দিনান্তের সূর্য পশ্চিমাকাশে আগুন ধরিয়ে সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। সেই বর্ণালীচ্ছটা পড়েছে ডোরিনের মুখে। ওর মনে কি হচ্ছে জানি না, কিন্তু আমার হৃদয়ের আকাশেও লেগেছে ঐ রঙ। মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর একটি গান :

"তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।"

গান গাইতে জানি না, জানলে প্রাণ খুলে গেয়ে উঠতাম। সমুদ্রতীরের সূর্যাস্ত প্রাণে একটা ঝঙ্কার জাগিয়ে তোলে!

ঘরে ফিরে ডোরিনকে জিগগেস করলাম, "তোমার শরীর তো এখানে এসে বেশ ভালো হয়েছে, তবে বেড়াতে গিয়ে অমন হয়ে পড়লে কেন?"

"মাঝে-মাঝে আমার কিরকম ভয় করে।"

"বনের বাঘে ঘাড় মটকায় না, মনের বাঘে ঘাড় মটকায়। তুমি বড় ভাবপ্রবণ, মেয়ে জাতটাই ভাবপ্রবণ। নক্করদা থাকলে অন্তত দশটি কারণ দেখাতে পারতেন যে কেন তারা ভাবপ্রবণ। আমি কাছে থাকতে তোমার ভয় কি?"

"এবার ফিরে গিয়ে তাঁকে আর দেখবে না।"

"সেকথাই এখুনি মনে হচ্ছিল। ম্যাক চলে গেল জগৎ ছেড়ে, নক্করদা চলে গেলেন কলকাতা ত্যাগ করে, আমি আর তুমিও তো দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

"কবে নাগাত যাওয়া হতে পারে?"

"পাসপোর্ট করতে হবে, এমিগ্রেসান সার্টিফিকেট নিতে হবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি যোগাড় করতে হবে, জাহাজের ক্যাবিনও যোগাড় হওয়া চাই। ধরো মাস দুই? কিছু গরম কাপড় জামাও অর্ডার দিতে হবে দুজনের জন্যে। সবার আগে

আমাদের বিয়ে। একবার মিস ডোরিন গ্রে নামে পাসপোর্ট করলে তাকে বদলে মিসেস সানিয়াল করতে হলে আবার দেরি হবে। কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে এ্যাফিডেভিট করাটা হাঙ্গামাও বটে। কলকাতায় কোথায় থাক আজকাল ?"

"একই রাস্তায় আটচল্লিশ নম্বরের বাড়িটায়।"

"সেটা চলবে না। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া না করলে আলাদা জায়গায় থাকে না।"

"যদি ঝগড়া করি ?"

"তার ওষুধ আমার জানা আছে।"

"একমাসের জন্যে ছোট একটা কাজের কথা চলছে, তবে পাকাপাকি হয়নি।"

"কাঁচাই থাক, পাকিয়ে আর দরকার নেই। ওকি তোমার ঘুম পাচ্ছে? স্কার্ট ছেড়ে শাড়ি পরবে, আবার শাড়ি ছেড়ে স্লিপিংস্যুট পরবে তার দরকার নেই। এখানেই খাবার দিয়ে যাক কিছুক্ষণ পরে, কেমন ?"

"তুমি আমাকে আলসে করে ফেলছ।"

"ফেলছি তো ফেলছি। দিনকতক আরাম করে নাও।"

ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ডোরিন ছুটে এসে আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে রাত প্রায় দুটো। জিগগেস করলাম, "কি স্বপ্ন দেখছিলে ডো? এত কাঁপছ কেন ?"

"প্রকাণ্ড একটা ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।"

ওর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম। আমার গলা জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ওর নিঃশ্বাস পড়ছে আমার গালে ওর অসাড় সুকোমল দেহের আধখানা আমার গায়ের উপর। নড়তে চড়তে পারছি না, পাছে ওর ঘুম ভেঙে যায়। আমিও নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলাম, বাকি রাতটুকু ঘুম এল না। এল একরাশ চিন্তা।

ওকে পাবার জন্যে কেন এই আকুলতা আমার। বংশে মানে অর্থে কোনোদিক দিয়েই তো ও আমার কাছাকাছি নয়? ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন শ্রেণীর, ভিন্ন সমাজের। দেহের রক্তেও ওর ভেজাল, ও ফিরিঙ্গি, আমি খাঁটি ব্রাহ্মণসন্তান। আমি পদস্থ ব্যক্তি; ও ক্যাবারেগার্ল অর্থাৎ জীবিকায় বাইজীর উন্নত সংস্করণ ছাড়া আর কি? ওর পিতামাতা কে ছিল জানি না, আমি উচ্চপদবীবিশিষ্ট অ্যাডভোকেট জেনারেলের ছেলে। কিন্তু মন যে 'কোন পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে'

এ-রহস্য কে আগে বুঝতে পারে? অন্য কেউ এরকমটি করলে ছি-ছি করতাম, কিন্তু নিজের বেলায় কি এতই চৈতন্য হারিয়েছি?

কিন্তু এটা ভাবতেও ভালো লাগে না। প্রেমের দেউলে উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ নেই, জাতিভেদ নেই, অসমতার গণ্ডীভেদ নেই। জগন্নাথদেবের মন্দিরের মতো। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল মিশে একাকার হয়ে যায় সেখানে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের মিলন সেখানে ফুল হয়ে ঝরে পড়ে দেবতার চরণে।

কলকাতা যাবার আগের দিন। খুব জোর হাওয়া দিচ্ছে। ডোরিনকে বললাম, আজ আর স্নান করে দরকার নেই, পাগলা হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে। ডোরিন কিছুতেই ছাড়ল না। সমুদ্রে স্নান করে ওর এত মজা লেগেছে যে শেষের দিনটা ছাড়তে ও রাজী নয়, আগামীকাল তো স্নানের সময় এখানে থাকব না।

আরো কেউ-কেউ স্নান করছিল। তাদের দেখিয়ে ডোরিন ঠাট্টা করল, "এদের ঠাণ্ডা লাগবে না, আর লাগবে না শুধু আমার?"

ঢেউয়ের মাতামাতির সঙ্গে ও খুব হুটোপুটি করছে। স্নান করতে নামলেই ওর ফূর্তি বেড়ে যায়। অনেকক্ষণ হয়ে যাবার পরে ওকে বললাম এবার হোটেলে ফেরা যাক, আমার দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। ও বলল, "আর দশমিনিট, প্লিজ ডার্লিং।"

প্রকাণ্ড একটা ঢেউ এগিয়ে আসছে দেখে আমি নিজেও একটু ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, "ডো, এটা বড় উঁচু, চল দৌড়ে পালাই।"

ওর হাত ধরে ছুটতে শুরু করেছি, কিন্তু ঢেউটা এড়াতে পারলাম না, মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ কি হয়ে গেল জানি না, দেখি ডোরিনের হাতখানি আর আমার মুঠোর মধ্যে নেই। চিৎকার করে উঠলাম, "ডোরিন! ডোরিন! ডোরিন!"

আমার সেই পাগলের মতো চিৎকারের কোনো সাড়া পেলাম না। কাছেই একদল জেলে জাল বুনছিল, ছুটে গেলাম সেখানে। বললাম, "দশহাজার টাকা দেব, মেমসাহেবকে বাঁচাও, ভেসে গেছে।"

ওরা আমাদের রোজই দেখে, মেমসাহেবকে চেনে, সকলেই জলে লাফিয়ে পড়ল। যারা কাছে স্নান করছিল তাদের মধ্যে দুটি বলিষ্ঠ ছেলে অশান্ত সমুদ্রকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলল। আমার হাত-পায়ের বল কে যেন কেড়ে নিয়েছে। দাঁড়াবারও শক্তি নেই, বসে পড়লাম। কে একজন ছুটল হোটেলে খবর দিতে।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি চলল। ম্যানেজার আরো লোকজন নিয়ে এসেছে, কিন্তু

কেউ আমার নয়ননিধিকে আমার কোলে আর ফিরিয়ে দিতে পারল না। আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করে ডোরিন সত্যিই চলে গেছে? জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

অজ্ঞান অবস্থাতেই মনে হল কে যেন একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিল আমার ডান হাতের ওপরের দিকে। বোধহয় ঘুমের ইনজেকসন্। চোখ খুলে দেখলাম আমারই ঘরে আমার বিছানায় শুয়ে রয়েছি। এ-দুঃখ যে না পেয়েছে সে এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা বুঝতে পারবে না, এ-আঘাতে বুঝি পাথরও কেটে যায়, এ শোকে বুঝি গিরিশৃঙ্গও ভেঙে পড়ে। আমি তো তুচ্ছ মানুষ!

সমস্ত রাত কেটে গেল। মাঝে-মাঝে যখন তন্দ্রা ভেঙে যায় তখন ডোরিনের মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ডোরিন যে নেই তা এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার সোনার স্বপ্ন যে এভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। ডোরিন নেই অথচ আমি আছি? এটা হতেই পারে না।

ভোর-ভোর সময়ে কানে এল, "স্যর আমি সত্যনাথম্ কথা বলছি, ম্যানেজার সত্যনাথম্। মৃতদেহ সমুদ্র ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, সমুদ্র যা নেয় তা আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। নিচের লাউঞ্জে রেখেছি।"

মৃতদেহ! প্রাণোচ্ছল যৌবনোচ্ছল ডোরিনকে আজকে বলা হচ্ছে মৃতদেহ! ওর নামটাও কেড়ে নিয়ে গেছে ঐ সমুদ্র। যা ফিরিয়ে দিয়েছে সেটার কোনো নাম নেই আজ। শুধু মৃতদেহ বললেই সকলে চিনবে। অগণিত নামহীন, প্রাণহীন গলিত মাংসস্তূপের সহযাত্রী হতে চলেছে আমার ডোরিন। মৃতদেহ থেকে দেহহীন অস্থি-পঞ্জর, অস্থিপঞ্জর থেকে ধূলিমুষ্টি। পরিণাম ও পরিণতির সর্বশেষ।

ম্যানেজার সত্যনাথমের গলা খাঁকারি শুনে বুঝলাম ও এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললাম, "কিছু বলবে?"

"স্টেশনওয়াগানটি পাঠাচ্ছি বেরামপুরে। ফুল, কফিন, আর একজন পাদ্রী নিয়ে আসতে। প্রোটেস্ট্যান্ট না ক্যাথলিক পাদ্রী চাই?"

"ক্যাথলিক। তার আগে মৃতদেহটি এখানে এনে পাশের খাটে রাখবার ব্যবস্থা করা যায়?"

"নিশ্চয়ই স্যর। এখুনি আনবার বন্দোবস্ত করছি।"

ডোরিন আবার ঘরে ফিরে এল। কিন্তু নিঃশব্দ নিশ্চল, শাদা চাদরে আবৃত হয়ে। ওরা চলে গেলে চাদরটি খুলে ফেললাম। হাত-পায়ের আঙুলগুলো হিংস্র-

মৎস্যের দংশনে ক্ষতবিক্ষত। শুধু একটিবার কথা কও ডোরিন। শুধু একটিবার ডার্লিং। আমার বুক তুমি ভেঙে দিয়ে গেছ! 'কনি' বলে শুধু একটিবার ডাক!

চোখের জলে ডোরিনের মৃতদেহ ভিজিয়ে আদর করতে লাগলাম।

ও বেঁচে থাকতে যে-কথা বলতে পারিনি, সেকথা কানে-কানে বললাম। আজ কোনো সংকোচ নেই আমার, প্রাণভরে ওকে আদর করি। সুখের মুখ কখনো চোখে দেখেনি ডোরিন, কত দুঃখই পেয়েছে! সুখের রাজ্যের সদর-দরজায় এসেও ও সেখানে ঢুকতে পারল না, অদৃষ্টের এমনি অভিশাপ! আমিও দুর্ভাগা। আমার মতো কে এমন পেয়েছিল, কে এমন হারিয়েছে? না-পাওয়ার দুঃখের চাইতে পেয়েও হারানোর দুঃখ ঢের বেশি।

বেলা প্রায় দুটো বাজে। রুম-বয় একগ্লাস দুধ নিয়ে এসে সামনে ধরল। ওর পীড়াপীড়িতে না খেয়ে পারলাম না। খাবার কোনো ইচ্ছে ছিল না।

"স্যর, ফাদার লুবেক এসেছেন।" ম্যানেজার সত্যনাথমের গলা। ও চলে গেল। শ্বেতশ্মশ্রু ফাদার ঘরে ঢুকলেন, গলা থেকে গোড়ালী পর্যন্ত কালো আলখাল্লায় ঢাকা। চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নতজানু হয়ে বসলাম। জিগগেস করলেন, "কনফেশন?"

"না ফাদার, আমি খৃষ্টান নই, হিন্দু। ঐ মেয়েটি ক্যাথলিক। আজ ওর কনফেশন করবার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই, সবকিছুর বাইরে চলে গেছে। তবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে একটা সত্যকথা বলতে হচ্ছে। ও আমার বিবাহিত পত্নী নয়, বান্ধবী, ওর নাম মিসেস সানিয়াল নয়, মিস ডোরিন গ্রে।"

পাদ্রী ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, "তা হলে তোমরা দুজন পাপের জীবন যাপন করছিলে?"

"না, ফাদার ও নিষ্পাপ, ফুলের মতো পবিত্র। আমাকেও কোনো পাপ স্পর্শ করেনি।"

"এও কি সম্ভব?"

"ভগবানের কৃপায় সম্ভব হয়েছিল, তিনি শক্তি দিয়েছিলেন আমাদের এই প্রলোভনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে।"

"তোমাদের হিন্দুর ভগবান?"

"ফাদার, আমরা সকলেই তো একই ভগবানের সন্তান? বিবাহ হয়েছিল

আমাদের আত্মায় আত্মায়। কলকাতা ফিরে গিয়েই আমাদের আইন অনুসারে বিবাহ হত। তা আর হল না। ও নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা নিয়েই চলে গেছে।"

ফাদার স্বগত বলে উঠলেন, "অসম্ভবও তা হলে সম্ভব হয়! ভগবানের দয়া কি আশ্চর্য!"

চোখ বুজে অনেকক্ষণ বসে থেকে ফাদার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "বৎস, মানুষের আইন থেকে ভগবানের আইন আলাদা। উঠে এস, মেয়েটির একটি হাত ধর। ভগবান সাক্ষী করে তোমাদের আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করছি।"

ডোরিনের হিমশীতল ডান হাতখানা আমার ডান হাতে নিলাম।

"বল, আই টেক দী আনটু মি অ্যাজ মাই ল'ফুল ওয়াইফ।"

"আই টেক দী আনটু মি অ্যাজ মাই ল'ফুল ওয়াইফ।"

"আন্টিল ডেথ ডু আস পার্ট।"

"আন্টিল ডেথ ডু আস পার্ট।"

"ইন দি লাইট অফ দি ফাদার ইন হেভেন।"

"ইন দি লাইট অফ দি ফাদার ইন হেভেন।"

"ইন দি প্রেজেন্স অফ দি সার্ভেন্ট অফ যিজাস ক্রাইস্ট, দি সন অফ্ গড, অ্যাণ্ড ফ্রায়ার সুপিরিয়র জোহানেস লুবেক অফ হোলি রোমান চার্চ। আমেন।"

আবৃত্তি করে গেলাম। মনে হল ডোরিনের হাতখানি যেন আমার হাতের ভিতর কেঁপে উঠল। দুর্বল মস্তিষ্ক আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে? ও সত্যিই এখন আমার ধর্মপত্নী?

ফাদার তাঁর গলা থেকে ক্রুশখানি খুলে আমাদের দুজনের মাথায় ছোঁয়ালেন, মেরীমাতা, যীশু এবং হোলিঘোস্টের নামে আশীর্বাদ করলেন।

চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিলাম। নতজানু হয়ে ফাদারের পোশাকের নিম্নপ্রান্ত চুম্বন করে বললাম, "আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে, ফাদার, এজন্যে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। এবার আমার ধর্মপত্নীর শেষকৃত্য সম্পাদন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

উনি পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বার করে একফোঁটা পবিত্র তেল ডোরিনের ললাটে দিয়ে কি সব ল্যাটিন মন্ত্র পড়লেন বুঝলাম না। তারপর বললেন, "বৎস, তোমার স্ত্রীর এক্সট্রিম আঙ্কসন দিয়ে দিলাম, ওর আত্মা স্বর্গে চলে যাচ্ছে। দেখ ওর বদন প্রসন্ন হয়ে উঠেছে।"

হায়, আমার সে শক্তি কোথায় যে দেখব?

ডোরিনের মৃতদেহ কফিনে শুইয়ে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। ফুলে-ফুলে কফিন ছেয়ে গেছে। কফিন চলল ঘর ছেড়ে। ডোরিনের শেষ যাত্রা। তাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এত লোকে ফুলের উপহার পাঠিয়েছে এই শেষ যাত্রায়?

বাইরের বারান্দায় দেখি অনেক লোক। হোটেলের প্রায় সবাই সেখানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচিত-অপরিচিতের এই সমবেদনায় অভিভূত হলাম। মৌন মিছিল চলল কফিনের সঙ্গে। ম্যানেজার সত্যনাথম্ পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে সমাধির আয়োজন করেছে।

ফাদার লুবেক চলেছেন আমার পাশে-পাশে, বাইবেল থেকে আবৃত্তি করছেন: দাস দি লর্ড স্পেক—হোজ হু কাম আনটু মি পিওর ইন মাইণ্ড এ্যাণ্ড পিওর ইন বডি আর ব্লেসেড ইনডিড, ফর দেয়ার্স ইজ দি কিংডম অফ হেভেন।

ফাদারের মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা শেষ হলে কফিন সমাধিগর্ভের ভিতর নামানো হল। ডোরিন এবার চলে যাচ্ছে আমার দৃষ্টির বাইরে, মৃত্তিকাগর্ভের নিরন্ধ্র অন্ধকারে। হঠাৎ সত্যনাথমের কথা কানে এল, "স্যর আপনাকেই তো প্রথমে দিতে হবে মাটি, এই নিন, আমরা পরে দেব।"

মাটি ছড়িয়ে দিলাম কফিনের ওপরে। ডোরিনকে এই আমার শেষ দেওয়া। শুধু একমুঠো মাটি! দিয়েছিলাম হৃদয়, এখন দিচ্ছি একমুঠো মাটি! এ মাটি নয় ডোরিন, আমার চূর্ণবিচূর্ণ হৃদয়ের সবটুকু। শান্তিতে ঘুমোও তুমি। যে-শান্তি বেঁচে থাকতে পাওনি, আজ সে-শান্তি তোমাকে ঘিরে রাখুক।

সকলের চক্ষু সজল। যে মহিলা আর তার স্বামীর সঙ্গে আসবার দিন শ্রীরামপুর রেলওয়ে রিফ্রেসমেণ্টরুমে চা খেয়েছিলাম সে মহিলাটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সবাই চোখ মুছছে, শুধু আমার চোখে জল নেই, আমি পাথর হয়ে গেছি।

বিঠলরাম ধাবলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। আজ আর পরনে খাকি নয়, শোক-প্রকাশের কালো পোশাক। আমার হাত ধরে ধরা গলায় বলল, "বন্ধু, তুমি কতবড় আঘাত পেয়েছ তা অনুভব করছি, কিন্তু কথাশিল্পী বিঠলরাম আজ সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।"



৩৩

আয়ার্ল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূল। ডোরিনকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসার কথা ছিল। এসেছি একা। ডোরিন আসেনি, কোনোদিনই আসবে না। যেখানে সে গেছে সেখান থেকে কেউ ফিরে আসে না।

সম্মুখে অতল অনন্ত আটলান্টিক মহাসাগর, অশান্ত জলরাশি। অসংখ্য তরঙ্গ-মালা ছুটে এসে ভেঙে পড়ছে শিলাময় বেলাতটে। যেন আমারই অন্তরের ছবি।

ডোরিন নেই, কিন্তু সেই স্মৃতি আছে আমার হৃদয়পটে শোণিতাক্ষরে। সেই স্মৃতির ছিন্নপত্রগুলি সযত্নে গুছিয়ে রাখছি। এ কাহিনী হয়তো কেউ পড়বে না। কিন্তু আমি পড়ব। বারবার পড়ব। প্রত্যুষের আলোয় পড়ব, গোধূলির আধো-অন্ধকারে পড়ব, গভীর রাতে আলো জ্বেলে পড়ব। ডোরিন, তোমারি নাম বলব আমি বলব নানা ছলে, বলব আমি হাটের মাঝে, বলব নয়নজলে।

রাতের বেলা জানলা খুলে বসে থাকি। যদি জলকন্যার বেশে সে জল থেকে উঠে আসে? দরজা বন্ধ করি না, যদি সে দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যায়?

ডোরিনের বাক্সে ওর একখানা ডাইরি পেয়েছিলাম। ও আমাকে এতখানি ভালোবেসেছিল আগে তা বুঝিনি, ও বুঝতে দেয়নি। আরো পেয়েছিলাম সেই চকোলেটের কৌটোটা, যেটা ওকে আমি দিয়েছিলাম গত বড়দিনের আগের বড়-দিনে। প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যত্নে রেখে দিয়েছিল, খোলেনি।

চিরজীবন ডোরিনের স্মৃতি বুকে রেখে হয়তো এদেশেই থেকে যাব, ডোরিনের বাবার দেশে। অথবা বিশাল বিশ্বজনসমুদ্রে আর কোথাও তলিয়ে যাব, যেমন ও তলিয়ে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরে।

"মিস্টার সানিয়াল তুমি সারাদিন বসে কি লেখ? শরীর খারাপ হয়ে যাবে! একটু বাইরে ঘুরে এস না?"

তাকিয়ে দেখি মিসেস কক্‌নার, আমার বাড়িওয়ালী। সহৃদয়া বৃদ্ধা। বিদেশী

এই হতভাগ্যের প্রতি মমতাময় ব্যবহার। বললাম, "ইচ্ছে করছে না মিসেস কক্‌নার, কিন্তু ধন্যবাদ। একটু বস আমার কাছে।"

"ও কি ভাষায় লিখছ?"

"আমার মাতৃভাষা বাংলায়।"

"টেগোরের ভাষায়?"

"হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা তো খুব ছোট শহর, এখানে আভিং গ্রে নামে কোনো লোক ছিল? এই তার ফটো।"

"এ-ফোটো তুমি কোথায় পেলে?"

"চেনো তুমি?"

"চিনি না? আমার ভাইপো। সে তোমাদের দেশেই গিয়েছিল, ওখানে অপঘাতে মারা যায়।"

"তার একটি মেয়েও হয়েছিল শুনেছিলে?"

"হ্যাঁ, কোথায় আছে সে এখন?"

"বেঁচে নেই।"

"তুমি তাকে চিনতে?"

"তাকে সঙ্গে করে এখানেই আমার নিয়ে আসার কথা ছিল, এসেছি একা।"

ভদ্রমহিলা চোখে রুমাল চেপে উঠে গেলেন।

মনের পর্দায় মাঝে-মাঝে ভেসে ওঠে হারীণদার মুখ, মুন্নাদির মুখ, নকরদার মুখ, বুড়ো ম্যাক। কানে শুনতে পাই হারীণদার শেষ কথা: "দেশ ছেড়েই চলে যাচ্ছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে দিয়ে অনেক কিছুই আশা করেছিলাম।"

"আমাদের ছেড়ে চললি কাঞ্চন? সব খুলে বললি, তাই তোকে মানা করতে পারি না। আল্লা তোর মঙ্গল করুন।"

"ব্রাদার, মেয়েদের কাছ থেকে তফাত থাকবি, নইলে ঠকে যাবি, এই নকর বোস অনেক দেখেছে রে কাঞ্চন!"

নকরদা কাছে থাকলে বলতাম, না, নকরদা আমি ঠকিনি, যা পেয়েছি তা হয়ে রইল আমার অমূল্য সঞ্চয়।

॥ সমাপ্ত ॥